যেখানে যেমন

শংকর



দে'জ পাবলিশিং । কলিকাতা ৭০০০৭৩ [illegible]

প্রাপ্তিস্থান :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

উৎসর্গ

বন্ধুবর শ্রীসুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে
যার দেওয়া ওভারকোটের সুরক্ষায়
সাগরপারে যেখানে-সেখানে যখন-তখন যেমন-খুশী
ঘুরে বেড়াবার সাহস ও সুযোগ পেয়েছিলাম

শংকর-এর সম্প্রতি প্রকাশিত বই

উপন্যাস

স্বর্ণ সুযোগ ১০'০০
মরুভূমি ১০'০০
সম্রাট ও সুন্দরী ১০'০০
জন-অরণ্য ৮'০০
আশা আকাঙ্ক্ষা ৭'০০
রূপতাপস ৬'০০
চৌরঙ্গী ১২'৫০

ত্রয়ী উপন্যাস

স্বর্গ মর্ত পাতাল ১২'৫০
(জন-অরণ্য, সীমাবদ্ধ, আশা আকাঙ্ক্ষা)

যুগল উপন্যাস

তনয়া ১২'৫০
(নগর নন্দিনী, সীমন্ত সংবাদ)

ছোট বড় সবার জন্য

এক ব্যাগ শংকর ৭'০০

বিশ্বভ্রমণ

যেখানে যেমন ১০'০০

আরও কয়েকটি বই

এপার বাংলা ওপার বাংলা ১৬'০০
বোধোদয় ১০'০০
স্থানীয় সংবাদ ১০'০০
সীমাবদ্ধ ১২'০০
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ১০'০০
পাত্র পাত্রী ৫'৫০
এক যে ছিল ৮'৫০
সার্থক জনম ৯'০০
মানচিত্র ১০'০০
এক দুই তিন ৮'০০
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ৮'৫০
পদ্মপাতায় জল ৪'০০
যা বলো তাই বলো ৩'০০
কত অজানারে ১২'০০

শংকর-এর সব বই দে বুক স্টোর-এ পাওয়া যায়



দেশে দেশে আগে যাও
এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ
ক'রে দেখ, নিজের চোখে দেখ,
পরের চোখে নয়, তার পর যদি মাথা থাকে
তো ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরাণ
পুঁথি-পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর
বেশ ক'রে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে
দেখ, খাজা আহাম্মকের চোখে নয়...

"দেশে দেশে আগে যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ ক'রে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তার পর যদি মাথা থাকে তো ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরাণ পুঁথি-পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর বেশ ক'রে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চোখে নয়,…"

স্বামী বিবেকানন্দ
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

লেখকের নিবেদন

কয়েক বছর আগে প্রকাশিত 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বইটিতে বিদেশভ্রমণের সব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা সম্ভব হয় নি। সাতসাগরের এপার এবং ওপারে একদা যেসব বিচিত্র মানুষের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলাম এবং যাঁদের আজও ভুলতে পারি নি এই বইতে তাঁদের স্মৃতিকে ধরে রাখবার চেষ্টা করলাম। পশ্চিমী সভ্যতার আলোকে আমাদের নিজস্ব সভ্যতাকে বোঝবার প্রচেষ্টায় এই বইটি আমার আপনজনদের সামান্য কাজে লাগলেও নিজেকে ধন্য মনে করবো।

শংকর

নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে।

এই বই শুরু করার আগে যে কবিগুরুটিকে যথাবিহিত প্রণাম জানাতে চাই তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি নবভারতের অন্যতম স্রষ্টা; অধ্যাত্মজগতে শঙ্করাচার্য ও রামানুজের সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়, আমাদের এই যুগে ক্লেদাক্ত হিন্দুধর্মকে কলুষমুক্ত করে তিনি স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন —এইসব কারণে বিবেকানন্দের চরণচর্চা করছি না। করছি সাহিত্য-রচয়িতা হিসেবে—প্রণাম জানাচ্ছি বাংলার শ্রেষ্ঠ ভ্রমণসাহিত্যকারকে।

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক? হ্যাঁ, শুধু শ্রেষ্ঠ নন, আমি তাঁকে নির্দ্বিধায় সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। সেই যে ১৮৭৯ সালে কলকাতা থেকে গোলকোণ্ডা জাহাজযোগে পাশ্চাত্যদেশ যাত্রাপথে গঙ্গাবক্ষে তিনি 'পরিব্রাজক'-এর প্রথম লাইন রচনা করলেন—তারপর থেকে বাংলা ভ্রমণসাহিত্য আর এক রইলো না। 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য' লিখিত হবার পর সমগ্র এক শতাব্দীর তিনচতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হলো, বাণীর বরপুত্ররা এই বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করলেন, কিন্তু বিবেকানন্দ আজও অদ্বিতীয়। কী স্টাইলে, কী সরসতায়, কী অন্তর্দৃষ্টিতে, কী আত্ম-বিশ্বাসে, কী গভীর মানবপ্রেমে পরিব্রাজকের লেখক আজও বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের মুকুটমণি হয়ে রইলেন।

'পরিব্রাজক' রচনাকালের ঠিক আটষট্টি বছর পরে আমার বিলেত-আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ ঘটে। নিমন্ত্রণ এসেছিল সরকারী সূত্রে সুদূর মার্কিন দেশ থেকে। কখনও বিদেশ যাই নি—কর্মক্ষেত্র কলকাতার একশ মাইলের বাইরে গেছি মাত্র কয়েকবার। এহেন লোকের পক্ষে একলাফে সপ্তসাগর পেরনো এক দুঃ

ব্যাপার। এই প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে প্রথম ভ্রমণের বই 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'য় লিখেছি। সরকারী নিমন্ত্রণে বিদেশ যাবার সুযোগ পেয়ে প্রচণ্ড আনন্দ হওয়ার কথা—কিন্তু আমার হলো উল্টো। মা বললেন, "এতো ভাবছিস কী?"

ভাবনাটা বোঝাবো কী করে? বছরের পর বছর ছাত্র, কর্মী, অধ্যাপক, গবেষক এবং রাজদূত হিসেবে পাশ্চাত্যে বসবাস করে কত দূরদর্শী ও প্রতিভাধর ভারতীয় পশ্চিমের যে-সভ্যতাকে ঠিকমতো বুঝতে পারেন নি, টুরিস্টের মতো সামান্য কয়েক সপ্তাহ এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে সেই পশ্চিম সম্পর্কে আমি কী লিখতে পারবো? লিখতেই হবে এমন কোনো দিব্য ছিল না, বরং না-লেখবার স্বাধীনতা আমাকে নিমন্ত্রণকারীরা আগে থাকতেই দিয়েছিলেন। তবু খটকা লাগলো, মনের মধ্যে কে যেন জিজ্ঞেস করলো, লেখককে কেন ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়া হয়? ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও কী করে? সপ্তসাগর পেরিয়ে সায়েববিবির দেশে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেলে লেখকের কী কর্তব্য?

আমার মা নিজের অজান্তেই পুত্রের সমস্যা সমাধান করেছিলেন। বলেছিলেন, "সবসময় সবজিনিসের সবকিছু জেনে লিখতে হবে এমন কথা কে বলেছে? যখন যেখানে যাবি ঘরের কথা মনে রাখবি, আর যেমন যেমন দেখবি তাই ডাইরিতে লিখে নিবি।"

মায়ের কথা শুনে আমার সাহিত্যজীবনের পরিচালক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ছোট্ট একটা কাগজের স্লিপে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ধৃতি পাঠিয়েছিলেন—'যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন'—তাহলে কোথাও ঠকতে হবে না।

এরপরে আমার আর কোনো চিন্তা থাকতে পারে না। সাত সাগরের পারে যেতে আমার আর কোনো দ্বিধা বা দুশ্চিন্তা নেই। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, দেশ দেখার সুযোগে যেখানকার মানুষটি যেমন, তেমনভাবেই দেখে আসবো। আর পথপ্রদর্শক তো রয়েছেন পরিব্রাজক ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের লেখক।

হাওড়ার বিবেকানন্দ ইস্কুলে পড়েছি আমি। ক্লাস এইটে পড়বার সময় পশ্চিমের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ওই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মাধ্যমে। তখনও পরাধীনতার আমল। দৈনন্দিন জীবনে গোরা ইংরেজদের প্রচণ্ড প্রতাপ—কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মনে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতি প্রবল ঘৃণা। পশ্চিমকে ঠিকমতো বোঝার পক্ষে পরিবেশটা তেমন অনুকূল ছিল না।

তারপর স্বাধীনতা এলো—শাসক ইংরেজ তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদায় নিলো। আমার জীবনেও সেই সময় ঘনিয়ে এলো দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ। বাবার আকস্মিক অকালমৃত্যু সংসারে যে বিপর্যয় ডেকে আনলো তাতে সাহিত্যচিন্তা কোথায় হারিয়ে গেলো। একটা চাকরির সন্ধানে তখন কলকাতার পথে পথে হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কী ছিল বিধাতার মনে, দুর্যোগের সেই অন্ধকারে এই কলকাতাতেই আমার সঙ্গে প্রথম পাশ্চাত্যের সাক্ষাৎপরিচয় হলো। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। তার একটি পরিচ্ছেদ দিয়েই কয়েক বছর পরে সাহিত্যযাত্রা শুরু করেছিলাম। ভাবছি আজ আবার সেখান থেকেই শুরু করি।

ওখান থেকে শুরু করার পক্ষে যুক্তি অনেক। কারণ যেদিন বারওয়েল সায়েবকে দেখলাম সেদিনই প্রথম আমার মানসিক বিদেশযাত্রা শুরু হলো—পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার।

সাতসাগর পারের পশ্চিম-ইউরোপ ও আমেরিকা। সাত সাগরপারে কী আছে গো? পাশের বাড়ির একটি ছেলে এই মুহূর্তে গানের সুরে তার উত্তর আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। প্রতিদিন এই সময় সে গায়—আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে সাতসাগরের পারে।

সাতসাগরের পারে শুধু স্বপ্নের রাজকন্যা নয়, রাজপুত্রও থাকে। আমার স্বপ্নের মানুষটি সাতসাগরের ওপার থেকেই এদেশে এসেছিলেন। দমদম বিমানপোত থেকে রাতের অন্ধকারে প্যান-অ্যাম ৭০৭ বিমানে চড়েও প্রথমে তাঁর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

আমার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংবাদ তাঁকে দিয়ে শুরু করা ছাড়া উপায় নেই। আমার অপরাধ মার্জনা করবেন।

শোর থেকে ভাগ্যের দেবতা আমাকে যেমন বার বার অগ্নিপরীক্ষায় ফেলেছেন, তেমন দিয়েছেন অপর সৌভাগ্যের স্বর্ণসম্ভার। আমার মতো সামান্য বিদ্যা এবং সামান্য পুঁজি নিয়ে মানুষের এই পৃথিবীকে এমনভাবে দেখবার এবং জানবার সুযোগ ক'জন পেয়েছে? কত সাধ্যসাধনায় কল্পনার সরস্বতীকে জাগ্রত করে প্রতিভাধর কাহিনীকার তাঁর মনোভূমিতে ঘটনার যে রাজসূয় যজ্ঞ করেন, কাশুন্দের এক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের চোখের সামনেই তা ঘটে গিয়েছে। এক নয়, দুই নয়, বহু ঘটনার মণিমাণিক্যে তার স্মৃতির সঞ্চয় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এ সবই সম্ভব হয়েছিল সমুদ্রের ওপার থেকে আসা সদাহাস্য, সদাপ্রসন্ন, সদাকৌতুকময় এক বিদেশীর আশীর্বাদে—যাঁর জীবনের অপরাহ্ণবেলায় আমি হাজির হয়েছিলাম আকস্মিকভাবে। তাঁর নাম নোয়েল বারওয়েল।

সে এক মধুর পরিস্থিতি। একদিকে সত্তর উত্তীর্ণ এক বিদেশী দূর সিন্ধুপারে জন্ম গ্রহণ করে, সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ধনী হয়ে, ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেরিয়ে জীবনসন্ধ্যায় যিনি এই ভাগীরথী তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অন্যদিকে এক শীর্ণকায় শ্যামল বালক—তার বাবা হঠাৎ মরে গিয়ে সংসারটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, পড়াশোনা করে খুব বড় হবার স্বপ্ন থাকলেও পয়সার অভাবে সে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। চাকরি যোগাড়ের প্রাণান্তকর তাগিদে সে পিটম্যান সাহেবের শর্টহ্যাণ্ড এবং রেমিংটন সাহেবের টাইপ শিখে ফেলেছে। ছোট ভাইবোনদের খাওয়াবার জন্যে সে ছোটখাট কাজকর্ম করছে এবং সন্ধ্যেবেলায় সাবান সাপ্লাই করছে মুদির দোকানে। বয়স অনুযায়ী, একজনের সূর্য ওঠার সময়, কিন্তু আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন। আর একজনের সূর্য পশ্চিমদেশের আকাশে উদিত হয়ে অপরাহ্ণবেলায় পূর্বদেশের কলকাতা শহরে অস্ত যাবার জন্য

অপেক্ষমাণ। একজন কেমব্রিজের এম-এ, মিলিটারির অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, প্রথম মহাযুদ্ধের বীর (নামের পাশে মিলিটারি ক্রশ লিখতে পারেন, ভিকটোরিয়া ক্রশের পরেই যার সম্মান) এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার—আর একজন কাশুন্দের বাইরে কখনও যায় নি, শীর্ণ শরীরটার উপর একটা হেঁড়ে মাথা, জীবনে সে কখনও সায়েব দেখে নি।

কিন্তু কি ছিল বিধাতার মনে, হাইকোর্টের আদালতী কর্মক্ষেত্র ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের টেম্পল চেম্বারে একদা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সাক্ষাৎ হলো। বিভূতিদা, আপনি শতায়ু হোন, ঈশ্বরের সমস্ত আশীর্বাদ আপনার ওপরে বর্ষিত হোক। আপনার জন্যেই হাওড়ার একটা ছেলে সায়েব ব্যারিস্টারের কাছে চাকরি পেলো। পৃথিবীর হয়তো তাতে তেমন কিছু এসে গেলো না, কিন্তু একটা জীবনের গতিপথ পাল্টে গেলো। ভোরবেলার সর্বপাপঘ্ন সূর্য পরম স্নেহে কুঁড়ির ওপর কিরণ দিয়ে প্রাণের স্পর্শ এঁকে দিলেন। শতদলের মতো তার জীবন বিকশিত হয়ে উঠলো। সে যা চেয়েছিল তা পায় নি বলে একদিন নির্জনে চোখের জল ফেলেছিল ; কিন্তু রসিক বিধাতা মধুসূদনদাদার ছদ্মবেশে বিজন অরণ্য থেকে বেরিয়ে পথহারা বালককে এমন উপহার দিলেন যা সে কোনো দিন স্বপ্নেও চাইতে পারে নি। মনে আছে তো ? ছোটবেলার সেই মধুসূদনদাদার গল্প ? যিনি আসলে ঈশ্বর, বালকের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে বন থেকে বেরিয়ে এসে তার হাতে একটা ভাঁড় দিয়েছিলেন। যে-ভাঁড় কখনও ফুরোয় না। যা চাওয়া যায় ভাঁড় উল্টে দিলে তাই এসে পড়ে। এই পাওয়ার জন্য কাশুন্দের ছেলেটি তৈরি ছিল না, তার যোগ্যও সে নয়। তাই আজও এতোদিন পরেও কোথায় যেন একটা বিষণ্ণর সুর বেজে উঠে মাঝে মাঝে তাকে উদ্বেল করে তোলে, অকারণে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

এই মধুসূদনদাদার গল্পই একদিন লিখেছিলাম আমার 'জানা অজানারে' বইতে। সে আমার বাদলদিনের প্রথম কদমফুল, সে যে

কেটেছে, পৃথিবীতে, ভারতবর্ষে, বাংলায়, কলকাতায়, কাশুন্দেতে, আমার বাড়িতে, আমার জীবনে কত পরিবর্তনই এসেছে।

সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ – মধ্যরাতের কলকাতা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দমদমে প্লেনের আসনে বসে আমি সেফটি বেল্ট বেঁধে নিয়েছি। বাইরে বোধ হয় বৃষ্টি নামবে। মেঘের ছায়ায় আকাশ অন্ধকার, প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে গিয়ে আমার মন বিস্মৃতির ওপারে কোন দূর অতীতে ফিরে যেতে চাইছে। স্মৃতির শ্রাবনে আমার বাদল দিনের প্রথম কদমফুলকে আবার দেখতে পাচ্ছি : রক্তচক্ষু সমালোচক, আপনি আমাকে মার্জনা করবেন, স্বদেশের পবিত্র মৃত্তিকা ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে তিনি আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছেন, আমি পুনরাবৃত্তি করছি, আবার তাঁকে স্মরণ করছি, আমার ডাইরিতে তাঁর কথা লিখতে বসছি।

দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেবার কয়েকদিন আগে এক অব্যক্ত আকর্ষণে ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়েছিলাম। চৌরঙ্গী রোড আর সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে ক্যালকাটা ক্লাবের হলদে রংয়ের বাড়িটা একদিন আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিল। শেষজীবনে সায়েব এইখানেই থাকতেন। লোকে বাড়িতে, হোস্টেলে, মেসে, না হয় হোটেলে থাকে জানতাম। কোনো কোনো ক্লাবেও যে বসবাসের ব্যবস্থা থাকে তা প্রথম জানলাম সায়েবের দৌলতে। তখন ক্যালকাটা ক্লাবের একতলায় বসবাসের স্যুইট ছিল। আর ওপরে গোটাকয়েক ঘর। একতলার এই স্যুইটেই প্রতিদিন বিকেলে কোর্টের ছুটির পর আমরা আসতাম ওঁর সঙ্গে। স্যুইট মানে যে একাধিক ঘর তা ক্লাবের খোকাবাবুর কাছে শিখেছিলাম।

এবার ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়ে একতলায় স্যুইটের খোঁজ পেলাম না। ভেঙেচুরে সেখানে হলঘর বানানো হয়েছে। প্রায়ই সেই হলে-এ ডিনার, ককটেল পার্টি অথবা মিটিং হয়। এই হলঘরেই এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি হঠাৎ বললেন, "আপনার

মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেলো। চারিদিকে তাকিয়ে বললাম, "এই যেখানে আপনি এবং আমি দাঁড়িয়ে আছি এইখানেই তিনি থাকতেন। এইখানেই ১৯৫৩ সালের এক রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল।"

"আহা বড় ভালমানুষ ছিলেন। আপনার লেখা পড়ে সেটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না," ভদ্রমহিলা বলেছিলেন।

আমার লেখা পড়ে! হা ঈশ্বর! আমার লেখা পড়েই মানুষটাকে যদি আপনাদের এতো ভাল লেগে থাকে, তা হলে নিজের চোখে দেখলে কী হতো?

আমি তো ছেলেমানুষের মতো একটা বিরাট বটগাছের কয়েকটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে জড়ো করে আমার দেশের মানুষদের দেখিয়েছি। পাতা দেখে কি বটগাছের আকার আন্দাজ করা যায়? কিন্তু সে কথা এখন বলে লাভ কী? কেউই চিরকাল থাকে না, বটগাছও না। স্মৃতির ফ্রেমে এই শুকনো বটপাতাগুলো সযত্নে বাঁধিয়ে রাখা ছাড়া আর কী উপায় আছে?

ক্যালকাটা ক্লাবে আমার সঙ্গে সায়েবের শেষ সাক্ষাতের কথা ঘুরে ফিরে মনে পড়ে যাচ্ছে।

প্রতিদিন বিকেলে সায়েবের সঙ্গে হাইকোর্ট থেকে ফিরতো দেওয়ান সিং বেয়ারা। একটু পরে আমিও হাজির হতাম। কোর্টে ব্যারিস্টার এবং বাবুদের সব কাজ শেষ হয়ে যায় না। জজরা যতক্ষণ আদালতের বেঞ্চিতে রয়েছেন ততক্ষণ তো রণক্ষেত্র। তারপরেই আবার আগামী দিনের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি চলে।

কোর্ট থেকে ক্লাবে ফিরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে সায়েব একটা লুঙ্গি পরে বসে থাকতেন। একেবারে খালি গা। বলতেন, "গত জন্মে আমি ছিলাম বাঙালী চাষা—গায়ে কিছুই রাখতে পারিনা।"

আমাকে মিটমিট করে হাসতে দেখে বলতেন, "হাসছো কী? একটু ঝাড়া-হাত-পা হলেই আমি জওহরলাল নেহরুকে চিঠি লিখবো, ইণ্ডিয়ার জাতীয় পোশাক হওয়া উচিত লুঙ্গি ও গামছা।"

সায়েব এবার আমার দিকে তাকালেন। কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "হেসো না, মাইডিয়ার বয়। জওহরলাল এবং আমি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কেমব্রিজে অবশ্য আমি ওঁর থেকে অনেক সিনিয়র।"

নেহরুকে ভালভাবেই চিনতেন সায়েব। এবং সে-চেনা সুখের দিনে নয়। পরিচয়টা সেই যুগে যখন জওহরলাল একবার জেল থেকে বেরোচ্ছেন এবং আবার ঢুকছেন। জওহরলাল যখন প্রাইম মিনিস্টার নেহরু হলেন তখন তো তাঁকে চেনবার জন্য স্বয়ং উইনস্টন চার্চিলও লালায়িত। শুনেছি, ইংরেজ আমলের সি-আই-ডি এক সময় আমাদের সায়েবের ওপর নজর রাখতো। কারণ, এঁর কলেজের অতি পরিচিত বান্ধবী সরোজিনী নাইডু। বিপ্লবীদের হয়ে সায়েব আদালতে কেস করেছেন, ফাঁসি-হয়ে-যাওয়া বিপ্লবীর পরিবারকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেছেন, গান্ধীজীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন এবং বিশেষ বন্ধু কেমব্রিজের আর এক প্রাক্তন ছাত্র দীনবন্ধু এনড্রুজ ইংরেজ সরকারকে প্রায়ই বিশেষ অস্বস্তিতে ফেলছেন।

বিভূতিদার কাছে শুনেছি মৃত্যুর কিছুদিন আগে দীনবন্ধু একবার সায়েবের কাছে এসেছিলেন। পি জি হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় দীনবন্ধু আবার খোঁজ করেছিলেন ছাত্রজীবনের বন্ধুকে। অপারেশনের আগে বিছানায় শুয়ে চার্লি এনড্রুজ বলেছিলেন, "নোয়েল, আমি একটা উইল করতে চাই।" দীনবন্ধুর ইচ্ছে মতো হাসপাতালের ঘরে বসে তাঁর লাস্ট উইল এণ্ড টেস্টামেণ্ট তৈরি করেছিলেন আমাদের সায়েব। সেই শেষ, দীনবন্ধু আর ফেরেন নি।

লুঙ্গি পরে চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সায়েব আমাকে এক একদিন এক একটা মজার গল্প বলতেন। দীনবন্ধু এনড্রুজকে তিনি চার্লি বলে ডাকতেন। সায়েব বললেন, "ফোর্ট উইলিয়মে তখন আমি কর্নেল। সিক্রেট সার্ভিসের দায়িত্ব রয়েছে আমার ওপর। দু'জন বিপজ্জনক লোকের যাতায়াত সম্পর্কে তখন প্রায়ই

গোপন টেলিগ্রাম আসতো। একজনের নাম এম এন রায়। আর একজনের নাম চার্লি এনড্রুজ। তখন সবে এদেশে এসেছি। এই এনড্রুজই যে আমাদের কলেজের চার্লি তা কেমন করে জানবো? তারপর একদিন হঠাৎ চার্লির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। আমি ততোদিনে মিলিটারী ছেড়ে কলকাতায় ব্যারিস্টারি শুরু করেছি। জোর করে চার্লিকে মিডলটন স্ট্রিটের বাড়িতে ধরে নিয়ে এলাম, অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব করে পুরনো বন্ধুত্ব আবার ঝালিয়ে নেওয়া গেলো।"

সায়েব বললেন, "আমাদের কেমব্রিজ ডিনারে চার্লিকে নেমন্তন্ন করলাম। কেমব্রিজের প্রাক্তন ছাত্ররা বছরে একবার ডিনারে জড়ো হতাম। চার্লি বললো, 'আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না।' জিজ্ঞেস করলাম, তোমার অসুবিধা কী? চার্লি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো, 'নোয়েল, তোমাদের পার্টিতে যাবার মতো কোনো ডিনার স্যুট বা ভাল জামাকাপড় আমার নেই।' আমি বললাম, চার্লি আমাদের এই মিটিং বড়লাটের দরবার নয়। তুমি যা-খুশি পরে আসতে পারো, এমন কি লুঙ্গি পরে এবং গায়ে গামছা জড়িয়ে এলেও আমাদের আপত্তি থাকবে না।"

আমাদের দু'জনের মধ্যে যখন এই রকম গল্পগুজব চলতো তখন দেওয়ান সিং চা এনে হাজির করতো। চায়ের সঙ্গে সায়েবের পুরনো দিনের গল্প আরও জমে উঠতো। তারপর কাজ আরম্ভ হতো, ব্রীফের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে সায়েব ডিকটেশন দিতেন। কিছু কিছু চিঠিও লিখতেন। আমি শর্টহ্যাণ্ডে ডিকটেশন নিয়ে টাইপরাইটারে টাইপ শুরু করতাম এবং সায়েব নথিপত্রের জঙ্গলে ঢুকে পড়তেন।

আরও একটা মজার দায়িত্ব এসেছিল এই সময়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সায়েব নিজের স্মৃতিচিত্র লেখা শুরু করেছিলেন। স্টেটসম্যান পত্রিকার তখনকার সম্পাদক জনসন সায়েব ছিলেন সায়েবের টুকরো টুকরো হাসির গল্পের মস্ত ভক্ত। তাঁর বিশেষ অনুরোধ, রবিবারের কাগজে সায়েবকে ধারাবাহিক লিখতে হবে।

এই স্মৃতিকাহিনীর সবটাই আমি ডিকটেশন নিয়েছি। আইনের কাজকর্ম চুকিয়ে, দরজা ভেজিয়ে, তিনি ঘরের নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিতেন এবং সোফায় বসে চোখ বন্ধ করতেন। ফিরে যাবার চেষ্টা করতেন উনবিংশ শতকের শেষ দশকে—তাঁর বাল্যে এবং ছাত্র-জীবনে। তারপর ধীরে ধীরে ডিকটেশন শুরু করতেন। আমি শর্টহ্যাণ্ডের খাতায় প্রতিটা অক্ষর সযত্নে লিখে নিতাম।

আমি সামান্য ব্যারিস্টারের বাবু, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষা তখনও নেই আমার। কিন্তু সায়েব মাঝে মাঝে স্মৃতিকাহিনী সম্পর্কে আমার মতামত চাইতেন। জিজ্ঞেস করতেন, "কেমন হচ্ছে?"

আমি লজ্জা পেতাম, কিন্তু তিনি ছাড়তেন না। হাসতে হাসতে বলতেন, "তুমি মনের ভাব চেপে রাখতে পারো না, মাই ডিয়ার বয়। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি, আমি কেমন লিখছি।"

এক একদিন শুরু হতো সাহিত্যচর্চা। সায়েব পড়ে শোনাতেন গিলবার্টের 'ব্যাব ব্যালাড'। হাসির কবিতা শুনিয়ে আমাদের গোমড়া মুখে হাসি ফুটিয়ে ওঁর খুব আনন্দ হতো। আবার কোনোদিন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস্ এবং বায়রন। গম্ভীর হয়ে বলতেন, "তোমাদের সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি যে শেষোক্ত মহাকবির সাহিত্য এবং জীবন সম্পর্কে কোনোরকম অশোভন ইঙ্গিত আমি সহ্য করবো না। কারণ তিনি আমার আত্মীয়। সুদূর হলেও, বায়রনী রক্ত আছে এইখানে।" এই বলে সায়েব নিজের হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন।

একদিন সায়েব আমাকে বেশ বিপদে ফেলে দিলেন। বেশ মনে আছে দিনটা ছিল শনিবার। ঘরের মধ্যে অন্য কেউ নেই, আমি টাইপের কাজ শেষ করে টেবিল গুছোচ্ছি। এবার বাড়ি পালাবো।

এমন সময় সায়েব বললেন, "শংকর, তোমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন আছে।"

চমকে উঠতাম, যদি না নজরে পড়তো সায়েব মিটমিট করে

"টাইপে ভুল থাকলে আমি তা হাতে ঠিক করে নিতে পারি," সায়েব উত্তর দিলেন।

এরপর সায়েব যা বললেন তাতে আমি সত্যিই বিব্রত বোধ করলাম। সায়েবের বক্তব্য, "শংকর, আমি তোমাকে সিনেমা দেখিয়েছি, খাইয়েছি, কিন্তু তুমি আমাকে এখনও খাওয়াও নি। কাল রবিবার, তুমি আমাকে সিনেমা দেখাবে এবং খাওয়াবে।"

যদিও প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, তবুও লজ্জা পাবার কথা। আমার তদানীন্তন আর্থিক অবস্থা বুঝতেই পারছেন। এই ইংরেজ সায়েবের সঙ্গে তাল দিয়ে আমি কেমন করে তাঁকে ফ্রেণ্ডের মতো খাওয়াবো এবং সিনেমা দেখাবো? মাথাটা ঘুরে গেলো।

তবু সায়েব নিজেই যখন কথা তুলেছেন তখন একটা কিছু করতেই হবে। বললাম, "বেশ, আপনার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন কালকেই খাওয়াবো।"

সায়েব কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে ফিসফিস করে বললেন. "একজন ভদ্রলোক, তিনি যতই লোভী হোন, তাঁকে এইভাবে নিমন্ত্রণ করলে তিনি কি তা গ্রহণ করতে পারেন? তাঁকে বলো. আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিস্টার বারওয়েল। আপনি যা ব্যস্ত থাকেন. তাই খুব ইচ্ছে সত্ত্বেও এতোদিন আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে সাহস করি নি। যদি আপনার অন্য কোনো এনগেজমেণ্ট না থাকে, তা হলে হোয়াট অ্যাবাউট টুমরো? এই শর্ট নোটিসের জন্যে আমি লজ্জিত।"

নির্দেশ মতো মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললাম, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিস্টার বারওয়েল। আপনি যা ব্যস্ত থাকেন, তাতে·· ইত্যাদি ইত্যাদি। হোয়াট অ্যাবাউট আগামী কাল? খুব ব্যস্ত আছেন নাকি?"

সায়েব বেশ কায়দায় অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, "ও ডিয়ার শংকর, আপনার এই কাইণ্ড ইনভিটেশনের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আপনি যখন নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন তখন আমার কোনো কাজই কাজ

শুভরাত্রি জানিয়ে, হাসিমুখে ক্যালকাটা ক্লাব থেকে তো বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু বেশ চিন্তা আরম্ভ হলো। ইনি তো আর যেমন-তেমন অতিথি নন। সায়েবকে খাওয়াতে-দাওয়াতে, সিনেমা দেখাতে বেশ খরচের ধাক্কা। এঁকে নিয়ে তো বৌবাজারের বঙ্গলক্ষ্মীতে ভাত এবং কলেজ স্ট্রিটে জ্ঞানবাবুর দোকানে চা খাওয়ানো যায় না!

সৌভাগ্যক্রমে আমার একটা গোপন তহবিল ছিল। আকস্মিক বপদ-আপদের মোকাবিলা করার জন্য বইয়ের আলমারির পিছনে একটা খামে লুকিয়ে-রাখা চল্লিশ টাকার স্মরণ নিলাম।

এই টাকা নিয়ে রবিবার দিন যথাসময়ে ক্যালকাটা ক্লাবে হাজির হলাম। আমার পরনে ধুতি শার্ট. পাশ পকেটে ধুতির কোঁচা, আর বুকপকেটে বিপত্তারণ ফাণ্ডের বহুমূল্য সঞ্চয়।

সায়েব আমাকে দেখেই সস্নেহে অভ্যর্থনা করলেন, "গুড মর্নিং, মাই বয়!"

তারপর অভিনয়ের সুরে বললেন, "মহাশয়, আপনার জন্যেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।"

আমি মফস্বলের ছেলে, অতশত সামাজিকতা জানি না। কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু একমুখ হেসে ফেললাম।

সায়েব বললেন, "শংকর, আমি একটু বাথরুমে যাচ্ছি। টেবিলে তোমার নামে একটা চিঠি রয়েছে। তুমি ততক্ষণ দেখো।"

খামটা খুলে আমি তাজ্জব। তার মধ্যে কোনো চিঠি নেই। আছে ছ'খানা দশটাকার নোট!

একটু পরেই সায়েব গম্ভীর হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, "মহাশয়, আপনি যদি চান আমি এখনই বেরোতে প্রস্তুত।"

আমি বললুম, "তাহলে যাওয়া যাক।"

সায়েব বললেন, "আপনার নিমন্ত্রণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আপনার মধুর সান্নিধ্যে আজকের ডিনারটি আমি উপভোগ করবো।"



ঘর থেকে বেরিয়ে ক্লাব লাইব্রেরির দরজায় সায়েবের সঙ্গে বিরাট এক কোম্পানির জাঁদরেল বড়কর্তার দেখা হলো। "হ্যালো নোয়েল, কেমন আছো?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

সায়েব বললেন, "তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন··· ···কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার স্যার······আর ইনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু এবং সহকারী মিস্টার শংকর। শংকর আজ ভেরি কাইণ্ডলি আমাকে লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন।"

নিজের বাবুর সঙ্গে লাঞ্চ খাবার পরিকল্পনাটা এই জাঁদরেল ইংরেজ বোধহয় তেমন উপভোগ করলেন না। তবু ভদ্রতা সহকারে তিনি আমাকে বললেন, "হাউ ডু ইউ ডু? আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রীত হলাম।" তারপরে সায়েবকে বললেন, "হাউ নাইস।"

সায়েব যেভাবে আমাদের সঙ্গে মেশেন তা তাঁর সমপর্যায়ের অনেক লোক পছন্দ করেন না। কিন্তু আমাদের সায়েব ওসব মোটেই তোয়াক্কা করেন না। একবার ওঁকে বলেছি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের ডাইনিং হল্-এ খেতে যাবেন না। সায়েব গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছেন, "আমার কাছে তোমার বন্ধুত্ব ওঁর সান্নিধ্য থেকে এক হাজার গুণ মূল্যবান। ভবিষ্যতে আমার কাছে এ-বিষয়ে কখনও কথা তুলবে না। আমি কী করছি তা বোঝবার মতো বয়স আমার হয়েছে।"

সেদিনও তাই আর অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম না। আমরা দু'জনে নুড়ি-বেছানো পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এবার ক্লাবের বাইরে গেটের সামনে দাঁড়ালাম।

পশ্চিম দিক থেকে একটা ট্যাক্সি আসছিল। সেইটা ধরলাম। গেট খুলে আমি ঢুকতে যাচ্ছিলাম। আমার হাতে চাপ দিলেন সায়েব। ফিসফিস করে বললেন, "আমি তোমার গেস্ট। অতিথিকে আগে গাড়িতে বসাতে হয়।"

আমি ব্যাপারটা বুঝে, গাড়ির হাতল ধরে বললাম, "মিস্টার বারওয়েল, আপনি ঢুকুন।"

সায়েব সঙ্গে বললেন, "তা হয় না। আগে আপনি, তারপর আমি মিস্টার শংকর। তাছাড়া আপনি তো জানেন, ক'দিন আমি বাঁ কানে একটু কম শুনছি, সুতরাং আমি আপনার বাঁ দিকে থাকতে চাই।"

ট্যাক্সিতে চড়ে আমরা কলকাতায় কয়েকটা জায়গায় উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ঘুরলাম। সায়েব বহু ইতিহাসের কথা শোনালেন, সেই সঙ্গে পুরানো যুগের নানা গল্প। মাঝে মাঝে মুচকি হেসে আমাকে বললেন, "আপনার এই আতিথেয়তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, একটা খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে সায়েব বললেন, "হোস্ট চুপ করে থাকলে অতিথির যে মনে লাগবে। তুমি উত্তর দাও, না মহাশয়, আপনার সুমধুর সান্নিধ্যের আনন্দ পুরোপুরি আমারই।"

পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয় সেদিন আমাদের লাঞ্চ হয়েছিল তারপর ট্যাক্সিতে চড়ে মেট্রো সিনেমাতে গিয়েছিলাম।

আমি টিকিট ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে টিকিট কাটতে যাচ্ছিলাম। সায়েব ফিসফিস করে আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, "আমাকে হল্-এর প্ল্যানটা দেখতে অনুরোধ করো। জিজ্ঞেস করো, কী ধরনের সীট আমি পছন্দ করবো।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "কি ধরনের সীট আপনি পছন্দ করবেন মিস্টার বারওয়েল? প্ল্যানটা দেখুন।"

সায়েব হাঁ হাঁ করে উঠলেন। "যে-কোনো সীট মিস্টার শংকর। তবে সীটটা অবশ্যই আপনার পাশে হওয়া চাই। আর প্লিজ, খুব দামী টিকিট কিনবেন না। সিনেমা দেখাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, দামী সীটে বসা নয়।"

ইন্টারভ্যালের সময় ফিসফিস করে সায়েব মনে করিয়ে দিলেন, "আমি আইসক্রিম কিংবা কফি খাবো কিনা তা এখনও পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করো নি কিন্তু! দেখছো না সেই জন্য আমি কেমন মুখ গোমড়া করে বসে আছি।"

আতিথেয়তার ত্রুটি বুঝতে পেরে আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, একটা আইসক্রীম হোক? কিংবা কফি?"

আমার অতিথি এবার উত্তর দিলেন, "থ্যাংকস, কিন্তু এখন কিছুই নয়। আমাকে যা লাঞ্চ খাইয়েছেন তাই সামলাতে পারছি না।"

সিনেমার শেষে আমরা পার্ক স্ট্রীটের নাম-করা চায়ের দোকান ফ্লুরিতে গিয়েছিলাম। বেয়ারা আমাদের টেবিলে অনেকগুলো কেক রেখে গেলো। আমি বেয়ারাকে ডেকে বলতে যাচ্ছিলাম, এতো কেক আমাদের দরকার নেই। সায়েব ফিসফিস করে জানিয়ে দিলেন, "ওকে কিছু বলবার দরকার নেই। আমরা প্লেট থেকে যে ক'টা পেসট্রি তুলে নেবো, শুধু সেই ক'টার দাম নেবে।"

ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না। আমার ভয় হয়েছিল, টেবিলে যখন দিয়েছে, খাই-না-খাই পুরো দামটা আমার কাছ থেকে আদায় করবে। মনের সন্দেহ না চেপে রেখে সরল মনে জিজ্ঞাসা করলাম, "ও কী করে বুঝবে, আমরা ক'টা খেলাম?"

সায়েব পরম স্নেহে বুঝিয়ে দিলেন, "বিয়োগ করে। ওরা জানে ক'টা পেসট্রি টেবিলে দিয়েছে, বিল করবার সময় দেখবে ক'টা পড়ে আছে।"

চা খাওয়ার সময় অনেক গল্প হলো। সায়েব আবার গম্ভীর-ভাবে বললেন, "আপনি যে সিনেমাটা দেখালেন চমৎকার। আপনার ছবির নির্বাচন খুব সুন্দর হয়েছে।"

এবার বিল এলো। চার টাকা চার আনার মতো বিল। একটা পাঁচ টাকার নোট দিলাম। বেয়ারা ভাঙানি ফেরত নিয়ে এলো। সায়েব চোখের ইঙ্গিতে আমাকে সমস্ত চেঞ্জটাই প্লেটে রেখে দিতে বললেন। বেয়ারা কিছুই বুঝলো না, ভাল টিপস্ পেয়ে আমাকে একটা লম্বা সেলাম দিলো। আমি বুক ফুলিয়ে গট গট করে অন্যসব কেষ্ট-বিষ্টু খদ্দেরের মতো দোকানের বাইরে এসে ডাকলাম, "ট্যাক্সি।"

এবার আর ভুল করিনি। সায়েবকে গাড়ির মধ্যে আগে ওঠবার জন্যে অনুরোধ করলাম।

আমাকে খুশী করবার জন্যই বোধ হয় সায়েব এবার আগে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

যখন আমরা ফিরলাম, ক্যালকাটা ক্লাবের বাতিগুলো তখন জ্বলে উঠেছে। গাড়ি থেকে নেমে, সায়েব বললেন, "আপনাকে কীভাবে ধন্যবাদ দেবো জানি না। আপনার এই আতিথেয়তা এবং দয়া আমার বহুদিন মনে থাকবে।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "আনন্দটা আমারই। আপনার সান্নিধ্য খুব ভাল লেগেছে!"

সায়েব এবার আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "বাঃ, চমৎকার উত্তর হয়েছে।"

ক্লাবের স্কয়ারে দাঁড়িয়েই সায়েব বললেন, "আপনার যদি অন্য কোনো এনগেজমেন্ট না থাকে, তাহলে আজ আমাকে ডিনারে সঙ্গ দিন। আপনাকে কোনো নোটিস না দেওয়ার জন্য লজ্জিত- কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে যা সম্পর্ক তাতে এইভাবে ডিনারে নিমন্ত্রণের অধিকার আমার আছে।"

ডিনার পর্যন্ত থেকে গিয়েছিলাম সেদিন। ভারি ভাল লাগছিল। এ যেন নতুন ধরনের খেলা সারাদিন ধরে আমরা খেলে এলাম। কাশুন্দের একটা আধা-গ্রাম্য ছেলের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সায়েব কি পরম স্নেহে সারাদিন ব্যয় করেছিলেন, তখন বুঝি নি। কিন্তু আজ এতোদিন পরে বিদেশগামী প্লেনের সীটে বসে সমস্ত জিনিসটার কথা ভাবতে গিয়ে কেমন যেন গল্প গল্প মনে হলো - চোখদুটো অকারণেই অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে। সংসারের মাঠে ঘাটে এতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরও আমার এই দোষটা গেলো না। আমার হৃদয়ের ওপর কিছুতেই আবরণ টানতে পারি না —একটুতেই সেই বিরলকেশ সদাহাস্যময় বিদেশী মধুসূদনদাদার কথা মনে পড়ে যায়, যিনি আমাকে এই বিরাট পৃথিবীর জটিল জীবনে প্রবেশ করার সাহস ও সুযোগ দিয়েছিলেন।

সেদিন রাত্রে ডিনারের পরও বেশ কিছুক্ষণ ক্যালকাটা ক্লাবে

থেকে গিয়েছিলাম। আমার মধ্যেকার সেই লাজুক, সদাসন্ত্রস্ত ও বিব্রত বালকটি হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠেছিল। প্রাণ খুলে কত কথাই হচ্ছিল সায়েবের সঙ্গে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি সামান্য একজম 'বাবু', আমার চামড়ার রং কালো, আর ইনি একজন ব্যারিস্টার এবং সাতসাগরের ওপার থেকে এসেছেন। মজার গল্প শোনাতে শোনাতে সাহেব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "মাই ডিয়ার বয়, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে আমার।"

কথা তো সারাদিনই হচ্ছে। আরও কী কথা থাকতে পারে? আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম।

সায়েব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। "কিছু বলবো বলেই তোমাকে ধরে রেখেছি।"

সায়েবকে সাধারণত এমন গম্ভীরভাবে কথা বলতে দেখি না। আদালতে অবশ্য ওই রকমভাবে তিনি সওয়াল করেন। তাঁর এই রূপটা আমার ভাল লাগে না।

সায়েব এবার বললেন, "মাই ডিয়ার বয়, ক'দিন থেকেই তোমাকে বলে রাখবো ভাবছি। আমার বয়স হচ্ছে, আমি দেখে যাবো কিনা জানি না, কিন্তু তুমি নিজে কখনও ভুলো না, তুমি একজন অসাধারণ মানুষ—ইউ আর অ্যান এক্‌সেপশনাল পার্সন।"

পরমুহূর্তেই হাল্কা হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর সমস্ত মুখে দুষ্টুমিভরা ছেলেমানুষী হাসি ছড়িয়ে পড়লো। বললেন, "রাত অনেক হয়েছে, তোমাকে বাড়ি যেতে হবে। আমাকেও কাল মাদ্রাজে রওনা দিতে হবে কেসের জন্য। তার আগে ছেলেবেলার দুষ্টুমির জন্যে যা করতাম তাই করা যাক। ইস্কুলে কোনো ছেলের কান মলবার ইচ্ছে হলে বলতাম, মাই ডিয়ার জন, তোমার এবং আমার মধ্যে যে কোনো-রকম অপ্রীতি নেই তা প্রমাণ করবার জন্যে তোমার কানটা মলে দিচ্ছি।" এই বলে আমার কানটাই মলে দিলেন সায়েব "ইন অর্ডার টু প্রুভ দ্যাট দেয়ার ইজ নো ইল ফিলিং বিটউইন ইউ অ্যাণ্ড মি।"

সায়েব এবার ভিতরে চলে গেলেন। আর আমার মনে হলো আমার দেহে বিদ্যুতের প্রবাহ শুরু হলো। আমি যেন কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে এতোদিন সংজ্ঞাহীন ছিলাম, বিদ্যুতের মন্ত্রে কে আমাকে অকস্মাৎ জাগিয়ে তুলেছে। উত্তেজনায় আমার দেহের প্রতিটা রোমকুপ খাড়া হয়ে উঠলো।

পরমুহূর্তে ভীষণ লজ্জা বোধ হলো। মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। মনে হলো, বেয়ারা দেওয়ান সিং আড়ালে দাঁড়িয়ে সায়েবের কথাটা শুনেছে—আমি এক্সেপশনাল, আমি অসাধারণ! আমার মনে হলো, দেওয়ান সিং অবজ্ঞায় হা-হা করে হাসছে। বলছে, 'ওই চলেছেন অসাধারণ পুরুষ! ইনি থাকেন হাওড়ায়। বিদ্যে আই-এ পর্যন্ত, চাকরি করেন ব্যারিস্টারের বাবুদের বেঞ্চিতে!'

কিন্তু কোথায় দেওয়ান? সে তো এখানে নেই। তবু আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি লুকিয়ে পালাতে চাই। কিন্তু আমি ধরা পড়ে গিয়েছি। মনে হলো, ক্লাবের রিসেপশন টেবিলের বাবুরা বোধহয় ব্যাপারটা জেনে ফেলেছেন। তাঁরা বলছেন, 'একজন বাবুকে কেউ রসিকতা করে অসাধারণ বলেছিল, আর সে কেমন বেমালুম তা বিশ্বাস করে বসে আছে!' আমাকে দেখে ওঁরা চিৎকার করে বলছেন, 'ওই চলেছেন এক্সেপশনাল পারসন!'

আমি কোনো কথায় কান না দিয়ে নিজের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু গেটের নেপালী দারোয়নটাও হাসছে।

গেট থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গী রোড ধরে আমি বেশ জোরে উত্তর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছি। আমার মনে হলো রাজপথের প্রতিটা ল্যাম্প-পোস্ট আমাকে ব্যঙ্গ করছে, বৈদ্যুতিক ইসারায় হাসতে হাসতে বলছে, 'ওই চলেছেন অসাধারণ পুরুষ।'

আমি এখন কী করি? এদের কাছ থেকে আমি পালাতে চাই। নিজের অজান্তেই আমি দৌড়তে আরম্ভ করেছি। দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাচ্ছি, আর করজোড়ে বলছি, "আমাকে আপনারা ব্যঙ্গ করবেন

না। আমি কী করবো? আমি তো কিছুই জানি না। অনেক দূরের একজন বিদেশী সায়েব নিজে থেকেই আমাকে এইসব কথা বলেছেন।”

চৌরঙ্গী রোড ধরে দৌড়তে দৌড়তে থিয়েটার রোডের মোড়ে এসে আমি পশ্চিমদিকে ঘুরে পড়েছি। ওদিকে তখন বেশী আলো ছিল না। বিড়লা তারামণ্ডলের বাড়িও তখন তৈরি হয় নি; অনেক বড় বড় গাছ ছিল ওখানে। প্রায়ান্ধকারে বিরাট একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমি একটু স্বস্তি পেলাম। এবার গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আমার দৃষ্টি হঠাৎ তারাভরা প্রসন্ন আকাশের দিকে প্রসারিত হলো। কী আশ্চর্য! সুদূর আকাশের তারারা আমার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে আছে—আমাকে মোটেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে না।

প্রায় টলতে টলতে একটা হাওড়াগামী বাসের পাদানিতে উঠে পড়েছিলাম।

বাড়িতে ফিরেও শান্তি পাই নি। চোখে একবিন্দু ঘুম এলো না। গভীর রাতের অন্ধকারে সরু সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসেছিলাম। সুনীল আকাশের সোনালী তারারা আজ আমার সঙ্গে কথা বলছে। তারা আমাকে মোটেই ব্যঙ্গ করলো না, বরং স্নিগ্ধ ইসারায় আশা দিচ্ছে, ভরসা দিচ্ছে।

আকাশের দিকে একমনে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ভোর হয়ে গিয়েছিল খেয়াল করি নি।

বিশ্বাস করুন, অবিস্মরণীয় সেই বিনিদ্র রাত্রে আমার মধ্যে নতুন এক আমি জন্মগ্রহণ করলো। বিশ্বাস করুন, যে-আমি সকালবেলায় চল্লিশ টাকা পকেটে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, আর এই-আমি এক নয়। যে পারে সে এমনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে। এমনিভাবেই সে মানুষের মনের গহন অন্ধকারে গভীর ঘুমে অচেতন পৌরুষকে জাগাতে পারে। ঘুম-থেকে-ওঠা এই নতুন আমি

আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। সে বলছে, "আমি চেষ্টা করবো। আমি নিজেকে অবশ্যই মধুসূদনদাদার বিশ্বাসের যোগ্য করে তুলবো।"

এমনই ভাগ্য, সায়েবের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। পরের দিন তিনি মাদ্রাজে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই অকস্মাৎ শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি আর কথা বলার সুযোগ পাই নি।

মাদ্রাজ থেকে পাঠানো দেওয়ান সিং-এর সেই সর্বনাশা টেলিগ্রামটা হাতের মুঠোয় ধরে ভাগ্যহীন আমি ভেবেছি, পৃথিবীতে আমার কেউ রইলো না। আমি একা হয়ে গেলাম।

তারপর শোকের প্রথম তরঙ্গ যখন কেটে গেলো, তখন বিষণ্ণ হৃদয়ে এই বিশাল কলকাতার বিরাট জনপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে ভেবেছি এই দয়াহীন উদাসীন স্বার্থসর্বস্ব পৃথিবীতে অন্তত এমন একজন ছিলেন যিনি আমাকে ভালবেসেছিলেন—আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন। যিনি ভেবেছিলেন আমি অসাধারণ—একজন অর্ধশিক্ষিত অসহায় দরিদ্র যুবকেরও পৃথিবীতে কিছু দেবার রয়েছে।

আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, এই মানুষের মর্মর মূর্তি গড়িয়ে প্রশস্ত রাজপথের মোড়ে রেখে দিতাম। কিন্তু মূর্তি গড়া কি অত সোজা? তার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে! সামান্য একটা তৈলচিত্র তৈরির আর্থিক সামর্থ্যও ছিল না আমার। বড় ইচ্ছা হতো ওঁর একটা বিরাট ছবি তৈরি করে পৃথিবীর মানুষদের দেখাই। বলি, 'আপনারা আমাকে যাই ভাবুন, পৃথিবীতে একজন আমার ওপর ভরসা রেখেছিলেন।' শহরের জননেতাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা থাকলে সায়েবের নামে একটা রাস্তার নামকরণ করা যেতো। কলকাতায় কত রাস্তা রয়েছে তো। সাহস সঞ্চয় করে এক স্বদেশী নেতার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমার কথা শুনে বকুনি লাগালেন, "তোমার লজ্জা করে না? জানো না ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে? স্বদেশী ভারতবর্ষে তুমি এসেছো ফরেন সায়েবের নামে রাস্তা করাতে!"

হতাশ হয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। সামান্য মানুষ আমি। যতই বলি তিনি এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন, কেউ যে আমার কথা শুনতে চায় না। এখন আমি কী করি? আমাকে কিছু করতেই হবে। তিনি যে আমাকে বলে গিয়েছিলেন, নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না।

আর কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন লিখতে শুরু করেছিলাম। লেখা থাক, না হলে কোনো দিন হয়তো স্মৃতিও বিশ্বাসঘাতকতা করবে। অনেক অনেক দিন পরে যখন বৃদ্ধ হবো, তখন ছোট ছোট ছেলেদের ডেকে বলবো, 'শোনো, গল্প শোনো। আমি যখন ছেলেমানুষ, তখন সাতসাগরের ওপার থেকে আসা এক অরুণবরণ রাজপুত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। মানুষকে তিনি ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন। একদিন রাত্রে তিনি আমার মধ্যে অন্য কাউকে দেখেছিলেন যে আমার থেকে অনেক অনেক বড়।'

তার পরের কাহিনী পাঠকদের অজ্ঞাত নয়। একদিন পাকে-চক্রে আমার সেই লেখা সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষের অনুগ্রহে দেশ পত্রিকার সাগরময় ঘোষকে দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই লেখা যথাসময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—অবশেষে, 'কত অজানারে' বই।

এই পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে ছোট একটা গল্প মনে পড়ছে। সায়েবই বলতেন, "শংকর, পরের জন্মে আমি বাংলাদেশের জামাই হবো।" তারপর আমার দিকে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতেন "তুমি ভাবছো বাংলাদেশের মেয়েরা পদ্মলোচনা এবং গজেন্দ্রগামিনী বলে আমি এখানকার জামাই হতে চাই? মোটেই তা নয়। আমার নজর বাংলাদেশের শাশুড়ীদের দিকে। বাঙালী শাশুড়ীদের তুলনা পৃথিবীতে নেই। তাঁদের দয়ার শেষ নেই। নতুন জামাই শ্বশুরবাড়িতে এসে দশ টাকা দিয়ে নমস্কার করলে শাশুড়ী আশীর্বাদ করে কুড়ি টাকা ফেরত দেন। বিয়ের পর আমি ধার করে লক্ষ টাকা নিয়ে যাবো। সেই টাকার তোড়া নিয়ে নমস্কার করলে

শাশুড়ীকে। তারপর বড়লোক হয়ে বাকী জীবন সুখে শান্তিতে কাটিয়ে দেবো।"

তখন ভাবতাম, সায়েব রসিকতা করছেন। পরে বুঝেছি, মোটেই রসিকতা নয়। লেখার মাধ্যমে আমি তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রাতারাতি আমিই অনেকের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলাম। আমি নাকি সাহিত্যিক, সত্যদ্রষ্টা শিল্পী। যা তাঁকে করজোড়ে নতমস্তকে নিবেদন করেছিলাম, মরণ সাগরের ওপার থেকে তিনি তা দ্বিগুণ করে ফেরত দিলেন।

নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে এখন নিজেকে মাঝে মাঝে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। তখন কেন তাঁকে মাত্র এক টাকা দিয়ে নমস্কার করেছিলাম? যদি তাঁকে লক্ষ টাকা দিয়ে নমস্কার করতাম—কষ্ট করে, চেষ্টা করে সাতসাগর পারের সেই আশ্চর্য রাজপুত্রের কথা যদি সত্যিই আরও ভাল করে লিখতাম, তা হলে আরও কত কি পেতাম কে জানে?

বিলেতের মাটিতে পা দিয়ে প্রথম সুযোগেই যে বিদেশিনীর খোঁজ-খবর করবো ঠিক করেছিলাম তার নাম এডিথ। কিন্তু পটলদার কথা না বললে এডিথকে একটুও বোঝা যাবে না। তেহেরান বিমান বন্দরে আমাদের প্লেন অনেকক্ষণ থেমেছিল। ওই সময় পটলদার ব্যাপারটা ডায়রিতে নোট করে নিয়েছিলাম।

পটলদা মানে শ্রীপটলকুমার হাজরা।

পটলদা কোনোদিন বিলেত যাবেন এবং মেম বিয়ে করবেন স্বয়ং ভৃগুও যদি একথা পটলদার ছাত্রাবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, তাহলে আমাদের ইস্কুলের সহপাঠীদের অর্ধেক হাসতে হাসতে মারা যেতো। ক্লাসের পিছিয়েপড়া ছেলেদের অন্যতম পটলদার গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা ছাড়া আর কিছু মূলধন ছিল না। ইস্কুলে ইংরিজীর মাস্টারমশায় হরনাথবাবু বলতেন, "আমি কোন ছার! পঞ্চতন্ত্রের বিষ্ণুশর্মা এবং স্বয়ং নেসফিল্ড সায়েব দু'জনে একসঙ্গে চেষ্টা করলেও পটলকে ইংরিজী শেখাতে পারবেন না।"

সকলের সামনে এই ধরনের অপমানকর মন্তব্য শুনেও পটলদার কোনো লজ্জা হতো না, মাথাও নিচু করতেন না। বরং ঠোঁট টিপে হাসতেন। মাস্টারমশায় আরো রেগে উঠে বলতেন, "বেহায়া, এখনও হাসছিস!" পটলদা তবুও একগাল হাসিতে মুখ ভরিয়ে রাখতেন।

পড়াশোনার লোকসানটা পটলদা দুষ্টুমিতে পুষিয়ে নিতেন। সে বিষয়ে তিনি বলতে গেলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চুপচাপ দুমিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না পটলদা। সব সময় নিজের শক্তি পরীক্ষা করতেন হয় কোনো সহপাঠী ছাত্রের ওপর অথবা ইস্কুলের কোনো সম্পত্তির ওপর। মাংসপেশীর ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে পটলদা একবার ইস্কুলবাড়ির বারান্দার একখানা রেলিং উপড়ে ফেলেছিলেন। তখন পটলদা

ক্লাস সেভেনের ছাত্র। আর বেঞ্চি? সে-প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। এ-বিষয়ে তাঁর সুনাম এমনই ছড়িয়ে পড়েছিল যে কোনো ক্লাসে ভাঙা বেঞ্চি বেরোলেই আমাদের গজু বেয়ারা প্রথমেই পটলদার নামে রিপোর্ট করতো।

অফিস ম্যানেজার সনাতনবাবু তখন পটলদাকে ডেকে বলতেন, "পটলা, ঠিক করে বল, ক্লাস ফাইভে গতকাল যে-দুখানা বেঞ্চির পা ভাঙা পাওয়া গিয়েছে সেটি কার কর্ম?"

পটলদা কিন্তু খুব সত্যবাদী ছিলেন। পিটুনি খাবার ভয়েও মিথ্যে কথা বলে বেরিয়ে আসতেন না। দোষ করে থাকলে স্বীকার করতেন। সনাতনবাবুকে বলতেন, "স্যার, একবারে পল্কা কাঠ। কিল কমপিটিশনে ফার্স্ট হতে গিয়ে বেঞ্চিটা মট করে ভেঙে গেলো।"

"বেঞ্চির ওপর ছুরি দিয়ে ছবি এঁকেছে কে?" সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করতেন।

না, ওই কাজটা পটলদা একদম করতেন না। দেওয়ালে পেন্সিলের দাগ কাটা, ছুরি দিয়ে বেঞ্চিতে নাম খোদাই করা, ওসব ছিঁচকে নোংরামির মধ্যে পটলদা কখনো থাকতেন না। তবে ঝেঁকি নন্দীর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে বেচারার হাতটাই ভেঙে দিয়েছিলেন পটলদা। ঝেঁকি নন্দী পরের দিন প্লাস্টার-করা হাত নিয়ে স্কুলে এসেছিল। যথারীতি শাস্তি দেবার আগে হেডমাস্টারমশায় বলেছিলেন, "পটল, তোমাকে যে শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাতে যেতে হবে।"

পটলদা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর লজ্জা পেয়ে সেই বিখ্যাত হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন, যার নাম দেওয়া হয়েছিল পটল-হাসি। অর্থাৎ এই হাসির মালিক অনুতপ্ত, না উদ্ধতভাবে অপরাধের পুনরাবৃত্তির ফন্দি আঁটছে তা মুখ দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। হেডমাস্টারমশায় আড়ালে বলতেন, "পটলাকে বেত মেরেই বা লাভ কী? ও নড়েও না, চড়েও না, কাঁদেও না, যন্ত্রণায় মুখও বেঁকায় না। ওর অপমানজ্ঞানও নেই।"

আর পুলিসের ভয়? সে দেখিয়ে লাভ নেই। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় পটলদার বীরত্ব আমরা নিজের চোখে দেখেছি। ডালমিয়া পার্কে ছাত্রদের মিটিং হচ্ছিল। আমরাও গিয়েছিলাম ইংরেজকে ভারতছাড়া করতে। এমন সময় পুলিস এসে পড়লো। তখন প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারলো দৌড় মারলো। জনতা ছত্রভঙ্গ। কিন্তু পটলদা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। ভয় পেয়ে লেজ তুলে দৌড়নো তাঁর কোষ্ঠিতে নেই।

দুপুরবেলাতেই খবর রটে গেলো পটলদা গ্রেপ্তার। সেই সঙ্গে আমাদের ক্লাসের দ্বিজপদ বেচারাও পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

পরের দিন পটলদার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আমরা ধর্মঘট করবো ভাবছি। ওমা! পটলদা ঠিক সময়ে গম্ভীরমুখে স্কুলে এসে হাজির। আমরা আশঙ্কা করলাম, পটলদা হয়তো পুলিসের কাছে ক্ষমা চেয়ে খালাস পেয়েছে। পটলদাকে জিজ্ঞেস করতে গম্ভীরভাবে বললেন, "মোটেই না। ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে! হেড কনস্টেবল রামলক্ষ্মণ সিং নাক কান মলেছে যে পটল হাজরাকে আর কোনোদিন অ্যারেস্ট করবে না।"

ব্যাপারটা যে মিথ্যে নয় তা দ্বিজপদর কাছেই জানা গেলো। সে বললো, "আমাদের লক-আপে তো পুরলো। কিন্তু একটু পরেই পটলদা দাবি করলো দুপুরের খাওয়া কই? বাড়ি থেকে না-খেয়ে বেরিয়েছি। পুলিস ওই সময় ভাতটাত কোথায় পাবে? সিপাই কিছু কচুরি এনে দিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে পটলদা আবার ডাকাডাকি শুরু করলো--সিপাইজী বহুৎ খিদে পাতা হ্যায়! ছোট ছেলে দেখে সিপাইজী আবার কোথা থেকে খাবার নিয়ে এলেন। পটলদার খাবার পছন্দ নয়—বললেন, বোঁদে কই? এই সময় বোঁদে না খেলে শরীর খারাপ করে আমার। এর পর পটলদা অন্য ছেলেদের নিয়ে জেলখানার মধ্যে স্লোগান তুলেছিলেন: বোঁদে না খেয়ে মাথা গরম।"

সিপাইজী ভাবলেন, স্বদেশীরা বন্দেমাতরম আওয়াজ তুলছে।

ছুটে গিয়ে দারোগাবাবুকে ডেকে নিয়ে এলেন। পটলদা তাঁকে বললেন, "না স্যর, আমরা আওয়াজ তুলেছি, বোঁদে-না-খেয়ে-মাথা-গরম। বিশ্বাস না হয় আবার স্লোগান তুলছি, আপনি শুনুন।" সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত পটলদার খাওয়ার দাবিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে দারোগাবাবু ওদের সবাইকে ছেড়ে দিলেন। মুখ বেঁকিয়ে ভদ্রলোক বলেছিলেন, এই রকম কিছু বিশ্বপেটুক হাজতে থাকলে আমাকে পাগল হয়ে যেতে হবে!"

এই পটলদা শেষ পর্যন্ত ফেল করে আমার সহপাঠী হয়ে গেলেন। বছরের প্রথম দিনে ইস্কুলে এসে বেশ মুশকিলে পড়ে গেলাম। উঁচু ক্লাসে পড়ার জন্যে ওঁকে এতোদিন 'দাদা' এবং 'আপনি' বলে এসেছি। অনেক ছেলে নির্দয়ভাবে প্রথম সুযোগেই ওঁকে পটল বলে ডাকতে শুরু করে দিলো। আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল। পটলদাই আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "তুই কেন দাদা বলিস? তুই নিয়মিত পাস করে, আর আমি নিয়মিত ফেল করে সমান হয়ে গেছি। এখন আমার দম্ভ থাকা উচিত নয়। আমাকে নাম ধরে ডাকবি।"

কেন জানি না, আমার বড্ড মায়া হয়েছিল। সুযোগটা নিতে পারি নি। পটলদা নিশ্চয় এটা লক্ষ্য করেছিলেন। কেননা আমাকে ওরই মধ্যে একটু বেশী ভালবাসতেন, কখনও ইয়ারকি করেও গাঁট্টা মারেন নি বা পেটের চামড়া টেনে ধরেন নি—শেষোক্ত প্রক্রিয়াটির নাম ছিল মধু-খামচি!

পটলদার মামার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছে। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই রাস্তার ধারে বাসনপত্তর মেরামতির এবং ঝালাইয়ের দোকান ছিল তাঁর। পটলদার মামা বাজারের থলিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে, আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "পটল হাজরা কেমন পড়াশোনা করছে গো?"

আমি কী বলবো? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মামা বললেন, "ওর মায়ের জন্য ভগবান আরও কত দুঃখ তুলে রেখেছেন কে জানে?

এক বছরের এই ছেলেকে নিয়ে দিদি বিধবা হলো। বাড়িতে দেখবারও কেউ নেই। অথচ ছেলেটার মানুষ হবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।”

পটলদা থাকতেন চৌধুরী বাগানে আমাদের বাড়ির খুব কাছাকাছি নবকুমার নন্দী সেকেণ্ড বাই লেনে। কালীবাবুর বাজারের পিছনে হাওড়ার এই অঞ্চলটা প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের একবার দেখে আসা উচিত। আণবিক যুগের সুসভ্য ভারতে আমরা এখনও কী রকম নরক জিইয়ে রেখেছি তা নিজের চোখে না দেখলে অনেকে বিশ্বাস করবেন না।

পটলদার মার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে আমার। মামা বলেছিলেন, “যেও না একবার আমাদের বাড়িতে। দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।”

জটপাকানো সুতোর মতো সরু গলির মধ্যে দিয়ে পাক খেতে খেতে বাগেদের মাঠের কাছে এসেছি। সেখানে বিরাট এক খোলা নর্দমা। তার ওপর বাঁশের সাঁকোটাও নড়বড় করছে। সেইটা পেরিয়ে গেলেই রাস্তার ওপর পর পর তিনখানা খাটা-পায়খানার পিছন-দরজা নজরে পড়বে। সেগুলো ছাড়িয়ে কয়েক হাত এগোলেই একটা ছোট্ট কিন্তু বেজায় পুরোনো একতলা বাড়ি দেখা যায়। প্রায় পড়ো-পড়ো। এখানেই থাকেন পটলদা। বাড়ির পিছনেই উঠোন। উঠোনের ওপরে একই ধরনের আর একটা বাড়ি। সেখানে মামা থাকেন।

নর্দমার ধারে উবু হয়ে মামা বিড়ি খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে দিদির জন্যে হাঁক পাড়লেন। ভাই-এর ডাকে দিদি এদিকে আসতে গিয়েই অজানা পুরুষমানুষ দেখে দ্রুত ঘোমটা দিলেন। মামা বললেন, “ওকে দেখে ঘোমটা দিতে হবে না। পটলার সঙ্গে পড়ে—ওদের ফার্স্ট বয়।”

আমি লজ্জায় পড়ে গেলুম। জানালুম আমি মোটেই ফার্স্ট বয় নই, আমার ওপরে তিন-চার জন ছাত্র আছে। পটলদার মামা বিড়িটা নামিয়ে বললেন, “ওই হলো। গুড বয়!”

দিদির সামনে মামা বললেন, "পটলার কোনো লজ্জা-শরম নেই। উইডোর ওনলি চাইল্ড, কোথায় তুই মায়ের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করবি, তা না ড্যাংগুলি খেলে বেড়াচ্ছিস! আমি তো শ্লা বিধবার একমাত্র ছেলে হলে ইস্কুলের বই থেকে চোখ তুলতাম না।"

পটলদার মা শান্তভাবে এবং বেশ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোমটার আড়াল থেকে ভাইকে বললেন, "সামনের মাসেই তো তের বছর শেষ হচ্ছে—এবার হবে। ওই ছেলেই সংসারের মুখ রাখবে।"

বিড়িতে আর একটা লম্বা টান দিয়ে মামা বললেন, "তোকে আর কী বলবো দিদি! কম বয়সে উইডো হয়েছিস, বাবা বারবার বলে গিয়েছেন—আমোদিনীর মনে কখনও কষ্ট দিস না। তবু তোকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আজকাল সবকিছুতেই ভেজাল। ওই যে তোর ছেলের কোষ্ঠি করিয়ে গিয়েছেন বাবা, ওতেও ভেজাল। তের বছরেও যে-ছেলের কিসস্যু হলো না, সে কী-করে চোদ্দতে পড়ে আশু মুখুজ্জে বনে যাবে?"

আমাকে আবার আসতে বলে আমোদিনী দেবী এবার ভিতরে চলে গেলেন।

আর মামা একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, "পড়াশোনা চুলোয় যাক, পটলাকে শেষ পর্যন্ত আমার ওই রাঙঝালের দোকানেই ঢুকতে হবে। তা শোনো," এই বলে মামা বিড়িতে আর একটা লম্বা টান দিলেন। তারপর অনুরোধ করলেন, "পটলা পড়াশোনায় যাই হোক, ওর ক্যারাকটারের দিকে তোমরা নজর রেখো।"

আমার বয়স কম, ক্যারাকটার কাকে বলে তখন জানতাম না। তাই ফ্যালফ্যাল করে মামার মুখের দিকে তাকালাম। মামা বিরক্ত হয়ে বললেন, "এতোদিন শুধু লেখাপড়া সম্বন্ধে ভেবে এসেছো। এবার ক্যারাকটার সম্বন্ধে সাবধান হবার বয়স হয়েছে তোমারও। বিড়ি খাওয়া, রাস্তায় সমত্থ মেয়েছেলের দিকে তাকিয়ে থাকা, টিটকিরি করা এইসব হলো ব্যাড ক্যারাকটারের লক্ষণ।"

আমি একেবারে তাজ্জব! কারণ মনটা তখনও বয়সের অনুপাতে

দিতুম। তারপর কান ধরে বাড়ি থেকে বার করে এনে দোকানে বসিয়ে দিতুম। বলতুম, লেখাপড়ায় খুব কেরামতি দেখিয়েছিস, এবার ছেঁড়া গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরে ফুটো দালদার কৌটায় রাঙঝাল লাগা।”

আমি কিছু বলি নি। মামার কাছেই শুনলাম, এই বুড়োধাড়ি গোঁফদাড়ি গজানো পটল নিজের মায়ের কাছে কচি ছেলের বেহদ্দ ব্যবহার করে। রাত্রে মায়ের কাছে ছাড়া শোবে না, মা পিঠে হাত বুলিয়ে দেবেন তবে ঘুম আসবে। কলেজ যাবার সময় মাকে পেন্নাম করবে, মা আবার আদর করে চুমু খাবেন!

মামা বলেন, “জানো রাগ হয় খুবই। বিধবার শিবরাত্রির সলতের মতো একটা ছেলে, যা বোঝে করুক! দিদির জন্যই দুঃখ আমার—ছেলের মুখ চেয়ে পড়ে আছে, মানুষের মতো মানুষ হয়ে মায়ের চোখের জল মোছাবে।”

পটলদাও নাকি মাকে ভরসা দিতেন। বলতেন, “ইস্কুলে যতোই খারাপ করে থাকি, দেখো এবার মেক-আপ করে নেবো।” পটলদার মা তাই বিশ্বাস করেন, কারণ ছেলের কোষ্ঠিতে ওই রকম লেখা আছে।

পটলদা ইনজিনিয়ার হবার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু ওই তো রেজাল্ট। ওই তো ইংরিজি জ্ঞান! হাওড়ার বাসে মাঝে মাঝে পটলদার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেট-স্কোয়ার হাতে পটলদা কোথায় যাচ্ছেন। বৌবাজারের কাছে কি এক বেসরকারী কারিগরী ইস্কুল হয়েছে। সেখানে মোটা টাকা খরচ করে পটলদা ঢুকেছেন। পটলদার মা আমার কাছে দুঃখ করেছেন, “মা ও ছেলে দুজনেই ভেসে যাচ্ছে। গয়না বেচে কেউ ওইসব জোচ্চর ইস্কুলে অত টাকা ঘুষ দিয়ে ঢোকে? আর তাও যদি পাস করতে পারতিস। ছেলেটাই দিদির শনি—কলসীর জল গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ করে এনেছে পটলা। গয়নাগাঁটিও গেলো, এবার দিদি পথে বসবে।”

পটলদা কিন্তু মুখে সেই আত্মভোলা হাসি ফুটিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ান।

এই পটলদাই একদিন হাওড়া থেকে উধাও হলেন। আমাদের ক্লাসের একজন ছেলে খবর দিলো, "শুনেছিস, পটলা বিলেত গিয়েছে —ফর হায়ার এডুকেশন!"

পটলদার মামার দোকানে খোঁজখবর নিয়েছি। একটা ফুটো টিনের কৌটো মেরামত করতে করতে মামা বললেন, "আমাকে আর ওসব খবর জিজ্ঞেস কোরো না। যাবার আগে বাড়িটাও বন্ধক দিয়ে গিয়েছে। কি আর বলব বলো? দিদির দোষ কম নয়—ছেলেকে একবারও বারণ করলো না!"

পটলদার মায়ের সঙ্গেও আমার একটু-আধটু সংযোগ ছিল। অত্যন্ত লাজুক মহিলা। ছেলের বন্ধুদের সামনেও ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে ব্যস্ত—মুখে কোনো কথা নেই। আমোদিনী দেবী বোধ হয় ভাবলেন অন্য সবার মতো আমিও আবার পটলদার বিলেত ভ্রমণের সমালোচনা করে দেখাবো যে পটল একটি আস্ত গাধা। কিন্তু আমি ওসবের মধ্যে কেন যাবো? পটলদার জন্য সব সময় আমার দুঃখ হতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়।" আমোদিনী দেবীর বিষণ্ন মুখে আশার আলো ফুটে উঠলো। বললেন, "ক'টা মাস আর? তারপর তো খোকা ফিরে আসবে। মায়ের যে আর কেউ নেই সেকথা খোকা বোঝে।"

কয়েক মাস কেন, কয়েক বছরের মধ্যে পটলদার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন হলো না। পটলদার মামা দুঃখের সঙ্গে আমার কাছে খবর নিয়েছেন, "পটলা তোমার কাছে চিঠিপত্তর লেখে নাকি? যদি কখনও চিঠি পাও দিদিকে একটু খবর দিয়ে এসো। দিদি বেচারা দিনরাত চোখের জল ফেলে আর ডাকপিওনের জন্যে অপেক্ষা করে দরজার গোড়ায় বসে থাকে। চিঠি এলে সেটা অন্তত দেড়শ দুশবার পড়ে।"

আমার চিন্তা, ইংরিজীর সীমিত বিদ্যা নিয়ে খোদ ইংরেজের দেশে পটলদা কী ভাবে কাজকর্ম চালাচ্ছেন? তিনি ওখানে করছেনই বা

কী ? পটলদার মামা বলেছেন, "ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। চিঠিতে বিশেষ কোনো খবর থাকে না। শুধু লেখে, 'মা, তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিও, ইত্যাদি।' কিন্তু নিজের যত্ন মা কোথা থেকে নেবে ? বন্ধকী পাকা বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেলো। দিদি এখন ছোট্ট টিনের ঘরে থাকে। বিধবা মানুষ, এমনিই তো অর্ধেক দিন উপোস, বাকি ক'টা দিনের খাবারও যে কী ভাবে জুটছে ভগবান জানেন।"

আরও বছর খানেক পরে শুনেছি পটলদা কিছু কিছু টাকা মাকে পাঠাচ্ছেন। মামাও স্বীকার করেছেন, "দিদির দুঃখ বোধ হয় এবার ঘুচলো—ছেলে প্রতি মাসেই এম-ও পাঠাচ্ছে। প্রথম বারের পুরো টাকাটাই তো দিদি সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে এলো। ছেলের মঙ্গলের জন্যে প্রতি মাসে দিদি এখন বাড়িতেও পুরুত আনিয়ে পুজো করাচ্ছে। প্রতি শনিবারে একজন বাউনের পা ধুয়ে সেবা করছে, যাতে ছেলে রাজা হয়ে ফিরে আসে।"

আমাদের ইস্কুলের সুরজিতের চিঠি থেকে পটলদার আরও খবরাখবর পাওয়া গেলো। চার্টার্ড অ্যাকাউনটেনসি পড়তে সুরজিত বিলেত যাচ্ছিল। হেডমাস্টারমশায় বলেছিলেন, "আমাদের ইস্কুলের পটলও বিলেতে আছে। কোনো অসুবিধে হলে ওর খবর কোরো।" সুরজিত আমাকে চিঠি লিখেছিল, 'সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পটলদা চিঠি পেয়ে নিজে জাহাজঘাটে হাজির ছিলেন। সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অজানা দেশ, সায়েবদের ইংরিজী বুঝতে পারি না, এমন অবস্থায় পটলদা উদ্ধার না করলে মুশকিলে পড়ে যেতাম।' হেড-মাস্টারমশায়কেও পটলদা প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন—'স্যর আপনার নির্দেশ মতো সুরজিতের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমি যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ সুরজিতের জন্যে চিন্তা করবেন না।'

এর পর ইস্কুলমহলে কেমন জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে বিলেতে পৌঁছতে পারলে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই, স্বয়ং পটলদা ওখানে রয়েছেন। কাজে-অকাজে যারাই বিলেতে পাড়ি দিয়েছে তারাই

হেডমাস্টারমশাই কিংবা পটলদার মার কাছ থেকে চিঠি নিয়েছে : 'অমুক লণ্ডন যাইতেছে। ফরেন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই, তাহার উপর বিদেশী মুদ্রার অভাব। সুতরাং যতটা পারো দেখিও।'

সাধ্যের অতীত দেখাশোনা করতেন পটলদা। বিলেতফেরত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আমার পরিচয় হলো। পটল হাজরাকে আমি জানি শুনে ভদ্রলোক বললেন, "সে-এক পিকুলিয়র লোক মশাই! দুনিয়ার যত বাঙালী ছোকরা তাঁকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। প্রায়ই শোনা যায়, আজ এয়ারপোর্টে, কাল রেল স্টেশনে, পরশু জাহাজঘাটে মিস্টার হাজরা যাচ্ছেন নতুন কোনো দেশোয়ালীকে নামাতে। আমরা তো মিস্টার হাজরাকে বলতাম, আপনি মশাই ট্রাভেল এজেনসির ব্যবসায় নামুন। কাস্টমস থেকে লোক ছাড়ানো, অজানা লোকের ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করা, ছেলেছোকরাদের জামিনদার হওয়া এসব আপনার যেরকম সড়গড় হয়েছে, ব্যবসা খুবই ভাল চলবে।"

ভদ্রলোকের মুখেই শুনলাম, বন্ধুবান্ধবদের এইসব সমালোচনার কোনো উত্তর পটলদা দেন না, শুধু হাসেন। নিতান্ত চাপ দিলে বলেন, "মায়ের চিঠি নিয়ে আসে, বুঝতেই পারছেন।" বন্ধুরা বলেছে, "মাকে খবর দেবেন অত চিঠি না লিখতে। হাজার হোক আপনারও চাকরি আছে, সন্ধ্যেবেলায় পড়াশোনা আছে।" পটলদা বলেছেন, "যাই বলুন, বিদেশে প্রথম পা দিয়ে একটা চেনা-জানা লোক পেলে খুব আনন্দ হয়।"

আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী মারফত পটলদা সম্পর্কে আরও খবরা-খবর পেয়েছি। ভদ্রলোক বলেছেন, "মিস্টার পটল হাজরা খুব আদর্শবাদী লোক। আপনাদের ইস্কুল সম্পর্কে অন্ধ ভক্তি। ইস্কুলের প্রত্যেকটি মাস্টারকে ভদ্রলোক যেভাবে শ্রদ্ধা করেন তা এ-যুগে বিরল। ছাত্রাবস্থায় নিশ্চয় খুব ভালবাসা পেয়েছেন, না-হলে তো পরবর্তী জীবনে এতো শ্রদ্ধা থাকে না।" আমি চুপচাপ শুনে গিয়েছি, কোনো মন্তব্য করি নি।

এই সময় আমার জানাশোনা রমেনবাবু একবার দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোকের মন মেজাজ খুব খারাপ—জামাইকে নিজের খরচে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত পাঠিয়েছিলেন, এখন বিশেষ খোঁজখবর পাচ্ছেন না। ছোকরা নতুন কোনো নেশায় পড়েছে নিশ্চয়, নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত চিঠি-পত্তর তেমন লেখে না। সঙ্গে সঙ্গে পটলদার কথা মনে পড়ে গেলো। বললাম, "আমোদিনী দেবীর কাছে চলে যান, উনি একটা চিঠি লিখলে, পটলবাবু আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।"

তারপর অনেকদিন খোঁজখবর ছিল না। রমেনবাবু নিজেই একদিন দেখা করতে এলেন। দুটো হাত ধরে জানালেন, "আপনার বন্ধু পটলবাবু আমাদের কী উপকার যে করলেন, সে ভাষায় বোঝাতে পারবো না। জামাই-এর কাছে মেয়েকে যে ফেরত পাঠাতে পারলাম সে একমাত্র ওঁর জন্যেই। ভদ্রলোক আমার জামাই-এর পিছনে তিন মাস ডিটেকটিভের মতো লেগে ছিলেন। ছোকরাকে বুঝিয়েছেন, আড়ালে ছোকরার বালিকা-বান্ধবীদের সাবধান করে দিয়েছেন, তারপর আমাকে খবর দিয়েছেন, মেয়েকে এখনই পাঠিয়ে দিন। কোনো চিন্তা করবেন না, জামাই যদি কোনো গোলমাল বাধায় তাহলে আমি রইলাম।"

রমেনবাবুর মেয়ে লিখেছে: "বিলেতের বাঙালী মহলে পটলদার মতো ছেলে বিরল। মুখে বড় বড় কথা বলেন না। কিন্তু কাজে এবং চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের মস্ত ভক্ত। সিগারেট খান না, মদ খান না, মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেন না, শুধু নিজের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের চাকরি এবং পরীক্ষার পড়াশোনা নিয়ে আছেন। ভদ্রলোক প্রতি সপ্তাহে মাকে চিঠি লেখেন। মাকে এমন ভালবাসতেও আজকাল দেখা যায় না।"

রমেনবাবুর মেয়ে এখন স্বামীর সঙ্গে সুখে ঘরসংসার করছে। পটলদার কথা সে আবার লিখেছে: "দেশ থেকে নতুন-আসা ছেলেরা

চিঠি বিলিয়ে যাচ্ছেন যে-আসে তারই সঙ্গে মায়ের চিঠি থাকে। পটলদা বেচারা এই সব ছেলের জন্যে বাড়ি খুঁজতে, সপ্তাহখানেক খাওয়াতে পরাতে, লণ্ডন ঘুরিয়ে দেখাতে হিমসিম খেয়ে যান। টাকারও শ্রাদ্ধ হয়। এতো বছর হয়ে গেলো পটলদা একবারও দেশে বেড়াতে যান নি। কিন্তু যাবেন কী করে? টাকা তো বাঁচাতে পারেন না।"

এই পটলদাই শেষ পর্যন্ত বিলেতে মেমসায়েব বিয়ে করে বসলেন। মা আশা করেছিলেন, ছেলে লেখাপড়া শিখে এবার দেশে ফিরে কোনো চাকরিবাকরি করবে। কিন্তু···

খবরটা শুনে আমাদের বন্ধুবান্ধবমহলে হাসাহাসি হয়েছে। কেউ বলেছে, "এতো লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত পটল হাজরা মেম বিয়ে করে বিলেতে থাকবে, এ-কথা আমাদের স্কুলে কেউ কি কল্পনা করতে পারতো? তাছাড়া বিলেতে দশ বছর আদর্শ সাধুসন্তের জীবনযাপন করে এবং অনেক বাঙালী ছোকরার মেম বিয়েতে বাধা দিয়ে পটলদা নিজেই শেষ পর্যন্ত এই কাজ করে বসলেন তাও অবিশ্বাস্য।

এই সব কথা যখন কানে আসছে, সেই সময় আবার বিদেশে যাবার সুযোগ এলো। কোথায় ইণ্ডিয়া আর কোথায় আমেরিকা— একলাফে সেখানে হাজির হতে হলে শরীর এবং মনের ওপর যথেষ্ট ধকল হয়। তাই ভাবছিলাম, পথে ইংলণ্ডে ব্রেক জার্নি করবো। সেই খবর শুনে আমাদের হেডমাস্টারমশায় বললেন, "যদি পারো বিলেতে পটলের সঙ্গে দেখা কোরো!"

জননী জন্মভূমির নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে প্রথমে পা দিয়েই যে-অভিজ্ঞতা হলো তা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। হিথরো বিমানবন্দরে ব্রিটিশ সিংহের সেবক সায়েবটি আমার পাসপোর্টে সারনাথের তিনটি সিংহকে দেখেই অবহেলাভরে ছাড়পত্রটি পাশে সরিয়ে রাখলেন। আমার পেছনে যে সব ভাগ্যবান অস্ট্রেলিয়ান এবং জাপানী ছিলেন তাঁরা এগিয়ে গেলেন।

ইস্কুলের লাস্ট বয়ের মতো আমাকে ডেকে সায়েবটি এবার প্রশ্ন করলেন, "তাহলে ইনডিয়া থেকে আসা হচ্ছে? তা মহাশয় হঠাৎ ইংলণ্ডে কেন?"

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে উঠলেও জানালুম, চলেছি আটলানটিকের ওপারে মারকিন দেশে! পথে এই ভাঙা যাত্রা। সঙ্গে এরোপ্লেনের পাকা টিকিট, যথেষ্ট ডলার এবং ভারতস্থ ব্রিটিশ দূতের অনুমতিপত্র রয়েছে। কাগজপত্র সমস্ত খুঁটিয়ে দেখেও বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না ইংরাজনন্দন। মন্তব্য করলেন, তাঁদের ভারতস্থ প্রতিনিধির এই প্রবেশপত্র দেওয়া ঠিক হয় নি। বললুম, "এই অপরাধে আপনাদের নিজস্ব প্রতিনিধিকে অবিলম্বে বরখাস্ত করবেন কি না, তা আপনারা ভেবে দেখুন। তবে বিদেশীদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলা হয় জানলে আমি অবশ্যই এই দেশে পদার্পণ করতাম না।"

বিমানবন্দরে আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনে কয়েকজন লণ্ডন-প্রবাসী বন্ধু বলেছিলেন, "স্বভাবভদ্র ইংরেজ সাধারণতই বিদেশীদের সঙ্গে ভালই ব্যবহার করেন—ব্যতিক্রম কেবল ভারতীয়দের বেলায়। কারণ এ-দেশে তারা যথেষ্ট বদনাম কিনেছে। যে আসে সে যেতে চায় না, আসবার প[illegible]তিটাও সব সময় আইনসঙ্গত নয়। সুতরাং সারনাথের তিনটি সিংহকে পাসপোর্টের ওপর একত্রিত দেখলেই দ্বীপপুঞ্জের দ্বাররক্ষী সন্দিহান হ[illegible]য়ে ওঠেন এবং প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করেন।"

বিদেশে পৃথিবীর বৃহত্তম ডেমক্র্যাসির যে এমন একটা ভাবমূর্তি থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। সত্যি কথা বলতে কি বিদেশে আসবার প্রথম আনন্দটুকুই নষ্ট হয়ে গেলো। এর পর লণ্ডনের হোটেলে ভারতীয় বলেই চাপা অবহেলা অনুভব করেছি; রাতের অন্ধকারে আমার বাদামী রংয়ের বাঙালী চামড়া রাজপথে অহেতুক বিপদ ডেকে আনতে পারে এমন সাবধানবাণী শুনেছি। রাগে ফেটে পড়বার ইচ্ছে হয়েছে, পরমুহূর্তেই মনকে বুঝিয়েছি রাগ

রাখতে হবে কয়েক লক্ষ ভারতীয় এই দ্বীপপুঞ্জে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন।

ভাবলুম, হাজার হোক পুরনো মনিব—এদের পক্ষে সাম্রাজ্য হারানোর দুঃখ মাত্র বিশ পঁচিশ বছরে ভোলা সম্ভব নয়।

বিরক্ত মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হওয়ার পর পটলদার খোঁজ করলাম। ফোন পাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পটলদা গাড়ি ড্রাইভ করে আমার হোটেলে হাজির হলেন। বললেন, "কোনো কথা শুনছি না, চল্ আমার সঙ্গে।"

চৌধুরীবাগানের পটলদা লণ্ডনের রাস্তায় যে রকম হুড়হুড় করে ইংরিজী বলে যাচ্ছেন তা দেখে আমি তাজ্জব। ছাত্রাবস্থায় নেসফিল্ডের গ্রামার আমি নিষ্ঠার সঙ্গে কণ্ঠস্থ করেছিলাম। একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্র ইংরেজের সান্নিধ্যেও কিছুদিন কাটিয়েছি। তবু খোদ লণ্ডনের সায়েবসুবোদের অর্ধেক কথা বুঝতে পারছি না। কিন্তু লক্ষ্য করলুম পটলদার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না। অনর্গল কি সুন্দর ইংরিজী বলছেন। পটলদা আমাকে সমস্ত লণ্ডন শহর ঘুরিয়ে দেখালেন, তারপর বাড়িতে নিয়ে যাবার পথে বললেন, "চল্। এডিথের সঙ্গে আলাপ করে খুশী হবি তুই। ও তোর মতোই পড়াশোনা নিয়ে থাকে, ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে খুব আগ্রহ।"

আমি চুপচাপ কথা শুনে যাচ্ছি। পটলদা নিজেই বললেন, "হ্যাঁরে; আমি মেম বিয়ে করেছি বলে দেশে নাকি খুব সমালোচনা হয়েছে? লোকে বলেছে, বিধবা মা ওখানে একলা পড়ে রইলো, আর ছেলে বিলেতে মেমসায়েব নিয়ে ফুর্তি করছে।"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "দেশের লোক অনেক রকম কথা বলে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী পটলদা?"

"হাজার হোক দেশ তো?" পটলদা দুঃখের সঙ্গে বললেন। তারপর নিজেই মন্তব্য করলেন, "তুই তো জানিস কেন দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলাম। মায়ের গয়নাগাঁটি সব শেষ করে দিয়ে যখন চোখে অন্ধকার দেখছিলাম, তখন ঠিক করলাম মায়ের মুখ রক্ষের

জন্যে শেষ চেষ্টা করা যাক। বাড়িটা বন্ধক রেখে সেই টাকা নিয়ে বিলেতে পালিয়ে এসেছিলাম। এখানেও কি কম কষ্ট পেয়েছি? পড়াশোনায় তো ভাল ছিলাম না, তাই ডবল পরিশ্রম করতে হয়েছে। শেষে কারখানার চাকরিতে ঢুকেছি। দিনে চাকরি, রাতে পড়াশোনা করে, মাকে টাকা ক'টা পাঠিয়ে, কোনোদিনই কিছু জমাতে পারি নি। মায়ের মান রক্ষে করবার মতো বিদ্যে না হওয়া পর্যন্ত হাওড়ায় মুখ দেখাবো না পণ করেছিলাম। ঠাকুরের আশীর্বাদে এতোদিনে সেরকম বিদ্যে হয়েছে।"

পটলদা জানালেন, "এর মধ্যে বিয়ে-থা করবার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। বারোটা বছর তো কেটে গিয়েছে। শেষে হঠাৎ একদিন লাইব্রেরিতে এডিথের সঙ্গে আলাপ হলো। এডিথ পড়াশোনার পোকা। আমি পরীক্ষায় পাস করবার জন্যে বাধ্য হয়ে লাইব্রেরিতে বই পড়ি।"

এডিথ বড় শান্ত। পটলদার সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে কথাবার্তা বলেছে। পটলদা সরল মানুষ। অন্য অনেক বাঙালী ছোকরার মতো এডিথকে নিজের বংশ সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেন নি। বরং জানিয়েছেন নিজের দুখিনী মায়ের কথা। নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত স্বপ্ন দেখার বিপদের কথা। এডিথ কিন্তু সে সব জেনে পিছিয়ে যায় নি। এইটা পশ্চিমী মেয়েদের প্রশংসনীয় দিক। আমাদের দেশের মেয়েদের তুলনায় ওরা অনেক বেশী স্বাধীন। নিরাপত্তা আর অর্থকৌলিন্যের লোভে জীবনসঙ্গী পছন্দের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে তারা মোটেই রাজী নয়। পটলদাকে এডিথ বলেছে, "আমি পারিবারিক মর্যাদা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমিও কিছু লর্ড ফ্যামিলির মেয়ে নই। তবে ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে আমি অনেক শুনেছি। আমার গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদার ইণ্ডিয়াতে ছিলেন—ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে তিনি চাকরি করতেন। আমাদের বাড়িতে জামালপুর ওয়ার্কশপের একটা ছবি আছে—আমার দাদামশায়ের বাবা নিজের

পটলদা বুঝতে পেরেছেন তিনি ক্রমশ প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছেন। ঠিক যে ইচ্ছে করে তা নয়, আবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এ-কথাও বলা যায় না। পটলদার খেয়াল হচ্ছে, তাঁরও বয়স চল্লিশের কাছে এসে পড়েছে এবং বিদেশ ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। এডিথকে পটলদা সোজাসুজি বলেছেন, "আমি যে এ-দেশে চিরকাল থাকবো, তার কোনো কথা নেই। বরং প্রথম সুযোগেই আমি চৌধুরীবাগান ফিরে যেতে চাই।" সেই সব কথা শুনে এডিথ কিন্তু পিছিয়ে যায় নি। বরং পটলদার বাড়ির লোকের খবরাখবর নিয়েছে। বলেছে, "ইণ্ডিয়া তো সুন্দর জায়গা—আমার দাদামশায়ের বাবা তো সেখানেই সারা জীবন কাটিয়েছেন।"

পটলদা আমাকে বললেন, "লুকিয়ে আমি কখনও কিছু করিনি। এডিথের সঙ্গে যে মিশেছি সে-কথা মাকে লিখেছিলাম।"

পটলদার মা সে-খবর পেয়ে কী করেছিলেন আমার জানবার লোভ হলো। পটলদা বললেন, "তুই হয়তো বিশ্বাস করবি না, কিন্তু পরের চিঠিতেই মা আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছিলেন, তোমার বাবার স্মৃতির অসম্মান হয় এমন কিছু যে তুমি করবে না তা আমি জানি।"

একটু থেমে পটলদা বললেন, "অনুমতিটা মা প্রাণ থেকে দিয়েছিলেন, না উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ করেছিলেন তা তুই বলতে পারবি। মাকে তো আমি অনেকদিন দেখি নি।"

লণ্ডনের শহরতলিতে একটা ছোট্ট বাড়িতে এডিথের সঙ্গে আমার দেখা হলো। ভদ্রমহিলা আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, "তোমাদের যদি বাংলায় গল্প করতে ইচ্ছে করে, চালিয়ে যাও। আমার জন্যে লজ্জা পেও না।"

এডিথকে আমি বললাম, "বিনা নোটিশে হুট করে অতিথি আনা পটলদার উচিত নয়।"

এডিথ একমত হলো না। বললো, "সব সমাজের লোককে পশ্চিমের অনুকরণ করতে হবে এমন কোনো কথা

বইতে পড়েছি, যৌথ পরিবারের কালচার এখনও তোমাদের দেশে প্রবল, সুতরাং সেখানে অতিথিসংক্রান্ত নিয়ম-কানুন আলাদা হবেই।"

পটলদা বললেন, "এডিথ আমাকে ইণ্ডিয়ানদের মতো থাকতে উৎসাহ দেয়। মার নাম করে কেউ এসে হাজির হলে মোটেই রাগ করে না। আমরা দুজনেই চাকরি করি, সুতরাং কোনো অতিথি বাড়িতে থাকলে বেশ অসুবিধে; কিন্তু তবুও এডিথ আপত্তি করে না।"

সেদিন তো এক অচেনা ছোকরা বললো, "আপনার মায়ের খবর জানি আমি। ইচ্ছে করলেই তাঁর কাছ থেকে চিঠি আনতে পারতাম; কিন্তু তাড়াতাড়িতে হয়ে ওঠে নি।" পটলদাকে তিনদিন ভুগিয়ে কিছু পাউণ্ড আদায় করে সে বিদায় হয়েছে। পটলদা মাকে লিখতে যাচ্ছিলেন, "অনেকে তোমার নাম করে আমাদের ভোগায়। তুমি যাকে পাঠাচ্ছ তার হাতে অন্তত এক টুকরো চিঠি পাঠিও, তাহলে সুবিধে হয়।" এডিথ কিন্তু লিখতে দেয় নি। বলেছে, "পনেরো বছর ধরে যা চলেছে, এখনও তা চলবে। আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে কিছু পাল্টে যাক তা আমি চাই না।"

ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে, হোটেলে ফিরবার পথে পটলদা বলেছেন, "এডিথ জানে মার জন্যে আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে। তাই সেখানে কোনোরকম হাত দেয় না। বরং প্রতি সপ্তাহে আমাকে চিঠি লেখার কথা মনে করিয়ে দেয়; মার কাছে টাকা পাঠালাম কিনা খোঁজ করে। ওর খুব ইচ্ছে, মা এখানে চলে আসেন। আমি লিখেছি—কিন্তু মা কোনো জবাব দেন না!"

আমোদিনী দেবীর ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। একবর্ণ ইংরিজী জানেন না, দুলাইন বাংলা লিখতেও কষ্ট হয়। মাছ মাংস স্পর্শ করেন না, একবেলা ভাত খান। প্রতিদিনই পুজো রয়েছে—ঠাকুরের সেবাযত্ন করতে করতেই সময় কেটে যায়। সেই মানুষ হাওড়া ছেড়ে এই ইংলণ্ডে এসে কতখানি মানিয়ে নিতে পারবেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে। তার ওপর বিদেশিনী

পটলদা বললেন, "সব তো নিজের চোখে দেখে গেলি, মাকে রিপোর্ট দিস।"

"আপনি নিজে একবার দেশ ঘুরে আসবেন না?" আমি জিজ্ঞেস করেছি।

পটলদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "আমার কী আর যেতে সাধ হয় না? প্রথম দিকে পয়সার জন্যে সম্ভব হয় নি। তারপর পয়সা যদি যোগাড় করা যেতো, কারখানার ছুটি নেই। পরীক্ষা দিতে দিতেই ছুটি ফুরিয়ে তা—আর তাছাড়া প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মায়ের মুখ রক্ষে করার মতো বিয়ে না নিয়ে দেশে যাবো না।"

"সেরকম বিয়ে তো এখন হয়েছে," আমি মনে করিয়ে দিয়েছি পটলদাকে।

পটলদা বলেছেন, "হ্যাঁ। তাছাড়া নতুন যে-চাকরিটা নিয়েছি তাতে মাসখানেক ছুটি পাওয়া শক্ত নয়। ভাবছি মাকে এবার বৌমা দেখিয়ে আনবো। এডিথ নিজেও আমাকে জ্বালাচ্ছে। বলছে, তোমাদের দেশে যখন নিয়ম পুত্রবধূকে মায়ের আশীর্বাদ নিতে হয়, তখন দেরি করছো কেন?"

পটলদার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পালা চুকিয়ে আমি বার্মিংহামে গিয়েছি। সেখানকার রাজপথেই একদিন কেমন করে আমি পূর্ব-পাকিস্তানীদের প্রেমে পড়ি তা বিস্তারিতভাবে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বইতে লিখেছি। লণ্ডনে ফিরে এসে আরও দু'দিন পটলদা ও এডিথের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আমি একদিনের জন্যে ফরাসীদেশে পাড়ি দিয়েছি। সস্ত্রীক পটলদা আমাকে হিথরো বিমানবন্দরে বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয়দের যে-অবস্থাই হোক, ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জন্মভূমি ফরাসীদেশে ভারতীয়রা যথাযোগ্য

আজকাল রাঙঝালের দোকানে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক কোনো কথা উঠলে মামার মতামত পাড়ার লোকেরা এবং দোকানদাররা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। বলে, "বেশী বাক্‌তাল্লা মারিস না। তোদের তো খবরের কাগজ-পড়া বিদ্যে, আর নগেনদার নিজের ভাগ্নে বিলেতে থাকে।"

নতুন যারা পাড়ায় এসেছে তারা অবাক হয়ে যায়। অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না। মামা তাদের দিকে অবহেলা ভরে তাকিয়ে থাকেন। অন্য লোকরা বলে, "কোথায় খাপ্পা খুলছো? ইংরেজের সঙ্গে কুটুম্বিতে রয়েছে দাদার। বেয়াই-বেয়ান সব তো সায়েব।" মামার সগর্ব গাম্ভীর্য লোককে বুঝিয়ে দেয় কথাগুলো মিথ্যে নয়।

পটলদার আসন্ন ভ্রমণ সম্পর্কে খবরটা রটবার পর ন্যাপা দাস জানতে চাইলো, "ওরে নগেন, তোর মেমসায়েব ভাগ্নী-বৌ এলে করবি কী?"

বিড়িতে টান দিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মামা উত্তর দিয়েছেন, "আমার তো সায়েবদের সঙ্গে ইংরিজী বলার অভ্যাস রয়েছে। বার্ন কোম্পানির ফেটিস সায়েবের কাছে একবার চাকরির জন্য ইনটারভিউ দিয়েছিলাম। চাকরি পাই নি বটে; কিন্তু শ্লা সায়েবের সঙ্গে পাঁচ মিনিট হুড় হুড় করে ইংরিজীটা প্র্যাকটিশ করে নিয়েছিলাম। মুশকিল আমার দিদির। বাবার আদর পেয়ে ফার্স্ট বুকটা পর্যন্ত শেষ করে নি। এখন আমাকেই হেপা সামলাতে হবে। দিদিকে বার বার বলছি, দু'চারটে ইংরিজী কথা অভ্যেস কর, কিন্তু দিদির সময় হচ্ছে না!"

মামা ইতিমধ্যেই কারণে-অকারণে ইংরিজী শব্দ ব্যবহার শুরু করেছেন। সে সব অপপ্রয়োগ নিয়ে আবার অনেকে মুখ টিপে হাসাহাসি করছে। মামা হাপর দিয়ে হাওয়া করতে করতে দোকানের কর্মচারী ভজা এবং চাঁদুকে বলেছেন, "খাস সায়েবরা ব্লাডি কথাটা খুব ব্যবহার করে, বুঝলি। ফেটিস সায়েবের সঙ্গে আমার পাঁচ মিনিট কথা হয়েছিল। তার মধ্যেই দশ-এগারোবার ব্লাডি কথাটা বলেছিলেন। আর আমাদের বাঙালীবাবদের ইংরিজী শোনো, যেন

মিওনো পাঁপড়। বোতল থেকে সোডা ঢালার মতো সায়েবদের ইংরিজী বক বক করে বেরিয়ে আসে—তাতে কত তেজ থাকে !"

নগেন চোংদার আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন। বললেন, "বৌমা তো আসছেন, কিন্তু কোথায় রাখা হবে ? আমরা কী হোটেল ভাড়া করবো ?"

"হোটেলে কি থাকতে চাইবে ?" আমি সন্দেহ প্রকাশ করি। "তাছাড়া ইংরেজদের রাখবার মতো হোটেল এ-অঞ্চলে কোথায় ?" আমি বুদ্ধি দিলাম, "বরং বড় রাস্তার উপর একটা ছোটখাট পাকা বাড়ি যদি পেয়ে যান তাই ভাড়া করে রাখুন।"

কিন্তু পরে খবর পেলুম ঘর ভাড়া হয় নি। পটলদার মতামত চেয়ে মামা চিঠি লিখেছিলেন, তিনি বউ-এর পরামর্শ নিয়েছিলেন এবং এডিথ সোজা জানিয়ে দিয়েছে, "তুমি যে-বাড়িতে জন্মেছো এবং বড় হয়েছো, যেখানে তোমার মা রয়েছেন আমি সেখানেই থাকবো।"

পটলদাও আমাকে লিখেছেন, "হাওড়ায় হাজির হবার জন্যে এডিথের ভীষণ আগ্রহ। আমি বোঝাচ্ছি—জায়গাটা নোংরা, বাড়িঘরদোর পুরনো। কিন্তু সে ওসব মানতে চাইছে না। বলছে, তোমার মাকে আনন্দ দেওয়াটাই আমার সবচেয়ে বড় কাজ।"

পটলদার মার প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গিয়েছে। মামা আগে মাঝে মাঝে দিদির সমালোচনা করতেন, এখন কিছু বলেন না। বাড়িতে সাজ সাজ রব উঠেছে। ঘরের ভিতর মামার নিজস্ব খাটখানা ভাগ্নে এবং বউ-এর জন্যে রাখা হয়েছে। নিজের স্ত্রী এবং ছেলেদের মামা ঘন ঘন উপদেশ দিচ্ছেন, কখন কী করতে হবে।

দুটি গোপন ব্যাপারে মামা আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন। একটি বংশের নারায়ণ সম্পর্কে! হাজার হোক সায়েবরা গোরু খায়—সুতরাং ঠাকুরঘরে ঢুকতে দিলে পাড়ায় কথা উঠবে। ইতিমধ্যেই দু'চারজন বৃদ্ধা এ-বিষয়ে খোঁজখবর করতে এসেছেন। মামা ঠিক করেছেন, নারায়ণকে চিলেকোঠার ঘরে চালান করে তালা দিয়ে

কিনে এনে ঠাকুরঘরে রাখবেন, তাহলে নতুন বউমা কিছু বুঝতে পারবেন না। আমি বললাম, "ভাল ব্যবস্থা।" দ্বিতীয় সমস্যাটি আরও গোপনীয়। টয়লেট পেপার সংক্রান্ত। সে সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করাই সঙ্গত।

এর পরবর্তী অধ্যায় আমি নানা সূত্র থেকে, এমনকি পটলদার কাছ থেকেও সংগ্রহ করেছি।

এডিথ বিলেত থেকে বেরুবার আগে কয়েকমাস ধরে বাঙালীদের সমাজ-জীবন সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা করেছে। শাশুড়ী এবং পুত্রবধুর সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর করেছে। এডিথ ঠিক করেছে, স্বামীর মাকে সে অবাক করে দেবে। এমন কি আব্দার করেছে, এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি পর্যন্ত সে খালি পায়ে যাবে, যেমন-ভাবে নববধুরা প্রথম শ্বশুরবাড়িতে আসে।

পটলদা খুব উৎসাহ দেখান নি। বলেছেন, "ওখানে মানুষের জীবন বড় কষ্টের। রাস্তায় তোমার পা কেটে যেতে পারে!" এডিথ কথা কানে তোলে নি, বলেছে, "কষ্টকে আমি অত ভয় পাই না। সব রকম কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি।" পনেরো বছর আগেকার চৌধুরীবাগান এবং সেখানকার অবস্থা পটলদার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তবে আশা করেছেন, এতোদিনে নিশ্চয় অনেক উন্নতি হয়েছে। এডিথ অতটা খারাপ অবস্থা দেখবে না।

এডিথ পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করা শিখেছে। বাঙালী পরিবারে গিয়ে মাথায় সিঁদুর পরা অভ্যাস করেছে। বলেছে, কলকাতা এয়ারপোর্টে নেমেই আমাকে একজোড়া শাঁখা কিনে দেবে। শাড়ী তো এখান থেকেই নিয়ে যাচ্ছি। বিব্রত বোধ করেছেন পটলদা। কিন্তু এডিথ এটাকে নতুন ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের মতো নিয়েছে—সে স্বামীকে এবং তার মাকে অবাক করে দিতে চায়।

এডিথ জিজ্ঞেস করেছে, "অন্য দেশের মেয়ে বিয়ে করলে, তোমাদের দেশের মায়েরা কষ্ট পান কেন?" পটলদা কোনো উত্তর দিতে পারেন নি।

পটলদার চোখের সামনে বিধবা মায়ের বিষণ্ণ ছবিটা ভেসে উঠেছে। পনেরো বছর পরে আবার দেখা হবে। এতোদিনে মায়ের কত না পরিবর্তন হয়েছে। মায়ের প্রতি স্বামীর দুর্বলতার কথা এডিথের অজানা নয়—এর জন্যে এডিথ রাগ করে না, বরং পটলদাকে শ্রদ্ধা করে। পটলদা সে সম্বন্ধে মাথা ঘামান না, তবে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে করেন। মায়ের জন্যে যা তাঁর করা উচিত ছিল তা যে পারেন নি বা করেন নি, সেটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মায়ের একমাত্র সন্তান না হলেই যেন ভাল হতো, মনে হয় পটলদার।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য এবং কলকাতা শহরের অপরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে এডিথ শুনেছে। কিন্তু এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বেচারার স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। দমদম থেকে বেরিয়ে হাওড়ায় আসতে আসতেই বেচারা ক্রমশ সিঁটকে উঠছিল। যেন ঘড়ির কাঁটা ধরে সময়ের উল্টো দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে এসেছে। বিরাট বিরাট খোলা নর্দমা দেখে এডিথ চমকে উঠেছিল। প্রথমে ভেবেছিল ভেনিসের মতো খাল, কিন্তু পরে বুঝতে পেরে আঁতকে উঠেছিল। পৃথিবীতে এখনও যে এমন নর্দমা থাকতে পারে তা তার কল্পনাতীত।

পটলদার আশা ভঙ্গ হচ্ছে। সেই যে তিনি চলে গিয়েছিলেন, তারপর এই পনেরো বছর ধরে এদেশের কেউ বোধ হয় একবারও বাড়িতে রঙ লাগায় নি, এমন কি দরজা-জানালার ধুলো ঝাড়ে নি। পটলদার মনে হলো, এর জন্য দারিদ্র্যকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। কারণ এইসব নোংরা বাড়ি থেকে দুর্গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে রেডিওর আওয়াজ ভেসে আসছে। রাস্তার জঞ্জাল সাফ করবার জন্যে তো বিদেশী মুদ্রার দরকার হয় না! বেকার লোকেরও তো অভাব নেই।

নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পটলদাকে ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে হলো। এবার হাঁটার পালা, কারণ সরু গলিতে ঢোকবার উপায় নেই। খালি পায়ে বাড়িতে যাবার পরিকল্পনা ছেড়ে দিতে

স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন পটলদা। এডিথও রাস্তার অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো।

এডিথ এতোক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল, এবার সে ভয় পেতে আরম্ভ করেছে। বিরাট নর্দমার ধারে বসে ছোট ছোট ছেলেরা প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে। তার পাশেই দুটো তিনটে ঘেয়ো কুকুর গা চুলকোচ্ছে। বাড়িগুলো পাঁজরা বার করা দেওয়ালের বালি খসে পড়ে বীভৎস নোনাধরা ইঁটগুলো দেখা যাচ্ছে। অদূরেই মোষের খাটাল। সেখানে গোয়ালারা মশা তাড়াবার জন্যে ভিজে খড়ের ধোঁয়া দিচ্ছে। খাটা পায়খানার পিছন-দরজা খোলা রয়েছে। সেখানে মাছি ভনভন করছে।

পটলদা বুঝতে পেরেছেন, এডিথ চাইলেও বেচারাকে এখানে নিয়ে আসা উচিত হয় নি। কিন্তু এডিথ তখনও মুখে সাহস দেখাচ্ছে।

পাড়ায় ইতিমধ্যে খবরটা প্রচারিত হয়েছে। গোটা পঞ্চাশেক ছেলে এবং বউ তখন পটলের মায়ের বউকে দেখবার জন্যে বিদেশিনীর পেছন পেছন চলতে আরম্ভ করেছে। ভয় পেয়েছিল এডিথ কিন্তু পটলদা সাহস দিলেন, "কোনো ভয় নেই, এরা নতুন বউ এলে এভাবেই কৌতূহল দেখায়।" "তোমাদের দেশে বউরা তো মুখ দেখায় না," এডিথ জিজ্ঞেস করেছে। পটলদা বললেন, "পর্দার দেশেও নববধূর আব্রু নেই, সবাই তাকে দেখতে পারে।"

কাদা প্যাচপেচে এবড়ো-খেবড়ো সরু গলির মধ্যে দিয়ে আরও কয়েকটা পাক খেয়ে পটলদা নিজেদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। পটলদার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। এডিথকে আঙুল দিয়ে দেখালেন ওই বাড়িতেই তোমার স্বামী জন্মেছিল। জরাজীর্ণ বাড়িটা যারা কিনেছে তারাও রং করে নি। পটলদা সরল মানুষ, কোনো কিছু চেপে রাখেন না। বললেন, "এই বাড়ি বন্ধক দিয়ে আমি বিলেতের টিকিট কিনেছিলাম।"

বাড়িটার পাশেই একখানা টিনের ঘর রয়েছে। সেই ঘরে

পটলদার মা থাকেন। এই সম্পত্তিটুকুই পটলদা শুধু নষ্ট করে যান নি।

মা কিন্তু আজও বেরিয়ে এলেন না। ঘরের কোণে আগের মতোই ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। "মা," এই বলে পটলদা সজল চোখে এগিয়ে গেলেন। মামা বললেন, "দেখছিস কি দিদি? বউমাকে বরণ করে তুলে নে।"

দুধে-আলতা রংয়ের ফুটফুটে বউ দেখে পাড়ার সবাই অবাক। মেয়েরা তখনই বলেছে, "আহা কী রকম পাতলা চামড়া দেখো। মনে হচ্ছে এখনই যেন ফেটে গিয়ে রক্ত বেরুবে। চুলগুলো অমন সোনালী কেন? মেমদের চুল অমন হয় বুঝি!" এর আগে এ-পাড়ার কেউ জলজ্যান্ত মেম দেখে নি। মামা ক্যালেণ্ডারে মেমদের ছবি দেখেছেন, এবার ভাগ্নী-বউ দেখে বুঝলেন ছবিতে যা কিছু দেখা যায় তা মিথ্যে নয়।

মামা দুজনকে আশীর্বাদ করে এডিথকে ইংরিজীতে বললেন, "এই তোমার মা।"

'ইয়োর মাদার' কথাটা শুনে এডিথ ঠিক বুঝতে পারছিল না। পটলদা ফিসফিস করে বললেন, "শাশুড়ীকে এখানে মা বলে।"

এডিথের তাতে মোটেই আপত্তি নেই। মাথা নিচু করে সে পটলদার মায়ের দিকে এগিয়ে গেলো। মা বহুদিন পরে হারানিধি ফিরে পেয়ে দুজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো।

এরপর হঠাৎ মায়ের শরীর খারাপ হলো। তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। মেঝেতে শুয়ে পড়তেই মামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পাড়ার দর্শনার্থীরা তখন বাড়ির উঠোন বোঝাই করে ফেলেছে। ঘরের মধ্যেও কয়েকজন ঢুকে পড়েছে।

মামা চিৎকার করে উঠলেন, "তোমরা এখন যাও দিকি বাপু। মেম-বউমা কিন্তু আজকেই হাওড়া ছেড়ে বিলেত চলে যাচ্ছে না। অনেকদিন থাকবে।"

শাশুড়ীকে অচৈতন্য হয়ে পড়তে দেখে এডিথ দ্রুত মেঝেতে বসে পড়লো। তারপর তাঁর সেবা আরম্ভ করলো। ব্যাগ থেকে কী সব শিশি বার করে মায়ের সামনে রাখলো।

মা এবার চোখ মেলে তাকালেন। তিনি আবার উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এডিথ সস্নেহে তাকে বাধা দিলো। দুজনে কেউ কারো কথা বোঝে না। কিন্তু মুখের ভাবেই পরস্পরকে বুঝতে পারছে তারা। মা পরম স্নেহে তাঁর একমাত্র সন্তানের বধূকে দু' চোখ দিয়ে দেখছেন। আর এডিথ এই অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর পূতিগন্ধ পরিবেশের কথা ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আছে যিনি অনেকদিন আগে তার প্রিয়তমকে পৃথিবীতে এনেছিলেন এবং প্রবাসী সন্তানের প্রতীক্ষায় যিনি পনেরো বছর অপেক্ষা করছেন।

এডিথ এবার পরম স্নেহে আমোদিনীর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। কাপড়ে সামান্য অডিকোলন ঢেলে নিলো। তার গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

সমস্ত পাড়াতে খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। লোকে ভেবেছিল, মেম-বউমা নাক বেঁকিয়ে থাকবে, শাশুড়ীর দিকে ফিরেও তাকাবে না, স্বামী বেশী মাতৃপ্রেম দেখালে তার লাগাম ধরে টান দেবে। কিন্তু তা তো নয়ই, বরং মেম-বউ মেঝেতে বসে শাশুড়ীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেলো।

আমোদিনীর সমবয়সিনীরা পরের দিন ভোরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

রাতারাতি পটলদার মা বিশেষ সম্মানের পাত্রী হয়ে উঠেছেন। আগে যখন জল আনবার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির কলের সামনে তিনি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তখন অন্য বধূরা পাত্তাই দিতো না। এখন সবাই তাঁকে বেশ একটু হিংসে করতে আরম্ভ করেছে।

গবার মা এসে আমোদিনীকে বললেন, "ঠাকুরকে এতো ডেকেছিস, তা কখনো মিথ্যে যায়? তোর ভাগ্য, এমন সোনার চাঁদ

ছেলে পেটে ধরেছিস। আর বউ! এ তো গল্প-কথার মতো। জাত গোত্তর কোষ্ঠী মিলিয়ে, বংশ দেখে বউ তো এনেছিনু আমি—এখন সে-মাগীর পা টিপলে ভাল হয়। আর খাঁটি মেমসায়েব বউ তোর পা টিপছে—এ-দৃশ্য বাইসকোপে তুলে লোককে দেখালেও বিশ্বেস করবে না!"

মামা বললেন, "আপনারা আশীর্বাদ করুন বেঁচেবর্তে থাকুক।"

এরপর দর্শনার্থীদের লাইন পড়ে গেলো। তারা একবার শুধু নিজের চোখে দেখতে চায়, মেমসায়েব বউ শাশুড়ীর পদসেবা করছে।

আমোদিনী দেবী তবু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারছেন না। কথা বলার ক্ষমতা তিনি যেন সারাজীবনের মতো হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি শুধু একভাবে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন, আর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে।

মামার বাড়িটা পটলদা খুঁটিয়ে দেখেছেন। খাটা পায়খানার একটা দরজা পর্যন্ত নেই। সেখানে আব্রুরক্ষার জন্যে একটা চটের থলে টাঙানো রয়েছে। বিরক্তিতে মন ভরে উঠলো পটলদার, এরা একটুও পাল্টালো না। এরা কী করে পশুর মতো জীবনযাপন করছে? পটলদার লজ্জা লাগছে, এডিথের কাছে তিনি অকারণে ছোট হয়ে যাচ্ছেন। মামা বড় বড় কথা বলছেন, মাছ মাংস আনাচ্ছেন, বাড়িতে রেডিও বাজাচ্ছেন—কিন্তু খাটা পায়খানার একটা দরজা লাগাবার প্রয়োজন মনে করেন নি। কিন্তু পরমুহূর্তেই পটলদার মনে পড়ে গিয়েছে, মামা তবু এতোদিন মাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এই ভাঙা পায়খানা এবং বে-আব্রু কলঘর ব্যবহার করেই পটলদা জীবনের পঁচিশটা বছর কাটিয়েছেন। মামা তবু বোনকে দেখছেন, কিন্তু পটলদা তো এদের জন্যে কিছুই করেন নি, বরং বাড়ি বন্ধক-দেওয়া টাকা নিয়ে বিদেশে পালিয়েছেন।

রাত্রে শোবার ঘরে স্বামীকে একলা পেয়ে এডিথ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। এমন পরিবেশে মানুষ বছরের পর বছর বিনা

প্রতিবাদে বিনা বিপ্লবে থাকতে পারে তা তার অকল্পনীয় ছিল। সে হয়তো আরও কিছু বলতো, কিন্তু স্বামীর মনঃকষ্টের কথা ভেবে সাহস পাচ্ছে না।

এডিথের পক্ষে এখানে থাকা যে অসম্ভব তা বুঝতে পারছেন পটলদা। তাঁকে কিছু করতেই হবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। কে যেন বলছে, তোমার মাকে এই পরিবেশে এতদিন ফেলে রাখতে তোমার তো দ্বিধা হয় নি।

কী বলবেন পটলদা ?

"এডিথ, তুমি কি সকালেই চলে যেতে চাও ?" পটলদা জিজ্ঞেস করলেন।

এডিথ কিছু বলে না। শুধু কাঁদছে। মানুষ যে এমন পরিবেশে থাকতে পারে, স্বামী যে নিজের মাকে এমন পরিবেশে এতোদিন রেখেছে তা সে ভাবতে পারছে না।

"এডিথ, চুপ করে রইলে কেন ? কথা বলো।"

স্বামীর গায়ে হাত রেখে এডিথ বললো, "তোমার মা কষ্ট পান এমন কিছুই আমি করতে চাই না।"

মা কিন্তু চরম অভিমানেই যেন এই ভয়াবহ পূতিগন্ধ পরিবেশে পড়ে রয়েছেন। পটল হাজরাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই চৌধুরীবাগানের এই অঞ্চলটা যেন এখনও পৃথিবীর বুকে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

পটলদা নিজের অজান্তে মহা বিপদে পড়লেন। একদিকে মা, অন্যদিকে এডিথ এদের মধ্যে সাত সমুদ্রের দূরত্ব। যেখানে যেমন সেখানে তেমনভাবে পটলদা মানিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এরা দু'জন কেবল পটলদার মুখ চেয়ে কি কাছাকাছি আসতে পারবে ?

পরের দিন এডিথের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। মশার কামড়ে সমস্ত দেহে লাল-লাল ডুমো-ডুমো দাগ বেরিয়েছে। আমোদিনী ইতিমধ্যে একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি

দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। এই পরিবেশ বিদেশী বধুর যে সহ্য হচ্ছে না তা তিনি আন্দাজ করতে পারছেন।

পটলদা পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে এডিথকে বললেন, "এক সময় মায়ের পাশে না শুলে আমার ঘুম আসতো না। মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন।"

এডিথের মনে হলো পটলদা তার অনুমতি ভিক্ষা করছেন। বললেন, "তুমি মায়ের কাছে গিয়ে অবশ্যই শুতে পারো।"

রাত্রে মায়ের পাশে শুয়ে পড়ে পটলদা ডাকলেন, "মা।"

"কে? খোকা?" মা একবার তাকিয়ে বললেন। "বউমা একলা থাকতে ভয় পাবে না?" ছেলেকে ফিরে যেতে বললেন আমোদিনী।

পটলদা বললেন, "ওদেশের মেয়েরা অনেক শক্ত হয়, মা।"

মা কোনো উত্তর দিলেন না। কিন্তু পটলদার মনে হলো, কথাটা বোধ হয় সত্যি নয়—তাঁর মায়ের মতো নীরবে এতো কষ্ট সহ্য করবার মতো শক্ত মেয়ে ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশে জন্মায় না।

"মা, তুমি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দেবে না?" পটলদা মায়ের খুব কাছে সরে এসে জিজ্ঞেস করলেন। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মা বললেন, "তোর মনে আছে? আমি পিঠে হাত না বুলিয়ে দিলে তোর ঘুম হতো না।"

"মা, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে?" পটলদা একটু পরে আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"কিছু বলবি?" মা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"এই নোংরা ভাঙা বাড়িতে এই অবস্থায় তোমাকে রাখতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না।"

পটলদার কথা মা বুঝতে পারছেন না। এই পরিবেশ তাঁর কাছে তো অসহ্য হয়ে ওঠে নি—এইখানেই তো জীবন কাটলো। এর থেকে ভাল কিছুর সঙ্গে তাঁর তো পরিচয় নেই।

"মা কিছু বলো," পটলদা কাতরভাবে অনুরোধ করলেন।

"বেশ তো আছি। কোনো অভাব নেই। তুই টাকা পাঠাচ্ছিস," মা স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আস্তে আস্তে বললেন। কোনো কিছুর বিরুদ্ধে মায়ের যেন অভিযোগ নেই। ছেলেবেলায় স্বামী হারিয়ে, সর্বস্ব দিয়ে যাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন, যার কাছে আশা করেছিলেন—সে ফিরে আসে নি। মায়ের কথাতে তবু কোনো দুঃখ প্রকাশ পাচ্ছে না।

"মা, আমি ঘুমোই ?" পটলদা জিজ্ঞেস করলেন।

মাঝ রাতে একবার যখন ঘুম ভাঙলো পটলদা দেখলেন, মা তখনও হাতপাখা নেড়ে চলেছেন একভাবে, আর ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

পটলদা বললেন, "মা ঘুমোও নি ?"

"এবার ঘুমবো," মা শান্তভাবে উত্তর দিলেন।

পটলদার ইচ্ছে হচ্ছে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এই নরককুণ্ডে মায়ের জীবনটা তিনি নষ্ট হতে দিয়েছেন। মাকে তিনি সুখ দিতে পারেন নি, কাছাকাছি থেকে দুঃখও ভাগ করে নিতে পারেন নি। পটলদা ভাবছেন মাকে বলবেন, "বিশ্বাস করো মা, তোমার কথা এক দিনের জন্যে, এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলি নি। কিন্তু সুযোগ পাই নি। এখানে চাকরি নেই। ওখানে এতোদিন সংগ্রাম ছিল, এখন তত্টা নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি হাজার হাজার মাইল উড়ে চলে আসতে পারি না।"

এডিথকে দিয়ে পটলদা মাকে বলিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে চলে যেতে। মা কোনো উত্তর দেন নি, শুধু হেসেছেন। এ-হাসির কী অর্থ এডিথ বুঝতে পারে নি। কিন্তু পটলদা একটা অর্থ করেছেন। পটলদার মনে হলো, মা জানতে চাইছেন, পটল এখন কার ? তাঁর ? না বিদেশী একটা মেয়ের ? যার ঘরে-ফেরার জন্যে পনেরো বছর ধরে তিনি অপেক্ষা করেছেন, তাকে হারিয়েও মনের দুঃখ

পরের দিন অবস্থা আরও ঘোরতর হলো। এডিথের প্রবল জ্বর এসেছে। মশা-কামড়ানো ডুমোগুলো সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। জ্বরের ঘোরে এডিথ ভুল বকছে, যার ভাষা এ-বাড়ির কেউ বুঝতে পারছে না। এডিথ স্বামীকে বলছে, "এ-আমায় কোথায় নিয়ে এলে তুমি?"

ডাক্তার এলো। তিনি বললেন, "এখানে রাখবেন না। সোজা বিলেত থেকে এনে এইখানে তুললেন কী করে আপনি?"

নিজের অজান্তে ডাক্তার একটা অস্বস্তিকর সমস্যার সহজ সমাধান করে দিলেন। পটলদা বুঝলেন এপার ওপার দু'পারকে একসঙ্গে ভালবাসা তাঁর মতো অভাগার পক্ষে বিলাসিতা।

লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কাঁদলেন পটলদা। তারপর মাকে বললেন, "মা, তুমি তা হলে যাবে না?"

নিঃস্তব্ধতার মাধ্যমেই মা জানিয়ে দিলেন তিনি যেতে পারবেন না। আমোদিনী বোধ হয় বুঝতে পারছেন, পুত্রবধূ তাঁকে স্বীকার করলেও স্বামীর অতীতকে গ্রহণ করতে পারছে না।

"মা কিছু বলো," পটলদা আবার কাতর অনুনয় করলেন।

মা মেঝের ওপর শুয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। কিছুই বললেন না। এডিথ নিজেও কত অনুনয় করলো, আমোদিনী কোনো উত্তর দিলেন না।

মায়ের পদধূলি নিয়ে পটলদা বললেন, "ডাক্তার কী বলেছে শুনেছো তো। এডিথ এখানে থাকলে শক্ত রোগে পড়ে যেতে পারে।"

মা ছেলের সঙ্গে একমত হলেন। ছেলেকে বললেন, "ডাক্তারের অবাধ্য হতে নেই। সবার সব পরিবেশ সহ্য হয় না, খোকা।"

"মা আশীর্বাদ করো। এবার তবে আসি," পটলদা ও এডিথ দু'জনে বিদায় নেবার আগে মাকে প্রণাম করলো।

পটলদা ভেবেছিলেন, তাঁর জন্মদুঃখিনী মা এবার অন্তত সন্তানকে কিছু বলবেন। অনেকক্ষণ নীরবতার পরে মা শুধু বললেন, "এসো।"

আমোদিনীকে শান্ত দেখাচ্ছে—তাঁর চোখে জল নেই। কিন্তু পটলদা জানেন, এখন থেকে জীবনের শেষ ক'টা দিন প্রত্যেক রাত্রে মা অনেকক্ষণ ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদবেন।

প্রাণের এতো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পটলদা কেন এডিথ ও আমোদিনীকে কাছাকাছি রাখতে পারলেন না? কেউ কেউ বলেছে, স্রেফ স্বার্থপরতা। এডিথ মুখে যতই মিষ্টি কথা বলুক, শাশুড়ীকে সে ভারতীয় পদ্ধতিতে ভালবাসবে কেন? আমার পরিচিত এক বন্ধু বলেছিলেন, "স্রেফ স্যানিটারি কারণেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন সম্ভব হলো না। ইণ্ডিয়ানদের নোংরামিই এর জন্যে দায়ী।"

সত্যি কথা বলতে কি, ইস্ট ইজ ইস্ট ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট এবং পূর্ব-পশ্চিমের কোনোদিন মিলন হবে না—এই কথাটা পটলদার কোনোদিনই ভাল লাগে নি। পটলদার মতো লিণ্ডসে মিল্‌নারও একই স্বপ্ন দেখতো। তার সঙ্গে আমাব দেখা যদিও মার্কিন মুলুক থেকে ফেরবার পরে হয়েছিল, তবু ঘটনাটা এখানেই বলে রাখা ভাল।

মার্কিন দেশ থেকে ফেরবার বেশ কিছুদিন পরেই লিণ্ডসে বাবাজীবনের নাটকীয় সংবাদ আমার কাছে নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হয়েছিল।

আমার শ্রদ্ধেয়া তাজুদির কিছু কিছু খবর 'এপার বাংলা ওপার-বাংলা'য় বলেছি, কিন্তু পিসতুতো দিদি ফুলির কথা লেখা হয় নি। ফুলিদি, অর্থাৎ মিসেস ফুল্লরা মুখার্জি, আমার পিসিমার একমাত্র কন্যা, বর্তমান বয়স সাতচল্লিশ। এই কয়েকদিন আগে শুভেন্দুদার সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহের রজতজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে।

রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ফুলিদি আমাদের নেমন্তন্ন করে খুব খাওয়ালেন। আমার পাতে দই পরিবেশন করতে করতে সুরসিকা ফুলিদি বলেছিলেন, "খুব তো লেখক হয়েছিস, ইনিয়ে-বিনিয়ে গল্প

বানিয়ে তাজুদিকে তো ফেমাস করে দিলি। তা আজকের জন্যে কিছু একটা বিবৃতি দে!”

দ্বিতীয়বার দই চাইতে চাইতে বললাম, “১৯৪৭ সালে আমাদের জীবনে দুটো বড় ঘটনা ঘটেছিল—তোমার বিয়ে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি : এই পঁচিশ বছরে স্বাধীনতা আদৌ ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা সে-সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ আছে, কিন্তু শুভেন্দুদা ও তোমার বিবাহ যে ফলপ্রসূ হয়েছে সে-সম্বন্ধে কোনো মতদ্বৈধ নেই—আমরা তিনটি হীরের টুকরো ভাগ্নে-ভাগ্নী লাভ করেছি!”

শুভেন্দুদা চাকরিজীবনে তেমন কেষ্টবিষ্টু না হতে পারলেও নিজের ছেলেমেয়েদের ভালভাবে মানুষ করেছেন। বড় ভাগ্নে অনিমেষ এখন জার্মানিতে। রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কোম্পানি সরকারী খরচে তাকে বিদেশে পাঠিয়েছে। মেজ সুবর্ণরেখা এতো সাবজেক্ট থাকতে ইংরিজী পড়বার জন্যে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছে। বাবা মায়ের চোখের সামনে থাকবার মধ্যে ছোট কন্যা রূপসী—এখন যাদবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে। পড়াশোনায় তিনজনেই চৌকস। অজস্র ছাত্র-ছাত্রীকে বঞ্চিত করে নির্লজ্জভাবে এরা এতো পদক, পুরস্কার এবং স্কলারশিপ বাড়িতে এনেছে যে, মনোপলি কমিশনের কাছে এই পরিবারের নামে অভিযোগ আনা যায়!

রজতজয়ন্তীর দিনেও ফুলিদিকে আমি বলেছি, “পিসিমার কাছে যতদূর শুনেছি, লেখাপড়ায় তোমার তেমন নজর ছিল না। কিন্তু ছেলেপুলেদের কী ভাবে এমন তৈরী করলে?”

“তুই আর চালাকি করিস না। ছেলেমেয়েদের খবরদারি করতে গিয়েই তো হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেলো। এবার যদি একটু হাত-পা ছাড়া হয়ে শান্তি পাই।”

ফুলিদিকে বলেছি, “গভর্নমেন্টের উচিত তোমাকে কোনো কলেজ-হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট করে দেওয়া। নিজের ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হলো, এবার পরের ছেলে মানুষ করো।”

এহেন ফুলিদি হঠাৎ আমার কাছে এস-ও-এস পাঠিয়েছেন।

রূপসী আমাকে ফোনে জানালো, "মা বলেছে, খুব জরুরী তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে।"

ফুলিদির সঙ্গে দেখা হলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই, ওঁর রান্না জলখাবার বেশ লোভনীয়।

ফুলিদির ওখানে হাজির হতেই দেখলাম, দিদির মুখ বেজায় শুকনো। সোফার এক কোণে দিদি চুপচাপ বসে আছেন। কোলের ওপর বোনার কাঠি ও উল পড়ে আছে, কিন্তু হাত নড়ছে না। ফুলিদিকে বেকার বসে থাকতে কখনও দেখি নি, সবসময় হাত চলছে, হয় পশম, না হয় সেলাই। তাই বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলাম।

ফুলিদি আমাকে দেখে বললেন, "এলি তাহলে। মায়ের পেটের ভাই নেই, তোরাও যদি না দেখিস।"

ফুলিদির নিজের ভাই নেই বলে চিরকালই একটু দুঃখ। কিন্তু আমরা ফুলিদিকে অ্যাজ-গুড অ্যাজ নিজের বোন বলেই ব্যবহার করে এসেছি, ভাইফোঁটার দিনে কোনোরকম দয়ামায়া দেখাই নি।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী হলো তোমার? গল ব্লাডারের ব্যথাটা আবার চাগালো নাকি? মেডিক্যাল কলেজে জানা-শোনা সার্জেন রয়েছে। কতদিন বলছি, চলো দেখিয়ে দিই। দরকার হলে কাটিয়ে নাও।"

ফুলিদি ঝাঝিয়ে উঠলেন, "যাবো ওখানে, তবে চিকিৎসার জন্যে নয়, ডেথ সার্টিফিকেট লেখাবার জন্যে।"

হাবভাবে বুঝলাম, ফুলিদির শরীর বেশ ভালই রয়েছে, যা খারাপ হয়েছে তার নাম মন।

হুম! অবস্থা সুবিধের নয়। ঘোর দাম্পত্য কলহ তাহলে!

"কবে আমার মুক্তি হবে বলতে পারিস?" ফুলিদি এবার প্রায় সজল চোখে কিন্তু বেশ ঝাঝের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন।

পরিস্থিতি সংকটজনক। "কিন্তু এতো ঘটা করে বিয়ের সিলভার জুবিলী পালনের পর তো আর ডাইভোর্স করা যায় না। বরং আমার ওখানে গিয়ে কয়েকদিন থাকো। শুভেন্দদা আটচল্লিশ

ঘণ্টার মধ্যেই বুঝতে পারবে হাউ মেনি প্যাডিতে হাউ মেনি রাইস !”

ফুলিদি এবার একটু রাঙা হয়ে উঠে আমাকে বকুনি লাগালেন। “তোর মাথায় সব সময় গল্পের প্লট ঘুরছে, পঁচিশ বছর বিয়ের পর ডাইভোর্স হয়ে গেলেই ছোটখাটো বাংলা নবেল হয়ে যায় ! তোর জামাইবাবু শুনলে খুব কষ্ট পাবেন। উনি তো সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না।”

“তাহলে ?” বিব্রত আমি এবার নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করি।

সোফায় হেলান না দিয়ে ফুলিদি এবার উঠে বসলেন। নিজের কপালে হাত রেখে বললেন, “কপাল। সন্তান মানেই অশান্তি, এই কথাটা তোর নবেলের কোথাও বড় বড় টাইপে ছাপিয়ে দিস। বাঁজা হওয়া অনেক সুখের, তাদের মুখ পুড়োবার কেউ থাকে না ”

আমার মন অচিরেই জার্মান-প্রবাসী যুবক ভাগ্নে অনিমেষের কাছে চলে গেলো। জার্মান যুবতীরা যে কৃষ্ণবর্ণ ইণ্ডিয়ান ছোকরাদের ওপর একটু বেশী প্রসন্ন সে-কথা শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলীর বইতে পড়েছি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে বহুবার শুনেছি। কয়েক সপ্তাহ আগে শ্রীমান ভাগিনেয় নিজের যে-ছবি পাঠিয়েছে তার এক কোণে নাকি স-সারমেয় এক বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। ফুলিদি যে ভয় পেয়ে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের জন্যে পাশের বাড়ি থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস চেয়ে আনিয়েছিলেন সে-খবরও আমার কানে ছোট ভাগ্নী মারফত এসেছিল।

অনিমেষের ব্যাপারটায় আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে বললাম, “ভাগ্যে যা লেখা আছে তা কি খণ্ডাতে পারবে ফুলিদি ?”

ফুলিদি যেন একটু চাঙ্গা হলেন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, “তা সত্যি। ইস্কুল ম্যাগাজিনে লেখার জন্যে মামা তোর কান মলে দিয়েছিলেন, কিন্তু ভবিতব্য কি আটকানো গেলো ? বাপের অতো বাধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তুই নবেল-নাটকের লাইনেই তো চলে গেলি। আমার ভাগ্যেও যা আছে তাই হবে। কি বল ?”

আমি যে ক্রমশ ভুল পথে যাচ্ছি, তখনও না বুঝে আমি বললাম, "অনেকে বলছে, এই মহাকাশচারীদের যুগে সায়েব-মেমসায়েব, বাঙালী-অবাঙালী এসব পার্থক্য আর থাকবে না। অনেকদিন আগেই তো কবি আন্দাজ করে লিখেছিলেন, জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

"রাখ রাখ," মুখ ঝামটা দিলেন ফুলিদি। "নাটক-নবেল আর সংসার এক জিনিস নয়। দুনিয়াটা দো-আঁশলায় ভরে যাবে এটা কিছু শুভ সংবাদ নয়।"

আমি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললাম, "অনেক ইণ্ডিয়ান যুবক স্বদেশী যুগে মেম বিয়ে করবার পবিত্র শপথ নিয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, সাদা চামড়া আমাদের ওপর অনেক প্রভুত্ব করেছে, আমাদের দাস বানিয়ে রেখেছে—ঠিক হ্যায়, আমরাও প্রতিশোধ নিচ্ছি, মেম বিয়ে করে তাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাবো!"

"সে তো তবু ভাল ছিল!" কাঁদোকাঁদো হয়ে ফুলিদি বললেন, "পুরুষমানুষ যা করে তাই মানিয়ে যায়। কিন্তু মেয়েদের সব মানায় না।"

"কী হলো তোমার?" আমি ফুলিদিকে একটু ঠেলা দিলাম।

চোখের জল ফেলে ফুলিদি বললেন, "তোর আদরের ভাগ্নী, অত বই ঘেঁটেঘুঁটে যার নাম রেখেছিলি সুবর্ণরেখা, সে-ই এবার বংশের মুখ ডোবাতে বসেছে। ম্লেচ্ছ বিয়ে করে সে এবার সায়েবের এঁটো বাসন মাজবে।"

বেশ একটু ধাক্কা খেয়েও ফুলিদিকে বলতে গেলাম, "বিদেশে এখন দিন কাল পাল্টেছে, বউদের আর বাসন মাজতে হয় না, ও কাজটা স্বামীরাই সেরে নেয়।" কিন্তু ফুলিদির শোচনীয় মানসিক অবস্থা দেখে আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

পরবর্তী খবরাখবর যা পাওয়া গেলো তা সংক্ষেপে করলে এই রকম দাঁড়ায়: সুবর্ণরেখা যাঁকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে তিনি এক আমেরিকান অধ্যাপক। সুবর্ণরেখারই মাস্টারমহাশয়··লিণ্ডসে

মিল্‌নার। যে মেয়ে এতো শান্ত ও গম্ভীর ছিল, সেক্সপীয়র ও মিল্টন ছাড়া যার মাথায় কিছুই ঢুকতো না, সে-ই যে প্রজাপতির শরনিক্ষেপ করে সায়েব মাস্টারের মাথা ঘুরিয়ে দেবে এটা আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না।

চোখের জল মুছতে মুছতে ফুলিদি আমার জলখাবার তৈরি করবার জন্যে রান্নাঘরে চলে গেলেন। যাদবপুরের হবু ইঞ্জিনীয়ার রূপসী মুখার্জি এবার বয়লার স্যুট পরে কলেজ থেকে ফিরলো।

"এ কি ড্রেস তোর!" আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

"মামা, একটু প্র্যাকটিক্যাল হও। শাড়ি পরে ওয়ার্কশপে কাজ করা চলে না," রূপসী চ্যাটাং চ্যাটাং করে শুনিয়ে দিলো।

"তোর দেখছি আমার ওপর বেজায় রাগ।" আমি অভিযোগ করি।

"রাগ হবে না? না হয় বানিয়ে বানিয়ে গাঁজাখুরী গল্প লেখো, তা বলে ঐরকম একটা বিদিকিশ্রী নাম আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে?"

"নামটা খারাপ হলো! তুই হবার পরে, পুরো দুদিন আমি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান ঘেঁটে নামটা পছন্দ করেছিলাম!"

"কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন!" রূপসী তড়বড় করে উঠলো।

"কোন ছোঁড়া বলেছে—?" আমি চ্যালেঞ্জ করি।

"ক্লাসের ছেলেরা আড়ালে আমাকে যা বলে তা শুনলে তুমি ছেলেমেয়েদের নাম বিলোনো ছেড়ে দেবে। বুঝলে মামা? তারা আমাকে ডাকে, উপোসী!"

আমি উত্তর দিই, "তাই বল—একটু রোগা বলে রসিকতা করে! হাজার হোক যাদবপুর এখনও মফস্বল। ওরা জানে না রোগা স্লিম মেয়ে ছাড়া আজকাল বিলেত আমেরিকায় কেউ বিয়ে করতে চায় না।"

"মামা, তুমি আমাকে স্তোকবাক্য দিও না। যা বলছো তা যদি সত্যি হতো তা হলে বিদেশে দিদির বিয়ের কথাই উঠতো না।"

সুবর্ণরেখা দেহ এবং স্বভাবে একটু স্নেহময়ী, বিদেশে খাঁটি দুধ মাখনের কল্যাণে একটু ভারাতুর হয়েছে।

দিদির প্রসঙ্গে মায়ের দুঃখের কথা তুলতেই রূপসী সঙ্গে সঙ্গে বোনের পক্ষে সওয়াল শুরু করলো, "বেশ করছে দিদি। রং যখন কালো, তখন কোনো গুণবান বাঙালী ছোকরার গার্জেন দিদিকে বিয়ে পরীক্ষায় পাস করাতো না।"

"আঃ রূপসী, বাঙালী জাতের সবাই খারাপ নয়," আমি স্বজাতি প্রীতি দেখাই।

"রেখে দাও মামা। তোমরা সাউথ-আফ্রিকানদের থেকেও বর্ণবিদ্বেষী! চেষ্টা করে নি মা? দিদির বিদেশে যাবার আগে তো লুকিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিল, আত্মীয়স্বজন সবাইকে পাত্রের কথা বলেছিল। অমন গুণের মেয়ে, ইংলিশে অমন রেজাল্ট, অমন ফ্যামিলি, কিন্তু পেরেছিল সুপাত্র যোগাড় করতে? চামড়া সাদা না হলে বাঙালী মেয়েদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বুঝলে মামা।"

"তোর আর ভাবনা কী? তুই তো ফরসা," আমি অবস্থা আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করি।

রূপসী সে-কথায় কান না দিয়ে বললো, "আমি তো বলবো, দিদি একটা কাজের কাজ করছে। যেসব ছোকরা এখানে বরফ-সাদা মেয়েমানুষ চায় তাদের চোখ খুলুক!"

আমি ফুলিদিদির দিকটা ভাগ্নীর কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম। "আমার দিদির দুঃখের কথাটা তোরা ভেবে দেখছিস না। প্রথম মেয়ে, বিয়ে দিয়ে মনের মতো জামাই আনবার সাধ থাকবে না?"

"সাধ তো থাকে, কিন্তু মুরোদ কই?" রূপসীর কড়া কথা।

"কিন্তু তা বলে যার-তার সঙ্গে!"

"যা-তা পাত্র তো দিদি পছন্দ করে নি। ভদ্রলোক হারভার্ডের এম এ, তার আগে আমেরিকার সেরা ইস্কুলে পড়েছেন। বংশ ভাল, বাবা ডাক্তার, মা জজের মেয়ে—আর কী চাও তোমরা?

আমি বললাম, "সবই স্বীকার করছি। কিন্তু আমার দিদির দুঃখ

তোমাদের বোঝাতে পারবো না। মেয়ে দেওয়া মানেই হেরে যাওয়া—আমাদের কালচারের একটা ক্ষতি। বাইরের কালচার থেকে মেয়ে আমদানি হলে আমাদের লাভ, কিন্তু আমাদের মেয়ে এক্সপোর্ট হয়ে গেলে পুরো লোকসান।"

রূপসী ইঞ্জিনীয়ারিং না পড়ে তর্কশাস্ত্রের ছাত্রী হলে ভাল করতো। একটুও না ভেবে সে উত্তর দিলো, "এসব তুমি পুরনো যুগের কথা বলছো, মামা। এখন মেয়েরা যেখানে যায় সেখানেই কালচারাল কংকোয়েস্ট হয়; তুমিই না লিখেছিলে, লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্য প্রাণ দিয়েও যে-আমেরিকাকে হারাতে পারে নি, কয়েক হাজার জাপানী মেয়ে হাসি এবং চোখের ইশারাতে সেই অসাধ্য সাধন করেছে। বিশ্বযুদ্ধ জিতবার ঠিক পরেই অনেক জাত ব্যাট্‌ল অফ বেড-এ (বিছানা যুদ্ধে) গোহারান হেরে যায়!"

ফুলিদি জলখাবার হাতে প্রবেশ করলেন। আমাকে বললেন, "তুই আমাকে সুইসাইড এনে দে। খেয়ে আমি সব জ্বালা থেকে বাঁচি।"

"ওকি আনবার জিনিস, দিদি? ওটা করবার জিনিস। তার মালমশলা যোগাড় করে দিলে তুমি বাঁচবে সত্যি, কিন্তু আমরা মারা পড়বো। তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে শুভেন্দুদা প্রথমেই আমাকে হাজতে পোরাবে।"

আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে ফুলিদি বললেন, "আমার কোষ্ঠি বিচার করে রথীন পণ্ডিত বহুদিন আগেই বলেছিল—সন্তানদের হাতে এ-মেয়ে অনেক দুঃখ পাবে।'

"কবে বলেছিল?" আমি জানতে চাই।

"কবে আবার? বিয়ের আগে, বাবা যখন কোষ্ঠি বিচার করিয়েছিলেন, তখন।"

ভাবলাম একবার বলি, জেনেশুনে সেক্ষেত্রে বিয়ে না করাই উচিত ছিল। কিন্তু ফুলিদির যা মনের অবস্থা তাতে টিপ্পনী কাটতে সাহস হলো না।

ভেবেচিন্তে সান্ত্বনা দিলাম, "দুঃখ দেবার জন্যেই তো সন্তান,

ফুলিদি। না হলে অত যন্ত্রণা সহ্য করে মাকে ছেলেপুলের জন্ম দিতে হয়?"

ফুলিদি বললেন, "ওসব কথা থাক। সায়েবের গলায় মালা দেবার কী কী বিপদ তুই আমাকে বল তো। মেয়েকে শেষবারের মতো লিখে দেখি।"

আমি ভীষণ বিপদে পড়ে গেলাম। বললাম, "মেমসায়েব বিয়ে করার কী বিপদ তা তোমাকে গড়গড় করে বলে দিতে পারি, অন্তত আধডজন অভিযোগ আমার কানে এসেছে। যেমন—প্রতিটি বউ এক-একটি শ্বেত হস্তিনী। ভীষণ কুঁড়ে, ইণ্ডিয়ার গরম সহ্য করতে পারে না। শ্বশুর-শাশুড়ীদের মুখ দর্শন করতে রাজী নয়, কম পয়সায় সংসার চালাতে পারে না। ঘন ঘন হোম লিভে যাবার জন্যে ব্যস্ত। দুর্জনেরা বলে, বেশীর ভাগ মেমের মুখে গন্ধ·· কমবয়সে বুড়ী হয়ে যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দেশী মেয়ের সায়েব জামাই সম্বন্ধে তো কোনো খবরাখবর নেই।"

"আমাকে আর কত জ্বালাবি? মামা বেঁচে থাকলে তাঁর কাছেই যেতাম," ফুলিদি একেবারে কাঁদো কাঁদো।

অগত্যা মাথা চুলকে বললাম, "যে-কোনো পুরুষমানুষকে বিয়ে করবার মধ্যে যে স্বাভাবিক বিপদগুলো রয়েছে সেগুলো সায়েব-স্বামী হওয়ার মধ্যেও নিশ্চয় আছে—যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হওয়া, ছেলেপুলে হয়ে সংসারের খুঁটিতে বেঁধে মার খাওয়া, পয়সাকড়ি নিয়ে খিটিমিটি···"

আরও বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ফুলিদি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, "পঁচিশ বছর স্বামীর ঘর করছি—ওগুলো তোর থেকে একটু বেশীই জানি। তুই শুধু সায়েবদের ব্যাপারগুলো বল।"

বললাম, "তুমি আমার অপরাধ নিও না ফুলিদি, সায়েবরা গোরু খায়, মদ খায়, পরের বউকে নিয়ে নাচে, মেয়েদের বেশী জামাকাপড় পরা পছন্দ করে না, আর,···" এবার আমি নিজেই একটু সঙ্কোচ বোধ করলাম।

"থামলি কেন? বল।"

"সায়েবরা বিশ্বাস করে না বিয়েটা জন্ম জন্মান্তরের ব্যাপার। তাই একটু বেগড়-বাঁই হলে ডাইভোর্স করে দেয়।"

ফুলিদি আঁতকে উঠলেন।

দিদিকে শান্ত করবার জন্যে বললাম, "সায়েব জামাই হলে তোমার হাঙ্গামা অনেক কম। বিয়েতে পাঁচডজন নমস্কারী শাড়ি দিতে হবে না।"

রূপসী হঠাৎ ফোড়ন দিয়ে বসলো, "হিপি জামাই হলে একটা গাঁজার কলকে দিয়ে জামাই ষষ্ঠীর দায় সারা যাবে।"

ফুলিদির সঙ্গে এখন রসিকতার সময় নয়। বকুনি দিয়ে রূপসীকে বিদায় করলাম। দিদিকে বললাম, "সায়েব জামাই হলে তোমার খুব সুবিধে। যখন খুশী মেয়ের বাড়িতে উঠে শাশুড়ী-আদর ভোগ করবার অধিকার থাকবে তোমার।"

ফুলিদির এসব কথা ভাল লাগলো না। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মেয়ের বিয়ে বন্ধ করবার জন্যে ফুলিদি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তান্ত্রিক জ্যোতিষীর সিঁদুর লাগানো এয়ার লেটার ফর্মে মেয়েকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। মনের মতো ছোকরাটিকে স্বামী হিসেব পাবার জন্যে সুবর্ণরেখা যে পুরোপুরি বেঁকে বসেছে সে খবর রূপসীর কাছেই পেয়েছিলাম এবং এসব ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত যা হয় তাই হয়েছিল। সুবর্ণরেখা তাঁর মুখার্জি পদবি হাডসন নদীর জলে ভাসিয়ে মিসেস মিল্নার হয়েছিল।

এহেন ভাগ্নীকে যখন আমরা সকলে খরচের খাতায় লিখে দিয়েছিলাম, তখন রূপসী বেচারার খুব মন খারাপ। মুখে যতই দিদির পক্ষ নিক, দিদি যে শেষপর্যন্ত বাবা মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করার মানসিক দুঃসাহস দেখাতে পারবে তা সে আশা করে নি।

রূপসী আমার কাছে এলে একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোর এতো দুঃখ কেন?"

"সে আর তুমি বুঝবে কী করে, মামা। দিদির বরদের নিয়ে আজকাল বোনরা কী রকম হৈ-হৈ করে সে খবর তো রাখো না। বাঙালী মেয়েদের জীবনে ওইটুকুই তো রোমান্স।"

তা সত্যি। বেচারা রূপসী কোথায় কোনো রঞ্জিতদা বা সঞ্জীবদার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করবে, সিনেমায় যাবে, রেস্তোরাঁয় খাবে, থিয়েটার দেখবে, তা না দিদি গাঁটছড়া বাঁধলো এক সায়েবের নেকটাইয়ের সঙ্গে।

"হ্যাঁ মামা, বিলেত আমেরিকায় শালীদের কী রকম পোজিসন?" রূপসী জিজ্ঞেস করলো।

"এক কথায় শোচনীয়।"

"শ্যালিকা কী বস্তু তা ওরা বোঝে না?" রূপসী প্রশ্ন করেছে।

"মোটেই নয়। স্ত্রীর সঙ্গে যত মাখামাখি হাসাহাসি করো, দহরম বহরম রাখো—কিন্তু শ্যালিকা নৈব নৈব চ! লোক নিন্দে করবে, স্ত্রীর ভগ্নীকে থিয়েটারে নিয়ে গেলে নানা কথা উঠবে।"

"বা রে! শ্যালিকারা বুঝি মানুষ নয়, তাদের বুঝি জামাইবাবুদের সঙ্গে আউটিং করতে ইচ্ছে হয় না?" বেজায় রেগে উঠলো রূপসী।

"মানুষ তো বটেই—কিন্তু মেয়েমানুষ; সেইটাই তো যত নষ্টের কারণ।" আমি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি।

রূপসীর মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে ওঠায় আমাকে উদাহরণ দিতে হলো। বললাম, "অমন-যে-অমন বাঘা ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স—শ্যালিকাপ্রীতি ছিল বলে বেচারাকে কত ভুগতে হয়েছিল। কনেকটিকট না কোথায় এই সেদিন পর্যন্ত আইন ছিল, স্ত্রী দেহরক্ষা করলেও স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ চলবে না।"

রূপসী মুষড়ে পড়লো। আমি সহানুভূতি জানিয়ে বলি, "ইণ্ডিয়া ছাড়া কোনো দেশের লোক শালীর মূল্য বোঝে না। না হলে পৃথিবীতে এতো দেশ থাকতে শালিবাহন রাজারা ভারতবর্ষে কেন রাজত্ব করতে এসেছিলেন?"

রূপসী যে কিছু ভাবছে তা আন্দাজ করতে পারছি। অগত্যা জানতে চাইলাম, "তুই কি বিদেশে যাবার ফন্দি আঁটছিস? তাহলে দিদির বাড়িতে উঠতে পারবি না। মেয়েদের কোনো ডরমিটরিতে থাকিস, আর একবার ওদের ওখানে সৌজন্য-সাক্ষাৎ বা কার্টসি-কল করিস। তারপর দিদি যদি তোকে কোনোদিন ডিনারে ডাকে, সে আলাদা কথা।"

রূপসী এবার আসল খবরটা ভাঙলো। "দিদি ওই সায়েব ভদ্রলোককে নিয়ে কলকাতায় আসছে।"

"সায়েব ভদ্রলোক নয়, তোমার জামাইবাবু," আমি মনে করিয়ে দিলাম।

"সায়েবকে জামাইবাবু বলা যায় না, মামা," রূপসীর উত্তর।

"তাহলে তোর মা'র অবস্থাটা ভাব। খোদ ইংরেজকে বাবাজীবন বলে বরণ করতে হবে। আদর করে জড়িয়ে ধরে ললাটে স্নেহচুম্বন দিতে হবে।"

ব্যাপারটা আর রসিকতার পর্যায়ে রইলো না। ফুলিদি এতোদিনে শান্ত হয়েছেন। কপালে যখন সায়েব-জামাই হয়েছে তখন কী আর করা যাবে? আমাকে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে শলা-পরামর্শ হলো। বাড়িতে এখন সাজ-সাজ রব। শোবার ঘরে নতুন ডিজাইনের খাট বিছানা এলো। সেই সঙ্গে কাঁচের থালাবাসন, কাঁটা চামচ ডিস কাপ। সায়েব-জামাইয়ের পান থেকে চুন খসলে যে বিরাট কিছু ঘটবে সবাই তা ধরে নিয়েছে।

আমি আর কী নতুন পরামর্শ দেবো? ফুলিদি জিজ্ঞেস করলেন, "ওদেশে কী ভাবে জামাই আদর করে, বল না বাপু।"

বললুম, "শাশুড়ী-জামাই সম্পর্ক নিয়ে অনেক রসিকতা পড়লেও স্বচক্ষে একটা কেসই দেখেছিলুম। তখন আমি ওমাহার কাছে এক গ্রামে মিসেস ফেনারের বাড়িতে ছিলাম। মিসেস ফেনার একদিন টেলিফোন পেয়ে কার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ফোন নামিয়ে, মুখ বেজার করে বললেন, 'আজকে আমার জামাই ডিনারে

আসছে।' জামাই আপ্যায়নের জন্যে ভদ্রমহিলা এবার উঠে পড়ে লাগবেন ভাবলাম। ও মা, কিছুই করলেন না, শুধু গুদোম থেকে বাড়তি কয়েকটা আলু এনে সিদ্ধ করতে দিলেন। টেবিলে জিনিসপত্তর সাজাতে সাজাতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিসেস ফেনার বললেন,'আমার জামাই-এর আসবার সময় হয়ে গিয়েছে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ডিনার টেবিলে বসে যথেষ্ট খাবার প্রথমেই নিজের প্লেটে তুলে নিও। ছোকরার এতোই লোভ এবং ব্যাড ম্যানার্স যে টেবিলের বারো আনা আলু নিজের প্লেটে তুলে নেবে।'

"আমি তো তাজ্জব। জামাই দুটো আলু খাবে তাতেও শাশুড়ীর বিরক্তি! আর আমাদের দেশে 'এটা খাও, ওটা খাও, না হলে মাথা খাও' বলে শাশুড়ীদের কী মিনতি।"

ফুলিদি বললেন, "বাজে বকিস না। সায়েবরা যেসব খাবার খায় সে সব তো রাঁধতেও জানি না। তুই কি হোটেল থেকে কিছু আনিয়ে দিবি?"

আমি বললাম, "কি বিপদ বল দিকি। ছোকরা ঠিক জামাইষষ্ঠীর দিনেই কলকাতায় অ্যারাইভ দিচ্ছে!"

ফুলিদি অগত্যা জামাইষষ্ঠীর ব্যবস্থা পাকা করে রাখছেন। শুধু বললেন, "হোটেল থেকে আর যা-ই আনিস, দয়া করে গোরুর মাংসটি নয়। খুকি যে আমাকে কী বিপদে ফেললো।"

রূপসী মুখে যতই তড়বড় করুক, এবার একটু ঘাবড়ে গেলো। আমাকে আড়ালে ডেকে বললো, "একে তো হুড়হুড় করে ইংরিজী বলতে অভ্যস্ত নই, তারপর মা বলছে, আদর আপ্যায়নের ভারটা পুরো আমাকেই নিতে হবে!"

ফুলিদির জামাই যেদিন কলকাতায় পৌঁছলো সেদিন বিশেষ কাজে আমাকে কলকাতার বাইরে থাকতে হয়েছিল। দিন পাঁচেক পরে হাওড়ায় ফিরে এসেই ছুটলাম ফুলিদির বাড়িতে। আমাকে

দেখেই সহাস্য রূপসী চিৎকার করে উঠলো, "মামা, তুমি এসে গিয়েছো। লিওসেদাকে রোজই তোমার কথা বলছি।"

"বেজায় খুশি-খুশি ভাব দেখছি, ব্যাপার কী?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"দিদির বরটি ভারি ভালমানুষ। নিজেই বলেছেন, লিওসেদা বলে ডাকো।"

জামাই দেখে আমি তাজ্জব। একটি সাদা ধবধবে বিনয়ী ছোকরা, পাঞ্জাবি এবং পাজামা পরে আমাদের ঘরে ঢুকলো। আমি করমর্দন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ছোকরা ডনবৈঠকের স্টাইলে ঘচাং করে মেঝেতে বসে পড়ে আমার পদধূলি নিলো।

লিওসে মিল্নার বলতে মানসনেত্রে যে সায়েবনন্দনের ছবি দেখেছিলাম, তার সঙ্গে ফুলিদির জামাই-এর একটুও মিল হলো না। অত্যন্ত সৌম্য চেহারা। চোখ দুটি শান্ত—কথাবার্তাও বেশ নম্র। দোষের মধ্যে মাথায় সামান্য একটু টাকের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। আমাদের ভাগ্নার তুলনায় জামাইয়ের চেহারা কার্তিকের মতো।

জামাই বললো, "আপনাকে যেভাবে শ্রদ্ধা জানালাম তা ঠিক হয়েছে তো?"

"শতকরা ১১০ ভাগ ঠিক হয়েছে," আমি জানাই। "অনেক দিন পরে প্রণাম পেলাম, আজকালকার ছেলেরা ও-পাট তুলে দিয়েছে। বাবা-মা কাউকে প্রণামের হুকুম করলেও বিপদে পড়ে যান; কারণ আধুনিক ছেলেরা যা টাইট চোঙা প্যান্ট পরে—পনেরো ডিগ্রী বেঁকতে গেলে পিছনের সেলাই কেটে যাবে।"

লিওসে এমনভাবে হাসলো যে বুঝলাম সে আমার কথা বিশ্বাস করছে না। সে বললো, "ইণ্ডিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে ট্রাডিশন একই ভাবে চলেছে।"

বেচারাকে কে বলবে, হাজার বছর তো দূরের কথা, দু-তিন মাস অন্তর আজকাল স্টাইলের কায়দাকানুন পাল্টাচ্ছে।

রূপসী এবার আমাকে বিপদে ফেললো। জামাইবাবুকে বললো,

"আপনার কোশ্চেনটা করুন। মামা টপ করে উত্তর দিয়ে দেবেন।"

আমার প্রেস্টিজ পাংচার হবার অবস্থা। ছোকরা নোটবই খুলে জানতে চাইলো, সাষ্টাঙ্গ প্রণামের আটটি অঙ্গ কী কী?

এ নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাই নি। আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদের এ-বিষয়ে কোনো কৌতূহল নেই। ইজ্জত বাঁচাবার জন্য বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানতাম বটে; তবে ঠিক মনে করতে পারছি না।"

রূপসীকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোদের বাড়িতে পুরোহিত দর্পণ, পাঁজি ইত্যাদি কিছু আছে?"

ওসবের বালাই আজকাল কোনো বাড়িতেই থাকে না। মান রক্ষার জন্যে শেষ পর্যন্ত অগতির গতি আমাদের সমস্ত জ্ঞানের আধার খবরের কাগজ আপিসের রেফারেন্স-অফিসার নকুল চাটুজ্যেকে ফোন করলাম।

নকুলবাবু চটপট বললেন, "আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গ হলো—শল্য, শলাকা, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণ। আপনি তো গল্প লাইনের লোক? নিশ্চয় অষ্টাঙ্গ মৈথুনের ডিটেল জানতে চান। লিখে নিন—স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিষ্পত্তি।"

"না নকুলবাবু, এখন আমি গল্প লিখছি না। আমার জামাই-এর একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কাকে বলে?"

নকলবাবু হা-হা করে হেসে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানালেন, "জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য এবং দৃষ্টি—এই অষ্টাঙ্গ দিয়ে একসঙ্গে প্রণামের নাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।"

লিওসে বললো, "ওয়াণ্ডারফুল। একটি প্রণাম মানে সমস্ত দেহ এবং মনের সিমফনি। সাষ্টাঙ্গের মধ্যে বাক্য, বুদ্ধি এবং দৃষ্টিও রয়েছে।"

আমার কথাগুলো দ্রুত নোটবুকে লিখে নিয়ে সে বললো,

"আপনারা সহজেই যা স্মরণ রাখতে পারেন আমি তা ভুলে যাই, কিছু মনে করবেন না।"

রূপসী বললো, "লিওসে দাদাকে একবার সুনীতি চাটুজ্যের কাছে নিয়ে যাবেন? দাদা জানতে চান, এই লিওসে কথাটা বাংলাদেশে বহু ব্যবহারের পর কেমন দাঁড়াবে?"

বললাম, "তোর যদি উচ্চারণ করতে অসুবিধে হয়, লিনড়ুদা বলে ডাক। সুনীতিবাবু এখন কলকাতার বাইরে ফরেন ট্যুরে রয়েছেন।"

জামাই নিয়ে মাতামাতি করছি, কিন্তু মেয়ের দেখা নেই। রূপসী বললো "দিদি ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে হেয়ার-ডু করতে অর্থাৎ চুল ছাঁটতে গেছে।"

চুল ছেঁটে সুবর্ণরেখা এবার হাজির হলো। আমাদের ভাগ্নীর গায়ের রং যে কতটা কালো তা লিওসে বাবাজীর পাশাপাশি দেখে বুঝতে পারলাম।

নাইলনের টাইট প্যান্টি পরা একটা অদ্ভুত ড্রেস করেছে সুবর্ণরেখা। চুল ছেঁটে পুরোপুরি মেমসায়েব হবার চেষ্টা করছে সে।

সুবর্ণরেখা বললো, "কলকাতার দোকানগুলো একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে, মামা। ফেসিয়াল মাসাজ কাকে বলে জানেই না— চীনে মেয়েটা আমার মুখ খামচিয়ে দিলো।"

রূপসী বললো, "জানো মামা, কালকে যা হলো, গ্রেট! আমরা পার্ক স্ট্রীটের ম্যাড হাউসে গিয়েছিলাম। ডিসকোথেক-এ দিদির সঙ্গে লিওসেদাকে দেখে ওখানকার বহু দিশী তো ট্যারা! গান না শুনে আড়চোখে শুধু লিওসেদার দিকে তাকাচ্ছে—একেবারে লাল পড়ছে যাকে বলে! দিদিকে ওরা যে কী হিংসে করছিল তোমায় কী বলবো!"

সুবর্ণরেখা মিটমিট করে হাসলো। "সত্যি মামা, পার্ক স্ট্রীট পাড়ার ইণ্ডিয়ান মেয়েগুলো সায়েবদের জন্যে পাগল। লণ্ডনের কুলি পেলেও বিয়ে করে ফেলতে পারে!"

রূপসী বললো, "আরও কিছুক্ষণ থেকে মজাটা দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু লিওসেদার ওসব নাচগান ভাল লাগে না। আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।"

"ওর কথা ছেড়ে দাও, সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। বলে কিনা, জেনুইন সায়েবী চালচলন নাকি এখন ক্যালকাটা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না!"

হাজার হোক সম্পর্কে শ্বশুর, তাই সায়েব-জামাইকে শ্যালিকার হাতে সমর্পণ করে আমি ফুলিদির কাছে এলাম। রান্নাঘরে বসে ফুলিদি তখন গলদঘর্ম হচ্ছেন।

"তোমার তো হোটেল থেকে খাবার আনবার কথা ছিল?" ফুলিদিকে আমি জিজ্ঞেস করি।

এক গাল হেসে ফুলিদি বললেন, "এ-জামাই আগের জন্মে ভাটপাড়ার বাউন ছিল। পেঁয়াজ পর্যন্ত খায় না। আমাকে দু'বার করে রাঁধতে হচ্ছে। আমার মেয়েদুটির তো পেঁয়াজ রসুন ছাড়া মুখে কিছুই রোচে না! সারাজন্ম ওদের টেবিল চেয়ারে খাওয়া অভ্যেস, এখন জামায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী সবাইকে মেঝেতে বসে সাবেকী কায়দায় খেতে হচ্ছে। বাছা আমার কোত্থেকে আচমন পর্যন্ত শিখে এসেছে।"

এর পরে দিদির সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। দিদি যে জামাই-এর ব্যবহারে মুগ্ধ তা তাঁর মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারি।

ফুলিদি আজকে বলেই ফেললেন, "প্রথমে বড্ড ভয় হয়েছিল, কিন্তু খুকি ছেলে পছন্দ ভালই করেছে। বড় বিনয়ী, আমার সঙ্গে ভাঙা ভাঙা বাংলা ছাড়া কথাই বলবে না। দুজনের যে বেশ মনের মিল হয়েছে তাও বুঝতে পারি। খুকির কথার অবাধ্য হয় না। কোথায় কোন শ্লোকে পড়েছে—যে-গৃহে মেয়েদের কথা চলে সেখানে লক্ষ্মী বিরাজ করেন।"

রূপসী বললো, "দিদির তো আজকাল শাড়ী পরতে অসুবিধে

হয়—সব সময় স্ল্যাক্স পরে। জামাইবাবু কিন্তু স্যুটের ধারে কাছে যান না—পাজামা পাঞ্জাবি এবং চপ্পল পরে বসে থাকেন।"

সুবর্ণরেখা বললো, "এখানে আসবার আগে ও দিনরাত এদেশের সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সম্পর্কে পড়াশোনা করেছে। যত বলি, এসব আজকাল ইণ্ডিয়াতে চালু নেই, বিশ্বাস করে না। আমাকে জ্বালিয়ে মারে, হাজার রকম প্রশ্ন করে।"

রূপসী বললো, "এপাড়ার অনেক মেয়ে ভাবছে, সায়েব-বর বাগাবার লোভে দিদি নিজে গায়ে-পড়ে অজানা ছেলেদের সঙ্গে মিশেছে। মোটেই তা নয়। লিণ্ডসেদাই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে দিদির কাছে খবরাখবর নিতেন। এর আগে কোনো ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে ওঁর আলাপ হয় নি।"

জামাই যে ইতিমধ্যেই কিছুটা সংস্কৃত শিখেছে এবং রীতিমতো বাংলা পড়তে আরম্ভ করেছে জেনে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ আমার সংস্কৃত বিদ্যে তেমন সুবিধের নয় এবং জামাইয়ের কাছে কোন মামাশ্বশুর বেইজ্জত হতে চায়?

জামাই কিন্তু আমাকে অন্য ব্যাপারেও লজ্জা দিলো। বললো, "একটা মতবাদ আছে যে নাটক-নভেল উপন্যাস ছাড়া আর কোথাও দেশের মানুষদের প্রকৃত ছবি পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক দেশ এই ভারতবর্ষ, যুগযুগান্ত ধরে কত রকমের সাধনা এখানে হয়ে চলেছে। এই কিছুদিন আগেই তো শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। তারপর শ্রীঅরবিন্দ। কয়েকখানা বাংলা উপন্যাসের নাম করুন যেগুলো পড়লে এই স্পিরিচুয়াল ভারত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবো।"

ভেবেচিন্তে খবর দেবো এই বলে আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম। কারণ আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ কোনো বাংলা উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। আজকাল প্রায় সব গল্প-উপন্যাসে স্পিরিটের কথা আছে, কিন্তু সে হলো বোতলের স্পিরিট—দিশী ধেনো থেকে আরম্ভ করে স্কচ হুইস্কি পর্যন্ত। শুধু অধ্যাত্মবাদ কেন,

ট্রাডিশনাল ভারতের দর্শন, আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় না।

লিওসের সঙ্গে যতই আলোচনা করেছি, ততই আমার দুশ্চিন্তা বেড়েছে। বেচারা যে-ভারতবর্ষের খোঁজ করছে কোথায় পাবো তারে? আমরা যে-পরিবেশে জীবন কাটাই সেখানে ওসবের নাম শোনে নি কেউ। ফুলিদি কিন্তু বেজায় খুশি। শুধু মাঝে মাঝে ভয় পান, জামাইয়ের যা হাবভাব, শেষ পর্যন্ত বিবাগী না হয়ে যায়!

ফুলিদি একদিন টেলিফোন করে বললেন, "শংকর, তুই শুনে খুশি হবি, খুকির বর এখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা চাকরি পাচ্ছে। খুকিও কিছু-একটা যোগাড় করে নিতে পারবে। তাহলে আমার আর দুশ্চিন্তা থাকে না। আমেরিকা কি এখানে! অনেক দূর।"

আমিও আনন্দ প্রকাশ করলাম। কিন্তু তারপর মনে পড়ে গেলো, এর খারাপ দিকও রয়েছে। কিছুদিন পরে খবর পেলাম, লিওসে বাবাজীবন ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাজারে গেলে লোকে আড়চোখে দেখে, অনেকে সন্দেহ করে। সায়েবরা কুলীর মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে নিউ মার্কেটে বাজার করবে, থলি হাতে গড়িয়াহাটায় কেন? পাড়ার চায়ের দোকানে লিওসেকে বসতে দেখলেও লোকে ঘাবড়ে যায়। ফারপো এবং ফ্লুরি ছাড়া নাকি সায়েবদের মানায় না। সায়েবরা মোটর না চালিয়ে সাইকেল চড়বে এ-দৃশ্য সুশিক্ষিত ইণ্ডিয়ানদের কাছেও অসহ্য। লিওসে যখন সাইকেল চালিয়ে কলেজে যায় তখন পাবলিক ভাবে লোকটা হয় পাগল না হয় স্পাই!

মাঝে মাঝে বারওয়েল সায়েবের কথা মনে পড়ে যায়। সহজ ভাবে সাধারণের সঙ্গে মিশিতে গিয়ে তিনিও বেশ ধাক্কা খেয়েছেন। উলঙ্গ ভিখিরির ছেলেকে রাস্তায় কাঁদতে দেখে সায়েব একবার তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। সেই দেখে রাস্তার অনেকে মন্তব্য করেছিল, সায়েবটা পাগল।

সায়েবের কাছে কয়েকজন ভারতপ্রেমিক বিদেশী আসতেন তাঁদের অবস্থা দেখেও আমার মনে হতো, যে-সব বিদেশী আমাদের

জুতোর তলায় রাখে তাদেরই আমরা বেশী সম্মান করি। শ্বেতাঙ্গকে প্রভু ছাড়া অন্য কোনো রূপে আমরা এখনও দেখতে শিখি নি। যাঁরা আমাদের সঙ্গে সমভাবে মিশতে চেয়েছেন এবং সাধারণ মানুষকে ভালবাসতে গিয়েছেন, তাঁরা বিপদে পড়েছেন। নির্লজ্জভাবে আমরা সেইসব উদারপ্রাণ বিদেশীদের কাছে গ্রহণ করেছি এবং প্রতিদানে দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা ছাড়া কিছুই তাঁদের দিই নি। ডেভিড হেয়ার, সিস্টার নিবেদিতা, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ থেকে আরম্ভ করে বারওয়েল সায়েব পর্যন্ত অসংখ্য প্রমাণ দাখিল করা যায়। বিদেশে স্বজাতি বড়সায়েবদের সান্নিধ্য হারিয়ে এবং দরিদ্র ও দারিদ্র্য পরিবৃত হয়ে এঁরা এমন এক বিচিত্র নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছেন যা সত্যি বেদনাময়। অথচ এঁরা মুখ ফুটে কখনও তা স্বীকার করেন নি ; বরং হাসিমুখে স্বজাতির অপকর্মের পাপস্খালনের চেষ্টা করেছেন।

ম্যাক্সমুলর যদি ইণ্ডিয়ায় আসতেন তাহলে কত ভোগান্তি তাঁকে সহ্য করতে হতো কে জানে। ইদানীং কালে হিপিদের সম্বন্ধেও আমাদের ঘেন্না, যেহেতু তারা খালি পায়ে নোংরা জামা পরে আমাদের দেশের কোটি কোটি লোকের মতো অর্ধনগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এরা যদি অনেক টাকা খরচ করতো, বিরাট বিরাট গাড়িতে ঘুরে বেড়াতো, গ্র্যাণ্ড গ্রেট ইস্টার্নের ঠাণ্ডা ঘরে বসে বোতল বোতল হুইস্কি ওড়াতো, তাহলে আমাদের মোটেই আপত্তি থাকতো না। যে-সায়েব রিক্‌শা চড়ে, নিজের মোট নিজে বয়, পাইস হোটেলে ভাত খায় তাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই তাদের আমরা পছন্দ করি না। কলোনিয়াল যুগে তৈরি সায়েবের ভাবমূর্তির সঙ্গে তারা মেলে না। শ্বেতাঙ্গকে হয় প্রভু না-হয় দেবতা ছাড়া আমরা কল্পনা করতে পারি না।

আমাদের এই অভাগা দেশকে নীরবে ভালবেসে কয়েকজন বিদেশী কী ভাবে স্বজাতির বিদ্রূপ এবং আমাদের অবহেলার পাত্র হয়েছেন তা লিপিবদ্ধ করলে মহাভারত হয়ে যাবে। প্রমাণ হচ্ছে যে এখনও আমরা সমানভাবে মিশতে শিখি নি।

লিণ্ডসে মিল্‌নার সম্বন্ধেও আমার ঐরকম একটা দুশ্চিন্তা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য অধ্যাপনা করে তাকে মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করতে হবে। সে নিজে তা বরদাস্ত করলেও, আমরা তা পারবো না। সে আমাদের যত ভালবাসবে আমরা তাকে তত অবহেলা করবো। কিন্তু মুখের ওপর এসব কিছুই বলি নি। প্রাণ যা চায় তা করবার স্বাধীনতা ইউরোপ আমেরিকার নাগরিকরা এখনও উপভোগ করে। পরম ভোগের মধ্যেও ওদেশে 'তাই মাদার তেরেসেরা জন্মগ্রহণ করেন; অথচ আমাদের আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানের যথেষ্ট সন্ন্যাসী পাওয়া যায় না। আমাদের ডাক্তাররা বাড়তি টাকার লোভে মার্কিন মুলুকে কিংবা কানাডায় ছোটে, আর কুষ্ঠরোগীর ক্ষত মুছিয়ে দেবার জন্যে পুরুলিয়ার হাসপাতালে সায়েব ডাক্তার ও নার্সের অভাব হয় না। পশ্চিমী সভ্যতার এই অন্তর্নিহিত শক্তির দিকটা আমাকে বিস্মিত করে। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়।

লিণ্ডসে মিল্‌নার এখানে চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। ছাত্ররা ওকে নিয়ে রসিকতা করতো। কারণ 'সাষ্টাঙ্গ প্রণাম' কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর ছাত্ররা দিতে না পারলে সে রীতিমতো দুঃখ পেতো। ক্লাসে সে বলতো, "তোমরা নিজেদের আবিষ্কার করো; আত্মবিস্মৃত জাতি কখনও দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে না।"

সৌভাগ্যক্রমে জামাই সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মাস কয়েক পরেই শুনলাম, লিণ্ডসে মিল্‌নার কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রূপসী টেলিফোনে বললো, "লিণ্ডসেদার মোটেই যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এখানকার জল-হাওয়া দিদির একেবারেই সহ্য হচ্ছে না। এখানকার বাসে-ট্রামে যা ভিড়, রাস্তাঘাটে যা ময়লা, খাবারে যা ভেজাল তা দিদির পক্ষে বরদাস্ত করা আর সম্ভব নয়। লিণ্ডসেদাকে জোর করে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দিদি শ্বশুরবাড়ির দেশ নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছে!"

টি-ডবলু-এ বিমানে প্যারিস থেকে প্রায় সাড়ে-আট ঘণ্টা অবিরাম বিমানচারণা করে নিউইয়র্কে পৌঁছনো গেলো। নিউইয়র্কে কেবল এরোপ্লেন বদল এবং কাস্টমসের ঝামেলা চুকনোর পালা। আমার গন্তব্যস্থল ওয়াশিংটন, ডিসি।

লণ্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে যে-দুর্ব্যবহার পেয়েছিলাম ঠিক তার উল্টো পেলাম নিউইয়র্কে। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবরকম বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে মার্কিন মুলুকে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা পাওয়া গেলো। সরকারী অফিসারটি সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শুধু প্রশ্ন করেছিল, আমার কাছে কোনো ড্রাগ আছে কিনা। সঙ্গে কয়েকটা মাথাধরার বড়ি ছিল। সেকথা জানাতে অফিসারটি হেসে ফেললো। বললো, ওগুলো ড্রাগ নয়- মেডিসিন। ড্রাগ বলতে ওখানে গাঁজা সিদ্ধি ইত্যাদি নেশাভাঙের জিনিস বোঝানো হয়ে থাকে।

অফিসারটি আমাকে বুঝিয়ে দিলো কোথায় ওয়াশিংটনের পরবর্তী প্লেন পাওয়া যাবে এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, হ্যাভ এ গুড টাইম ইন আওয়ার কানট্রি।

ওই 'গুড টাইম' কথাটা ওয়াশিংটনের প্লেনে চড়েও আমার মাথায় ভন ভন করে ঘুরছিল। মনের খুশীতে সময় কাটাবার উপদেশ বিদেশ যাত্রার আগে মাও আমাকে দিয়েছিলেন। মা বলেছিলেন, "বেড়াতে বেরিয়ে ঘরের কথা ভেবে মন খারাপ করিস না। যেখানে যেমন দেখবি সব মনে করে রাখবি—তুই ফিরে এলে গল্প শুনবো।"

কিন্তু নদী, পর্বত, সাগর, মহাসাগর পেরিয়ে যতদূরে যাই, ঘরের কথা—দেশের আপন জনদের কথা ভোলা সম্ভব হয় না।

ওয়াশিংটনের হোটেলে আমার গৃহিণীর মাসীমা সুনয়না দেবীর চিঠি অপেক্ষা করছিল। কাজের চাপে এবং দেশ দেখার নেশায় আমি পাছে ভুলে যাই তাই মাসীমা মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমাকে সুচিত্রার সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। বলাবাহুল্য সুচিত্রা আমার প্রিয় শ্যালিকা ও মাসীমার একমাত্র কন্যা।

মার্কিন রাজধানীতে কয়েকদিন সময় কাটিয়ে বাস যোগে নর্থ ক্যারোলিনা গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বিমান যোগে আবার নিউ-ইয়র্কে ফিরে এসেছি। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময়ী নগরী নিউইয়র্ক সম্পর্কে আমার প্রচণ্ড আগ্রহ। বাড়তি আকর্ষণ কলামবিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণি নাগের সান্নিধ্য। ওঁর বাড়িতেই কয়েকদিন মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল।

সুচিত্রার ব্যাপারটা যে এতো সিরিয়াস তা আন্দাজ করতে পারি নি। সুদীর্ঘ পত্রে মাসীমা লিখেছিলেন, "জানি বিদেশে তোমার সময়ের অনেক দাম, নিশ্চয় খুব ব্যস্ত আছো। তবু যদি মাসীমার মুখ চেয়ে সুচিত্রার খবরাখবর নিয়ে না আসো তাহলে আমি বাঁচবো না—হয়তো স্ট্রোকে মারা যাবো।"

ডক্টর নাগ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, "ইণ্ডিয়ানদের এই দিকটা সঙ্গতভাবেই সায়েবরা পছন্দ করেন না। কয়েক সপ্তাহের জন্যে এখানে এসে সমস্ত সময়টা যদি ভাগ্না, ভাগ্নী, মাসীমা, কাকীমা, শ্যালিকাদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই কেটে যায়, তাহলে মার্কিনীদের সঙ্গে মিশবেন কখন? তাদের আবিষ্কার করবেন কী ভাবে?"

অধ্যাপক নাগ যা বলেছেন, তা নির্জলা সত্য। কিন্তু আমি কী করি? সুনয়নাদেবী কাতরভাবে লিখেছেন, "মেয়ের চিঠিতে জানলাম রাতে তার ঘুম নেই। সেই খবর পেয়ে আমাকেও ঘুমের বড়ি খেতে হচ্ছে। সংসারে মেয়েদের অনেক কিছু হতে পারে যা বাবা-মাকেও লিখে জানানো যায় না।"

আমার মন খারাপ হয়ে গেলো, মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। আধুনিক এই যুগে ঘরে-ঘরে এমন ঘটনা ঘটছে যা

টেলিফোনে বলা যায় না, কানে শোনা যায় না, চোখে দেখার কথাই ওঠে না।

অধ্যাপক নাগ পেশায় নৃতত্ত্ববিদ—সুতরাং প্রায় মুক্তপুরুষ। নর-নারীর কোনো সম্পর্ক সম্বন্ধেই ওঁদের লাজ-লজ্জার বালাই নেই। ওঁকে আমাদের মতো সাধারণ লোকের চক্ষুলজ্জার কথা বলে লাভ নেই।

নিউইয়র্কে আমাদের ঘরে আর একজন জাঁদরেল বাঙালী ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি বললেন, "রচেস্টার দর্শনে আপনি যদি বদ্ধপরিকর হন, তাহলে যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। এখন আমাদের যে-আলোচনা চলছিল চলুক।"

সুচিত্রা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে আমি নিউইয়র্কের রবিবাসরীয় আড্ডায় ছন্দপতন ঘটিয়েছি। এখানে সকলের সময়ের দাম প্রচণ্ড। আড্ডার টাইমে অন্য কিছু ভেবে সময় অপচয় করলে বন্ধুরা বিরক্ত হন।

বন্ধুদের আলোচনার বিষয় ইন্টারেস্টিং—জাত হিসেবে ভারতীয়দের বৈশিষ্ট্য। মিস্টার সেনগুপ্তর কাছেই শুনলাম, প্রত্যেক দেশ অন্য দেশের মানুষদের চারিত্রিক শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে একটা মতামত তৈরি করে রাখে। এশিয়া-বিশেষজ্ঞ সেনগুপ্ত জানালেন, "যেমন এবারের ইণ্ডিয়া ট্যুরে গিয়ে ডেল্লিতে একটা ভ্যালুয়েব্‌ল শ্লোক শুনে এলাম। হুজুগে বাঙালী—হিকমতে চীনে।"

উক্তির ভাষ্য দিতে গিয়ে সেনগুপ্ত বললেন, "এর অর্থ হলো বাঙালীরা হুজুগ পেলে আর কিছুই চায় না; আর চীনেরা চরম দুর্দশায় পড়লেও হিকমত দেখিয়ে দেয়। কলকাতায় বাঙালীও থাকে, চীনেও থাকে। গরীব বাঙালী হুজুগ তুলছে আর গরীব চীনে কলকাতার রাস্তা থেকে ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে তার থেকে পুতুল তৈরি করে বেচছে।"

সেনগুপ্ত আমার মতামত জানতে চাইলেন। কিন্তু তখন আমার মাথায় শুধু সুচিত্রার কথা ঘুরছে। তাই ওইসব তর্কাতর্কির মধ্যে ঢুকলুম না।

অধ্যাপক নাগ বললেন, "চীনে-ফিনে জানি না, তবে ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে এখানে কিছু কিছু সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে। এইসব রিপোর্ট সরকারী মহলেও পড়া হয়ে থাকে শুনি। অন্তত যেসব এদেশীয় ভারতবর্ষে যান তাঁরা নিশ্চয় পড়েন।"

তাতে কী থাকে জানবার জন্যে সেনগুপ্ত সাংবাদিক-সুলভ কৌতূহল প্রকাশ করলেন। অধ্যাপক নাগ বললেন, "কনসেনসাস কথাটা ইংরিজীতে শুনে থাকবেন, ওর ঠিক বাংলা জানি না। পণ্ডিতরা বলছেন, হাজার হাজার বছর ধরে এই কনসেনসাস-প্রবণতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়। নানারকম পরস্পর-বিরোধী মতের মধ্য থেকে ভারতবর্ষ চেষ্টা করে কীভাবে একটা মোটামুটি মতৈক্যে পৌঁছনো যায়। কেউ পুরোপুরি হারলো না, দু-পক্ষই একটু-আধটু করে ছাড়লো।"

মার্কিনীদের প্রশংসা করে সেনগুপ্ত বললেন, "শ্যামচাচা তো আমাদের সম্পর্কে ডেনজারাস পয়েন্ট খুঁজে বার করেছেন!"

অধ্যাপক নাগ বললেন, "এরা বলছে, বিভেদের মধ্যে ঐক্য খুঁজে বার করবার কাজে ইণ্ডিয়ার জুড়ি নেই। ভারতবর্ষে তাই বড় বড় চিন্তার বিপ্লব এসেছে, কিন্তু কখনও নতুনের সঙ্গে পুরনোর লাঠা-লাঠি হয় নি।"

"মানে?" সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন।

"এই ধরুন হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের কথা। এক ধর্ম এসে অন্য ধর্মকে নির্বংশ করতে পারলো না। বরং দুটো মতের মধ্যে কোথা থেকে একটা সমঝোতা খুঁজে পাওয়া গেলো। হিন্দুরা বুদ্ধকে অবতার বলে মেনে নিলো, আর বৌদ্ধদের মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতেই হিন্দুত্বের অনেক গ্লানি ঢুকে গেলো, যার বিরুদ্ধে বুদ্ধ একদা বিদ্রোহ করেছিলেন। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কনসেনসাসের জয় হলো।"

সেনগুপ্ত বললেন, "এটা মোটেই ভাল কথা নয়। এই জন্যে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু একই সঙ্গে আমাদের পোড়া দেশে সহ-অবস্থান করছে, অথচ কোনো সমস্যার ফয়সালা হচ্ছে না।"

অধ্যাপক নাগ বললেন, "ভাল মন্দর প্রশ্ন উঠছে না, আমরা যা তাই। এই মানিয়ে-গুছিয়ে চলাটাই আমাদের শক্তি এবং আমাদের দুর্বলতা। আমাদের যৌথ পরিবারগুলো দেখুন। এ-সম্বন্ধে বিদেশী সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের প্রচণ্ড আগ্রহ। তাঁরা বলছেন, একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা বা গিন্নী কখনও কঠোর হাতে শাসন করেন না। তাঁরা সব সময় পরিবারের নানা লোকের মধ্যে একটা কনসেনসাস খুঁজে বার করে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন।"

"তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী?" আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম।

মৃদু হেসে অধ্যাপক নাগ উত্তর দিলেন, "দাঁড়াচ্ছে এই যে, পণ্ডিতদের মতে মানিয়ে-গুছিয়ে চলার জাত হিসেবে আমাদের জুড়ি নেই। দুটো মতবাদ, চিন্তাধারা বা জীবনযাত্রার মধ্যে যতই দুরতিক্রম্য দূরত্ব থাকুক আমরা ঠিক সেতুবন্ধন করে ফেলবো। দেখবেন, এই কারণে আমেরিকাতেও ইণ্ডিয়ানরা যত সহজে নতুন কালচারের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয় তা আর কোনো বিদেশী পারে না!"

"কী বলছেন মশায়?" প্রতিবাদ করলেন সেনগুপ্ত। "[illegible] জাতের ছেলেমেয়ে দেখছি—একেবারে আমেরিকান হয়ে গে[illegible]"

আবার হাসলেন অধ্যাপক নাগ। বললেন, "দুটো চরম অবস্থা দেখতে পাবেন। হয় সেদ্ধ হয়ে গলে গিয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একেবারে মার্কিনী বনে গেছে—না হয় চীনেদের মতো আসেদ্ধ হয়ে আমেরিকাতেও পুরো চীনে থেকে গেছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা দেখবেন আমেরিকানও হয়েছে অথচ ইণ্ডিয়ানও রয়ে গেছে।"

"অর্থাৎ দুধ ও তামাক দুই খাচ্ছে, এই বলতে চান?" ফোড়ন দিলেন সেনগুপ্ত।

ঐ মানিয়ে-গুছিয়ে চলা কথাটা আমার খুব ভাল লেগে গেলো। সুচিত্রা সম্পর্কে হঠাৎ একটু ভরসাও পেলাম। ওর সমস্যা যা-ই হোক, দিদিমাদের পুরনো মানিয়ে-গুছিয়ে চলার উপদেশটাই সুচিত্রাকে আবার দিতে হবে—এবং মনে করিয়ে দিতে হবে,

সায়েবরাও এখন স্বীকার করেছেন, ইণ্ডিয়ানরা এই বিষয়ে জাদুকরের ক্ষমতা রাখে।

রচেস্টারের পথে বাসের সীটে বসেও সুচিত্রার কথা ভাবছিলাম। মধুর স্বভাবের সপ্রতিভ এই বালিকাটিকে আমি ফ্রক-পরা অবস্থা থেকে চিনি। কোনো বিখ্যাত গ্লিসারিন সাবানের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী, যখন সে 'একটি সুন্দরী মহিলা হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে' তখন থেকেই সুচিত্রার সঙ্গে আমার মধুর রসিকতার সম্পর্ক; তখন থেকেই কিছু কিছু চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে। জামাইবাবুর পত্রাবলী সুচিত্রাদেবী সযত্নে রক্ষা করেছে।

এই সুচিত্রা যথাসময়ে আমেরিকা-প্রবাসী এক ছোকরার গলায় মালা দিলো: ব্যবস্থাটা সুনয়নাদেবীই করেছিলেন। রীতিমত পণ্ডিত ও সুদর্শন এই জামাই মাসে সাড়ে-সাতহাজার টাকা রোজগার করে; সাড়ে-সাতহাজার টাকা মাইনের বর পেলে বাংলার সব মেয়েই যে মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত যেতে পারে এমন একটা মন্তব্য গিন্নী আমাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। দোষের মধ্যে, আমি বলেছিলাম—অত দূরে বিয়ে কি ঠিক হবে? সুচিত্রার দিদিমা ও আমি ছাড়া তখনই সকলেই খুশি। দিদিমা বলেছিলেন, "ছোটবেলায় নাতনীকে পৈ-পৈ করে বলেছিলাম, ডাল ঝাড়ার সময় কাছে আসিস না, কুলোর হাওয়া লাগবে। আর পা-ছড়িয়ে খাস না। তা নাতনী তখন কথা শুনলো না, আর আমার মেয়ে কথাটা কানেই নিলো না। এখন বোঝো, তখনই জানি এ মেয়ের দূরদেশে বিয়ে হবে।"

আমেরিকাতে যখন সুচিত্রার প্রথম সন্তান হলো তখন আমরা অমিতের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে সুচিত্রা আমাকে জরুরী চিঠি লিখেছিল: "সাতদিনের মধ্যে মেয়ের নামকরণ করে পাঠিয়ে দেবেন। খাঁটি ভারতীয় নাম হবে, অথচ সায়েবদের যেন উচ্চারণ করতে কষ্ট না হয়। এখানে এক ভদ্রলোক মেয়ের নাম রেখেছিলেন সুশ্রুতা—এখন ইস্কুলে সেই

মেয়ের যা অবস্থা! কেউ উচ্চারণ করতে পারে না, অদ্ভুত অদ্ভুত বিকৃতি ঘটছে।"

আমি খেটেখুটে, বই-পত্তর ঘেঁটে সুচিত্রার অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু সুচিত্রা সে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করে নি। শ্বশুরবাড়িতে শুনেছিলাম, সুচিত্রা আমার পরামর্শ অনুযায়ী মেয়ের নাম কুমকুমই রেখেছে, কিন্তু আমার ওপর সে ভীষণ চটেছে, হয়তো আমার সঙ্গে কোনোদিন কথাই বলবে না! ছ'মাসের কুমকুমকে কোলে নিয়ে সুচিত্রা যখন কলকাতায় ছুটি কাটাতে এসেছিল তখনও আমার ওপর রাগ কমে নি। আমি অবশ্য শ্যালিকা সন্দর্শনে গিয়েছিলাম। পর্যাপ্ত বর্ষণের পর লতাগাছগুলো যেমন সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে সুচিত্রাকে তেমন প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। দেহটি বেশ সুপুষ্ট হয়েছে—অথচ কিছুতেই তাকে মোটা বলা চলে না। সর্বদেহে নবমাতৃত্বের স্নিগ্ধ দীপ্তি। নবযৌবনের অস্থিরতা বিদায় নিয়েছে স্বভাব থেকে, তার বদলে চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সেই প্রশান্ত দীপ্তি যা মধ্যযৌবনেও মেয়েদের মহীয়সী করে তোলে। সুচিত্রার কাছে নিজের মনোভাব গোপন রাখি নি। সাধুভাষায় সাহিত্যিক গাম্ভীর্য নিয়ে বলেছিলম, "মহিলারা মাতা না হইলে প্রকৃত সুন্দরী হয় না!"

প্রশংসায় খুশি হওয়া সত্ত্বেও, পুরনো রাগ ভুলতে পারছিল না সুচিত্রা। বেশ গম্ভীরভাবেই বললো, "আপনার সঙ্গে কথা বলবো না ঠিক করে রেখেছিলাম।"

খুবই দুঃখের সঙ্গে বললাম, "ছেলেমেয়েদের নাম দেবার জন্যে লেখকরা আজকাল ফি নেয়। পারিশ্রমিক তো দূরের কথা আমি এক লাইন ধন্যবাদপত্র পর্যন্ত পেলাম না।"

সুচিত্রার বিরক্তির কারণটা এবার জানতে পারলাম। ইণ্ডিয়ান অথচ আন্তর্জাতিক নাম ভাবতে গিয়ে একটা নামের বদলে হঠাৎ এক সেট নাম আমার মাথায় এসে গিয়েছিল। এবং এই আবিষ্কারের আনন্দে আমি সুচিত্রাকে লিখেছিলাম, "এই মেয়ের নাম দাও কুমকুম।

ম্যাচ করে আরও দুটো মারাত্মক নাম মাথায় এসে গেছে। কুমকুমের বোনের নাম যদি 'আলতা' এবং 'টিপ' হয় তাহলে যা ছন্দ মিল হবে! ও দুটো নাম হারিও না। চিঠিটা যত্ন করে রেখে দিও।"

সুচিত্রা জানালো, যত্ন করে চিঠি রাখা তো দূরের কথা, সেই অমূল্য পত্রখানি সে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সুচিত্রার রাগের কারণটাও এবার বুঝতে পারলাম। সুচিত্রা মনে করেছে, আমি চাইছি তার শুধু পর পর কন্যারত্নই হয়ে যাক।

"আমি শুধু ছন্দের দিক ভেবেই নামগুলো তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, সুচিত্রা। আমার অন্য কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না।" সুচিত্রাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সুচিত্রা, কিছুতেই আমাকে বিশ্বাস করতে চায় না। ওর ধারণা আমি দুষ্টুমি করেই তিনটে নাম পাঠিয়েছিলাম। আমি আবার বোঝাবার চেষ্টা করলাম, "তুমি কষ্ট করে মা হবে, সুতরাং ছেলে নেবে না মেয়ে নেবে—সে তোমার নিজস্ব চয়েস। আমরা বাইরের লোকেরা সেখানে নাক গলাতে যাবো কেন? তবে তোমার ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক আমাদের কাছে সমান আদর পাবে।"

একটা টাওয়েল জড়ানো অবস্থায় কুমকুম মায়ের কোলেই ছিল। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বললুম, "কুমকুম না হয়ে ইনি যদি গুমগুম হতেন তাহলেও আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতুম। তুমি অযথা রাগ করছো সুচিত্রা। কোনো দুষ্ট প্রকৃতির লোক তোমাকে আমার চিঠির ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে। হয়তো তোমার এবং আমার পরিচিত এমন কেউ আছে যে চায় না তোমার সঙ্গে আমার সহৃদয় সম্পর্কটা উত্তপ্ত থাকুক।"

সুচিত্রা দেবীর মেঘলা মুখে ফিক করে রোদ হেসে উঠলো। সে জিজ্ঞেস করলো, "বাগড়া দিয়ে লাভ?"

"আমার ক্ষতি করা। শ্যালিকা-সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা।" আমি উত্তর দিই।

সুচিত্রার মুখে হাল্কা হাসির ইঙ্গিত পেয়ে আমি বললুম, "চিঠিটা ছিঁড়ে না-ফেলে যদি ঠাণ্ডা মাথায় খুঁটিয়ে পড়তে, তা হলে দেখতে, আমি হয়তো আলতা এবং টিপকে আহ্বান করেছি, কিন্তু তোমার ছেলে না হোক এমন কথা কোথাও বলি নি। তোমার ছ'টা ছেলে হোক—আমাকে একটু খাটতে হবে, কিন্তু বঙ্গীয় শব্দকোষ দেখে এবং নকুল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কনসাল্ট করে আমি পরের পর নাম সাপ্লাই করে যাবো।"

"নকুল চট্টোপাধ্যায়টি কে?" সুচিত্রা বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"ইনফরমেশন টাইকুন নকুল চট্টোপাধ্যায়—তামাম সাহিত্যিকদের গ্রন্থ ও গ্রহসংক্রান্ত উপদেষ্টা! আজকাল গ্রন্থ তো লিখলেই হলো না—রচনাকালে কোন গ্রহ কোথায় কী ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছেন তার খবরাখবর রাখতে হবে! কুমকুমের বেলায় নকুলবাবুকে কনসাল্ট করেছিলুম। আমি তো প্রথমে রাধিকা নাম দিতে যাচ্ছিলাম—দিশী নাম, অথচ এখন সায়েবরা পর্যন্ত এক ডাকে চেনে। কিন্তু নকুলবাবু স্ট্রংলি আপত্তি জানালেন। বললেন, 'র' দিয়ে আরম্ভ করা চলবে না—কারণ রচেস্টারের কাছ দিয়ে তোমার মেয়ের জন্ম সময়ে এমন এক হিংসুটে গ্রহ দৃষ্টি দিয়েছেন যিনি 'র' পছন্দ করেন না। আমাকে 'ক' অক্ষরে নাম দিতে হবে। সেই থেকেই তো আমার ফ্যাসাদ হলো, এমন ফ্যাসাদ যে শ্যালিকার সঙ্গে এতো বছরের সম্পর্ক নষ্ট হতে চলেছে।"

এইবার একগাল হেসে ফেললো সুচিত্রা। এবং ফাঁস করলো যে আমার চিঠিটা শেষ পর্যন্ত ছেঁড়া হয় নি। সুচিত্রা ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বামী অমিত হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেই চিঠি উদ্ধার করেছে। সুচিত্রা বললো, "আমিও ভাবলুম রেখে দিই। আমার যদি আবার মেয়ে হয়, ঐ চিঠির সঙ্গেই একটা 'পত্রবোমা' দিয়ে আপনার নামে ফেরত পাঠাবো।"

তারপর কয়েকবছর হয়ে গেছে। সুচিত্রার আর কোনো সন্তান

হয় নি এবং পত্রবোমাও আসে নি। পত্রবোমা বলতে সুনয়নাদেবীর এই পত্র।

বাস চলেছে রচেস্টারের দিকে। আর ক্রমশ আমার চিন্তা বাড়ছে।

রচেস্টারে আমার এখন যাবার কথা নয়। কোনোরকমে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় ম্যানেজ করেছি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় হাতে এইভাবে রচেস্টারে যেতাম না, যদি-না সুচিত্রা সম্পর্কে সুনয়নাদেবী আমাকে এইভাবে চিন্তিত করে তুলতেন। সুচিত্রার সমস্যাটা কী হতে পারে ভাবছিলাম। মাসীমা এমনও ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে সুচিত্রা আমার সঙ্গে দেশে ফিরে আসতে পারে।

অমিতের সঙ্গে কিছু হলো নাকি? অমিতের মুখটা মনে পড়ে গেলো। সুদর্শন অমিত ছেলেটি তো ভদ্র এবং শান্তশিষ্ট। কথা কম বলে। সে কখনও গণ্ডগোল পাকাতে পারে না। কিন্তু ভরসাও পাচ্ছি না। শঙ্করীদার কথা মনে পড়লো। তিনি বলেন, "শান্তশিষ্ট গোবেচারা ছেলেরাই হৃদয়সংক্রান্ত ব্যাপারে বেশী গণ্ডগোল পাকায়। হেঁকো-ডেকো ছেলেদের সম্বন্ধে আমরা দুশ্চিন্তা করি, কিন্তু তারা কখনও বেশীদূর এগোয় না। পরনারী থ্রম্বসিস তাদের বিশেষ হয় না।"

শঙ্করীদার বলবার অধিকার আছে, কারণ কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার সঙ্গে তিনি অনেকদিন সহ-অবস্থান করছেন।

মনে পড়লো, সুচিত্রার মা আমাকে কিছুদিন আগে পশ্চিমের ডাইভোর্স সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি কোনোদিন ওদেশে যাই নি, আমার বিদ্যে বই থেকে এবং কিছু শোনা কথা থেকে। তার ওপর নির্ভর করে কতটুকু উত্তর দেওয়া যায়? শুধু এইটুকু বলেছিলাম, "পশ্চিমে বিয়েটা ভাঙে একটু বেশী। আজকাল আমাদের দেশেও ঘরে ঘরে ফাটা বিয়ে রয়েছে। ছেঁড়া সম্পর্কে তাপ্পি দিয়ে চালিয়ে নেবার অভ্যেস আমাদের দেশের গৃহকর্মনিপুণা ধৈর্যবতী মেয়েদের আছে—ওদেশে নেই। ওরা কেউ ফাটা বাসন ব্যবহার করে না।"

শাশুড়ী-সুলভ গাম্ভীর্য ত্যাগ করে সুচিত্রার মা আরও যা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা আমি ভেবেছিলাম পাঠিকা-সুলভ কৌতূহল। সুনয়নাদেবী বলেছিলেন, "মেয়ের চিঠি পড়লে তো রক্ত হিম হয়ে আসে। হুদো-হুদো স্বামী-স্ত্রীরা নাকি অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম করছে এবং তারপরেই ঘর ভাঙছে। দোজবউ তেজবউ-টা কিছুই নয়। এসব কি সত্যি ?"

আমি বলেছিলুম, "যে-দেশের লোক যা ভালবাসে তাই করে—আমাদের কী এসে যায় বলুন ?"

সুনয়নাদেবী সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বলেছিলেন, "এসে যায় বৈকি, বাবা। এইসব সায়েবদের হাতেই তো ক্ষমতা—এরাই তো দুনিয়া চালাচ্ছে। এদের সঙ্গেই তো আমার মেয়ে জামাইকে মিশতে হয়।"

আমি বলতে গিয়েছিলাম, "ওরা যে দুশ্চরিত্র তা নয়। তবে বিয়ের আগে বহুজনের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে ; বিয়ের পরেও অনেকের সেই অভ্যেসটা যেতে চায় না। সমাজ একদিক থেকে বেশ গোঁড়া। আইবুড়ো ছেলে-মেয়েদের জন্যে অবাধ লাইসেন্স, কিন্তু বিয়ের মন্তর পড়লেই কঠিন আইনকানুন, সব স্বাধীনতা বাতিল হয়ে গেলো।"

মনে পড়ছে, সুচিত্রার মা ওদের জন্যে কোনোরকম সহানুভূতি প্রকাশ করেন নি। বলেছিলেন, "বিয়ের পরেও যারা চপল চঞ্চল থাকে তাদের ক্ষমা করা যায় না। গল্প-উপন্যাসে এদের কখনও আস্কারা দিও না। ছেলেমেয়েরা তো তোমাদের বই পড়েই শিখবে।"

পশ্চিমী হাওয়া শেষপর্যন্ত অমিতের গায়েও লাগলো ভেবে আমি শিউরে উঠছিলাম। আহা, সুচিত্রা মেয়েটি বড় ভাল। কুমকুমও এতোদিনে নিশ্চয় খুব মিষ্টি হয়েছে। (ওর বয়স বছর সাতেকের বেশি হয় নি বলেই মিষ্টি কথাটা লিখতে সাহস করলাম। আজকালকার যুবতী মেয়েরা এই বিশেষণ মোটেই পছন্দ করে না, ওদের অঙ্গে লাগে! রেগেমেগে জিজ্ঞেস করে, মেয়েরা কি খাবার জিনিস, যে [illegible]

সুচিত্রার সুখী সাংসারিক পরিবেশে স্বয়ং অমিত গাঙ্গুলী ছাড়া কে আর তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারে? ভগবানের ওপরও রাগ হলো। সংসারের হাজার রকম জট ছাড়িয়ে জীবনে একবার কয়েকদিনের জন্যে বিদেশে বেড়াতে এলাম, এখনও মুক্তি দিলেন না। এখানেও স্নেহভাজনীয়া কারও চোখে জল দেখতে হবে।

বাসের হাল্‌কা নীল কাঁচের মধ্য দিয়ে সুচিত্রাকে দূর থেকে দেখতে পেলাম। নীল রংয়ের এক নাইলন শাড়ি পরে বিষণ্ণ মেডোনার মতো দাঁড়িয়ে, রয়েছে, বাসস্ট্যাণ্ডের ঠিক বাইরে।

বাসস্ট্যাণ্ডে অমিতকে না দেখে বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সুচিত্রাকে তাহলে একলা আসতে হয়েছে। আমি মনস্থির করে ফেললাম। আমি তো মাত্র দু' তিন ঘণ্টা থাকবো। তারপরেই তো আমাকে এয়ারপোর্টে ছুটতে হবে। এয়ারপোর্ট থেকেই সুচিত্রার মাকে আমি বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়ে দেবো! ওঁর মতামত আমি এদেশে থাকতে থাকতেই এসে যাবে। তখন যা হয় করবো। তেমন প্রয়োজন হলে হলিউড যাওয়া বন্ধ রেখে সুচিত্রার কাছে ফিরে এসে ফয়সালা করে ফেলবো।

বাস থেকে নামতেই সুচিত্রা এগিয়ে এলো। ওর শ্রী এবং স্বাস্থ্য প্রায় একরকমই আছে, শুধু আগেকার সবুজ সতেজ ডাঁসা-ভাবটা নজরে পড়ছে না।

মুখে হাসি ফুটিয়ে সুচিত্রা আমাকে ওয়েলকাম করলো। অভিনয়ে সব মেয়ের জন্মগত অধিকার। সুচিত্রার ওই হাসির আড়ালে কতবড়ো কালো মেঘ লুকিয়ে আছে ভেবে আমার কষ্ট হলো।

"এলেন তাহলে, শংকরদা?" সুচিত্রা বললো।

"না এসে উপায় আছে? এই রকম শ্যালিকার আকর্ষণে লোকে উত্তর মেরু পর্যন্ত যেতে পারে," আমি সরস উত্তর দেবার চেষ্টা করি।

অমিত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলাটা সমীচীন হবে কিনা ভাবছি। সুচিত্রা বললো, "খুব তো ভালবাসা! প্ল্যাটফরমে দেখা করে

অন্য সময় হলে এই রাত কাটানোর নিমন্ত্রণ সম্পর্কে বিবাহিতা শ্যালিকার সঙ্গে কত রসিকতা করা যেতো। কিন্তু এখন সে-সময় নয়। বললুম, "আজকে শুধু বুড়ী ছোঁয়া। আমেরিকা ছাড়বার আগে আবার আসবো।"

সুচিত্রা বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললো, "আপনি কী রকম লাকি, শংকরদা! কয়েকদিন পরেই আমেরিকা ছেড়ে চলে যাবেন। আমার কপাল খারাপ। আমি রোজ প্রার্থনা করছি, ঠাকুর আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

সিরিয়াস বিষয়ের অবতারণা আশঙ্কায় আমি ভিতরে ভিতরে ঘামতে লাগলাম। বড় সরল মেয়েটা। ফ্রকপরা বয়স থেকে হাসি খুশি দেখে এসেছি—ওর চোখে জল দেখতে ইচ্ছে করে না।

"কফি খাবেন?" সুচিত্রা জিজ্ঞেস করলো। ভাবলুম একবার বলি, বাড়িতে গিয়েই খাবো। কিন্তু বাড়ির অবস্থা কি জানি না। তাই সে কথা তুলতে সাহস হলো না। বললুম, "চলো, ওই কাফেটারিয়াতে বসা যাক।"

কফির কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে সুচিত্রা বললো, "এখান থেকে চলে যাবার জন্যে রোজ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, অথচ ছ' মাস আগেও এ-দেশে আমার খু-উ-ব ভাল লাগতো।"

তাহলে গণ্ডগোলটা বিশেষ পুরনো নয়, সুচিত্রার কথা থেকেই আন্দাজ করলাম। মূল সমস্যার ভিতরে না ঢুকে, কিছুমাত্র জানবার আগ্রহ প্রকাশ না করেই বললাম, "দেশটা তো সোনার দেশ। মানিয়ে-গুছিয়ে নাও, আবার ভাল লাগবে। এখানকার পণ্ডিতদের কাছে শুনলাম, মানিয়ে-গুছিয়ে নিতে ইণ্ডিয়ানদের জুড়ি নেই।"

সুচিত্রার চোখ ছলছল করে উঠলো। "মানিয়ে-গুছিয়ে নেবার প্রশ্নই ওঠে না, শংকরদা। আমার যা-হয় হোক, কিন্তু কুমকুমের ভবিষ্যৎ এইভাবে নষ্ট হতে দেবো না।"

তাহলে আমি যা আশঙ্কা করেছি, তাই ঠিক। সুচিত্রা বললো,

তাহলে ব্যাপারটা শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে! অমিত এখানে নেই। আমি বললাম, "ওর সঙ্গে আমার দেখা হলে ভাল হতো।"

ফোঁস ফোঁস করে উঠলো স্মুচিত্রা, "খুবই ভাল হতো। হয়তো আপনার কথার কিছুটা মূল্য দিতো।"

মনে মনে বললাম, পার্সোনাল ব্যাপারে আজকাল কেউ কারুর কথার মূল্য দেয় না। স্মুচিত্রাকে বললাম, "অমিত যে চলে গেছে তা মাসীমাকে জানিয়েছো?"

গম্ভীর মুখে স্মুচিত্রা বললো, "জানাবো কী করে? এখনও তো দুদিন হয় নি।"

খুবই নাটকীয় সময়ে তাহলে এসে পড়েছি—আপন একজনকে কাছে পেয়ে স্মুচিত্রা একটু ভরসা পাবে। বললুম, "কিছু ভেবো না, স্মুচিত্রা। ওপরে ঈশ্বর আছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।" তারপর জিজ্ঞেস করলুম, "আমি যে আসছি তা অমিত খবর পেয়েছিল?"

আমার আশঙ্কা হলো ভায়রা-ভায়ের সঙ্গে দেখা করার ভয়েই অমিত পালিয়েছে। আমার আন্দাজই ঠিক। স্মুচিত্রা বললো, "আপনার চিঠিটা ও-ই তো নিয়ে এলো। বললো, ব্যাড লাক; শংকরদার সঙ্গে দেখা হলো না।"

স্মুচিত্রার বাড়িতে এসে গেলাম। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাড়ি বেশি দূরে নয়। ঘড়ির দিকে তাকালাম। এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরতে কত সময় লাগবে হিসেব করতে লাগলাম।

স্মুচিত্রা বললো, "বাড়িতে ঢুকেই ঘড়ি দেখবেন না, শংকরদা। আমি খোঁজখবর করে রেখেছি। আপনি দু-ঘণ্টা নির্ভয়ে থাকতে পারেন। তারপর ইয়েলো ক্যাবকে ফোন করে দেবো। আপনাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ি থেকে তুলে নেবে। এখানে এই স্মুবিধে। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গাড়ি না থাকলেও ওরা ওয়ারলেসের মাধ্যমে মেসেজ পাঠিয়ে দেয়। প্রত্যেক ট্যাক্সিতে বেতার যন্ত্র আছে, তারা খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে হাজির হবে। আপনি ঠিক সময়ে এয়ার-

অন্য সময় হলে সুচিত্রার সংসার আমি ঘুরে ঘুরে দেখতাম। কিন্তু এখন যা মনের অবস্থা তাতে সংসার দেখে লাভ কী? চুপচাপ বসে সময় কাটিয়ে বিদায় নেওয়াই ভাল।

সময় যখন অল্প তখন আসল সমস্যাগুলো আর না এড়িয়ে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। জিজ্ঞেস করলাম, "কুমকুম কোথায়?"

সুচিত্রা বললো, "ইস্কুলে। আপনার সঙ্গে দেখা হবে কিনা সন্দেহ। কারণ আজ আবার ইস্কুলে কি সব ফাংশন আছে।"

জেরা করতে সাহস হলো না। বেচারা কুমকুমকে সুচিত্রা হয়তো ইচ্ছে করেই সরিয়ে দিয়েছে, যাতে আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে। সুচিত্রা বললো, "আপনি আসবেন বলে পায়েস তৈরি করে রেখেছি, শংকরদা। পায়েস তো আপনার ফেভারিট।"

"সে ওয়ান্স-আপন-এ-টাইমের কথা, সুচিত্রা। এই বয়সে তোমার দিদির বকুনি ছাড়া কিছুই মুখে রোচে না।"

মনে একটু সুখ থাকলে সুচিত্রা যে অনেক কিছু রেঁধে রাখতো তার ইঙ্গিত পেলাম। এ সময়ে খাওয়ার তেমন কথাই ওঠে না। তবু ওদের ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসতে হলো। ফ্রিজ থেকে সুচিত্রা পায়েসের বাটি বার করে দিলো। পায়েসের মধ্যে চামচ চালিয়ে আমি এবার সমস্ত হল্‌ঘরটা দেখে নিলাম। ছবির মতন সাজানো সংসার। এমন সংসারের সুখী গৃহিণী সুচিত্রা। এই রকম একটা রিপোর্ট মাসীমাকে পাঠাতে পারলে কী সুখের হতো।

মিষ্টি খেতে খেতে তেতো আলোচনা ভাল লাগে না। কিন্তু সময় খুবই অল্প। সুতরাং আমাকে বলতেই হলো, "তোমাকে নিয়ে মাসীমার খুব চিন্তা।"

"চিন্তা আমারও, শংকরদা। শুধু চিন্তা নেই ওই ভদ্রলোকের, যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন আপনারা। এতো করে বলছি, তবু কানে নেয় না।"

"ব্যাপারটা কী, যদি একটু গুছিয়ে বলো।" আমি পায়েস আস্বাদ করতে করতে শ্যালিকাকে অনুরোধ জানাই।

এবার যা শুনলাম, তাতে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। গোলমালটা অমিতকে নিয়ে নয়। সে এখনও শ্যালিকার শাসনাধীনেই রয়েছে। সমস্যাটা কুমকুমকে নিয়ে। অমিত হঠাৎ কী এক সেমিনারে শিকাগো গেছে। আগামী কাল ফিরবে।

আনন্দে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। তাতে সুচিত্রা ভুল বুঝলো—"মেয়ে নিয়ে আমি বিপদে পড়েছি, আর আপনি হাসছেন!"

আমি বলে ফেললাম, "আমি ভেবেছিলাম, তোমার ঘাড়ে বাঘ পড়েছে। বাঘিনীও বলতে পারো।"

সুচিত্রা আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারলো কিনা জানি না। বললো, "বাঘিনী এক আছেন। আমাদের প্রতিবেশী। জনের মা। জন ছেলেটি কুমকুমের বয়সী। কুমকুম ওখানে যাতায়াত করে।"

আবার দুশ্চিন্তা হলো। যা-সব বাল্যপ্রণয়ের রিপোর্ট আজকাল কাগজে পড়ি। তবে হিসেব-টিসেব করে নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম, "সবে তো সাত বছর বয়স। এখন থেকে দুশ্চিন্তা করে লাভ কী সুচিত্রা?"

সুচিত্রা বললো, "ও যদি নিজের দেশে একটা চাকরি পেতো তাহলে আমি বেঁচে যেতাম, শংকরদা।"

বললুম, "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই, সুচিত্রা। অমিত শুনেছি মান্থলি দশ হাজার টাকার ওপরে মাইনে পাচ্ছে। ওই ধরনের চাকরি, যতদূর জানি স্বদেশে একটাই আছে—দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে।"

সুচিত্রা আমার ব্যঙ্গে কান দিলো না। বললো, "ডলারকে সাড়ে সাত দিয়ে গুণ করে কে চাকরি চাইছে, শংকরদা? একটা আট-নশো টাকার চাকরি পেলেই ওকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো আমি। টাকার চেয়ে একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ আমার কাছে অনেক দামী।"

বললাম, "হলো কী? এতো ভেঙে পড়ছো কেন সুচিত্রা?"

সুচিত্রার চোখে জল। "আমি কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াটাই একমাত্র উপায় মনে হচ্ছে।"

"আহা আহা! কেঁদো না। তুমি কাঁদলে মাসীমাকে সে-রিপোর্ট দিতে হবে। এবং মেয়ের চোখে জল পড়ছে শুনলে মাসীমা শয্যা নেবেন, ব্লাডপ্রেসার তালগাছে চড়ে বসবে।" আমি সুচিত্রাকে সাবধান করে দিই।

ঘরের এক কোণে কুমকুমের ছবি রয়েছে। হাসিখুশি বালিকার রঙীন ছবি। দেখে মোটেই দুষ্টু মনে হয় না। মায়ের চোখে জল ফেলাবার জন্যে সে যে দায়ী হতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না।

বললুম, "ইস্কুলে পড়াশোনা করছে তো? বাবা কতবড় স্কলার, তুমিও পড়াশোনায় খারাপ ছিলে না, স্কুল-ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলে, তোমাদের মেয়ের তো পড়ায় খারাপ হওয়া উচিত নয়।"

সুচিত্রা স্বীকার করলো মেয়ে পড়াশোনা মন্দ করছে না। স্কুলে যেতে কাঁদে না। যদিও তার আগের অধ্যায়ে বেশ চিন্তার কারণ হয়েছিল। সুচিত্রা মনে করিয়ে দিলো, "আপনি তো জানেন ওর কথা ফুটতে দেরি হয়েছিল। আমাদের কী যে ভয় হয়েছিল, বোবা হবে নাকি।"

বললুম, "শুনেছিলুম বটে মাসীমার কাছ থেকে। মাসীমা আবার নাক-কানের বড় ডাক্তার তড়িৎদার সঙ্গে দেখা করলেন। তড়িৎদা বললো, বিদেশে অনেক সময় ও-রকম হয়ে থাকে। বাবা-মায়ের কাছে বাংলা শুনছে, তারপর সেই বাবা মা'র মুখে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনর্গল ইংরিজী বলতে শুনছে, বাইরে খেলার পার্কে সমবয়সীদের মুখে শুধু ইংরিজী শুনছে, এতে বাচ্চারা ঘাবড়ে যায়। ওদের বুলি ফুটতে দেরি হবেই তো।"

সুচিত্রা বললো, "কুমকুমের ঠিক তাই হলো। দিনরাত টি-ভি দেখতো। শেষে কথা ফুটলো, কিন্তু প্রথমে ইংরিজী।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তারপর জনের মা এগনেসের সঙ্গে আলাপ হলো আমার। উনিও এখানে আসেন, আমিও ওঁদের বাড়িতে যাই। আমরা দুজনেই চাকরি করি না—তাই হাতে দুপরবেলায় অনেক সময় থাকে।"

"গিন্নীদের পাড়া-বেড়ানো তাহলে এখানেও আছে," আমি আনন্দ প্রকাশ করি।

"গৃহিণীসম্মেলন আছে—তবে কী দিয়ে ভাত খেলি জিজ্ঞেস করবার পালা নেই। আর নারীগণের পতিনিন্দা নেই, বরং পতি-প্রশস্তি আছে।"

"এটা তো খুবই ভরসার কথা," আমি পুনরায় আনন্দ প্রকাশ করি।

সুচিত্রা বললো, "পতিনিন্দার স্টেজেই এখানকার কেউ পৌঁছয় না। 'হনি-হনি' 'ডার্লিং-ডার্লিং' করতে করতেই একদিন তালাক দিয়ে বসে। এই একটা বিশ্রী অভ্যাস এখানকার। কথায় কথায় ডাইভোর্স।"

আমি বললাম, "স্বামীকে বা বউকে চিরকাল ভালবাসুক না বাসুক—সন্তানদের প্রতি ভালবাসা আছে তো? মায়েরা তো দেশেই এক শুনেছি—কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কভু না হয়।"

সুচিত্রা বললো, "ছেলেপুলেকে ভীষণ ভালবাসে এগনেস—কিন্তু ভালবাসার রকম-সকমই অন্যরকম। ছেলে যে কী শিক্ষা দেয়, ভগবান জানেন।"

পায়েসের বাটি শেষ করে আমি সুচিত্রার মুখের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি।

সুচিত্রা বললো, "ওইসব থেকেই তো আমার বাড়িতে গোলমাল শুরু হলো। কুমকুম তখন আরও একটু ছোট। আমাকে একদিন বললে, মা জন আমাদের বাড়িতে এলে আমার কোনো খেলনায় হাত দিতে দেবো না।"

আমি কুমকুমকে বকুনি দিলাম। "ছিঃ, জনকে খেলনা না দিলে, আমি ওর মায়ের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না। জনের মা ভাববেন, আমি তোমাকে কুশিক্ষা দিচ্ছি।"

কুমকুম সেদিন কিছু বললো না। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জনকে তার খেলনাগুলো দিলো এবং জন সেদিন দু-একটা খেলনা ভেঙেচুরে

বিদায় নিলো। আমি কুমকুমকে বোঝালাম, ভেঙেছে তো কী হয়েছে? জন তোমার ভাই হয়। আমি তোমাকে আবার খেলনা কিনে দেবো।

কুমকুম তখনকার মতো শান্ত হয়ে গেলো। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। একটু আগেই জনের বাড়িতে গিয়েছিল সে। চোখ মুছতে মুছতে এবং সেই সঙ্গে বেশ রাগের সঙ্গে কুমকুম বললো, "তুমি শুধু আমাকে বকো। বলো, জনকে খেলনা দাও। আর জনের বাড়িতে গেলাম, ও আমাকে একটা খেলনাতে হাত দিতে দিলো না। ভয় দেখালো, খেলনায় হাত দিলে আমার মাথা ভেঙে দেবে।"

"তুমি কী করলে?" আমি কুমকুমকে জিজ্ঞেস করলাম।

কুমকুম যা বললে, তাতে আমি বেশ লজ্জায় পড়ে গেলাম। কুমকুম বললো, "আমি জনের মাকে বললাম, জন আমাকে খেলনায় হাত দিতে দিচ্ছে না। আন্টি শুনলো, কিন্তু জনকে কিছু বললো না।"

সুচিত্রা থামলো। আমি এই পর্যন্ত শুনে বললাম, "ভদ্রমহিলা বেশ স্বার্থপর।"

সুচিত্রা একমত হলো না। "তাই বা কী করে বলি? খুব জেনারাস—কুমকুমকে জামা কিনে দিয়েছেন, পুতুল কিনে দেন।"

"তাহলে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

সুচিত্রা বললো, "কুমকুমের কথা শুনে আমি তো ভেবে ভেবে যাই আর কি! কুমকুমের বাবা পরামর্শ দিলেন, মনের মধ্যে ভাবনা পুরে না রেখে, জনের মা'র সঙ্গে কথা বলো। আমি দোনোমনো করছিলাম। কিন্তু যা অবস্থা দেখলাম, এ বিষয়ে একটা সমাধান না হলে কুমকুম একদিন হয়তো ওদের সামনেই সীন ক্রীয়েট করে বসবে। হয়তো স্রেফ বলে দেবে, জনকে কোনো খেলনা দেবো না। অগত্যা একদিন এগনেসের কাছে গেলুম। তাকে খোলাখুলি সব বললুম। উপদেশ চাইলাম।

এগনেস মোটেই বিরক্ত হলো না। লেখাপড়া জানা মহিলা—কিছুদিন কলেজে পড়েছে। এগনেস বললো, "তোমরা অন্য কালচার থেকে এসেছো—এখানকার কালচার, এখনও বুঝতে পারো নি।

আমার মনে হয় তুমি মেয়ের অপকার করছো।"

আমি রেগে গেলুম। বললুম, "মেয়েকে এই বয়স থেকে স্বার্থপরতা শেখাবো?"

এগনেস বললে, "চিত্রা, ব্যাপারটা তুমি বুঝছো না। জনের ওপর আমার নিজের ইচ্ছেটা কেন জোর করে চাপিয়ে দেবো? জনের যদি ইচ্ছে হয় এবং সে যদি চায় কুমকুমের সঙ্গে সে নিজের খেলনা শেয়ার করবে, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তার ইচ্ছে না হলে আমি কেন জোর করবো?"

আমি খোলাখুলি বললাম, "আমার মেয়ে যাতে স্বার্থপর না হয় তার জন্যে এখন থেকেই আমাকে চেষ্টা করতে হবে। আমার মা শুনলে দুঃখ পাবেন।"

এগনেস বললো, "তুমি ওকে উদারতার শিক্ষা দিচ্ছ না, ওকে হিপক্রিট হতে বাধ্য করছো। মনের ইচ্ছে এক রকম এবং মুখে আরেক রকম হবার কপট ট্রেনিং আমি জনকে দেবো না। তাহলে ওর মন নোংরা হয়ে যাবে।"

শ্যালিকাকে প্রশ্ন করলাম, "তুমি কী সিদ্ধান্তে এলে?"

সুচিত্রা উত্তর দিলো, "আমি নিজের পথেই চলবো। এগনেস যা-ই বলুক, সবার সঙ্গে মিলেমিশে মানিয়ে-গুছিয়ে থাকবার শিক্ষা তো মেয়েকে দিতেই হবে।'

সেই মতোই চালিয়ে যাচ্ছিল সুচিত্রা। নিজের সমস্ত স্নেহমমতা ও পরিশ্রম দিয়ে নিজের দেশের আদর্শযোগ্য করেই কুমকুমকে সে মানুষ করে যাচ্ছিল। কিন্তু আবার গণ্ডগোল বাধলো।

সুচিত্রা বললে, "শংকরদা, আপনি তো ছোটবেলা থেকে আমাকে দেখছেন। সেই ছোটবেলা থেকেই মাকে আমি কী ভীষণ ভালবাসতাম। মা'র কথার অবাধ্য হয়েছি কখনও? মায়ের দুঃখ আমাদের দেশের মেয়েরা ছোট বয়স থেকেই বোঝে। মায়ের কত ফাইফরমাশ খাটতাম।" আবার সুচিত্রার চোখ ছলছল করে উঠলো। আঁচল দিয়ে একবার চোখ মুছে ফেললো।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, "আমার কাছে লজ্জা কী? বলে ফেলো, সুচিত্রা।"

সুচিত্রা বললো, "জানেন তো এখানকার অবস্থা—পয়সা ফেললেও ঝি-চাকর পাওয়া যায় না। এই সংসারে হাজার রকম কাজ আমাকে একা করতে হয়।"

"সে-সব তো শুনেছি তোমার মায়ের কাছে। তোমার দিদিকে বলেওছি, সুচিত্রা এখন শুধু রাঁধে না—বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, বাথরুম পরিষ্কার করে, মায় অমিতের ঘাড়ের চুল ছেঁটে দেয়। এক কথায় রাঁধুনি কাম তোলা ঝি কাম মেয়ের আয়া কাম মেথরানী কাম ধোপানী কাম নাপতেনী কাম শয্যাসঙ্গিনী কাম গার্লফ্রেণ্ড কাম সেক্রেটারি কাম নার্স।"

"তোমার দিদি অবশ্য দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, যদি ভেবে থাকো, আমিও সে রকম হচ্ছি তাহলে খুব ভুল করেছো। আমিও রেগেমেগে শুনিয়ে দিলুম, তোমার মাসতুতো বোন যদি অমন হতে পারে, তাহলে তুমি পারবে না কেন? তোমার দিদি ঠোঁট উল্টে বললেন, আমার মাসতুতো বোনের বর যত টাকা মাইনে পায় তার দশভাগের এক ভাগ তুমি আগে রোজগার করো!"

সুচিত্রা বললো, "দিদিকে বকুনি দিয়ে চিঠি লিখতে হবে তো। বরকে কোথায় অনুপ্রেরণা দেবে, তা নয় আত্মসম্মানে আঘাত দিচ্ছে!"

"যদি পারো, একটু লিখো," আমি কাতর অনুরোধ জানাই শ্যালিকাকে। "কলকাতায় বেশীর ভাগ লেখকদের স্ত্রীদের ধারণা সাহিত্যিকদের কোনো আত্মসম্মানবোধ নেই। অমন-যে-অমন দোর্দণ্ড লেখক অমুক বাবু, যাঁর লেখা পড়তে তুমি খুব ভালবাসতে, যাঁর একটা কলমের খোঁচায় সমাজবিপ্লব হয়ে যেতে পারে, তাঁর ওয়াইফ বাড়িতে ওঁকে মিনসে বলে চিৎকার করে ডাকেন।"

এতো দুঃখের মধ্যেও সুচিত্রা ফিক করে হেসে ফেললো। আমি বললাম, "নিজের দুঃখের কথা থাক। তোমার কথা শোনাও।"

সুচিত্রা বললো, "এদেশে সংসার [illegible]

তাহলে আপনি তো জানেন। একে লোকজন নেই, তার ওপর ঘরদোর ঝকঝকে তকতকে রেখে দিতে হবে—কোনো মার্কিনী বন্ধু এসে পড়লে যাতে ডার্টি বলে বদনাম না হয়।”

একটু থেমে সুচিত্রা বললো, “ঘরদোর পরিষ্কার করতে করতে কোমর ব্যথা হয়ে যায় শংকরদা। একদিন শরীরটা খুব খারাপ, সর্দিজ্বরের মতো লাগছে। কুমকুম স্কুল থেকে ফিরে এলো। ওকে খেতে দিলুম, তারপর বললুম, লিভিং রুমের দরজা-জানালা আর ফার্নিচারগুলো একটু মুছে দিবি, লক্ষ্মীসোনা?”

আবার থামলো সুচিত্রা। তারপর বললো, “যে-মেয়ের জন্য এতো করি, সে আমাকে যা উত্তর দিলো তা শুনে আমার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো।”

আমি বললুম, “ডাক্তার দেখাও শ্যালিকা। বড় সামান্য ব্যাপারে মাথা ঘুরছে। পারবো না—এ-কথাটা ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে লেগেই থাকে। তুমি এই প্রথম মা হয়েছো, তাই জানো না।”

সুচিত্রার দুঃখ কমলো না। বললো, “পারবো না বললে, আমার দুঃখ থাকতো না। বুঝতাম, ছেলেমানুষী করছে। কিন্তু ও যা বললো তা মুখে আনা যায় না। কুমকুম ঘর দুটো খুঁটিয়ে দেখলো, তারপর বললো, করতে পারি। কিন্তু কত টাকা দেবে?’

কুমকুমের উত্তর শুনে তার মায়ের ফেণ্ট হবার অবস্থা। মেয়ে বলে কী! ঘরের কাজ করে দেবার জন্যে পয়সা চাইছে।

সুচিত্রা বললো, “আমি বকুনি লাগালাম, ছিঃ কুমকুম, বাবা-মায়ের কাজ করে পয়সা চাইতে নেই।”

সুচিত্রা বলে চললো, “কিন্তু কুমকুম অটল। জিজ্ঞেস করলো, কেন আমাকে ঠকাতে চাও? সেদিন যে-লোকটা এসে তোমাদের জলের পাইপ সারালো তাকে পয়সা দিলে আর আমাকে দেবে না কেন?”

“শুনুন মেয়ের কথা। ‘আমাদের’ জলের পাইপ বললো না, বললে ‘তোমাদের’। আমি তবু বিরক্তি না দেখিয়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। যিনি কল সারিয়ে গেলেন উনি বাইরের লোক। আর তুমি

হচ্ছো আমাদের আপনজন। আপনজনের কাছে পয়সা চাইতে নেই।"

"কুমকুমের মাথায় আমার কথাগুলো ঢুকলো না। সোজা বললো, ওসব জানি না, পয়সা না দিলে কাজ হবে না।"

"চোখে জল এসে গেলো। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কুমকুম আবার বললো, তুমি মা হতে পারো, কিন্তু কাজ করিয়ে পয়সা দেবে না কেন?"

"বুঝুন একবার! আমার ভীষণ অভিমান হলো। আমি বললাম, পয়সা দিয়ে কাজ আমি মরে গেলেও করাতে পারবো না। তোমাকে কাজ করতে হবে না, আমি নিজেই সব করে নেবো।"

সুচিত্রা ভেবেছিল, এবার ফল হবে। কুমকুম এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে এগিয়ে আসবে। কিন্তু কুমকুম দাঁড়িয়ে রইলো, কোনো উত্তর দিলো না।

সুচিত্রা বললো, "ভীষণ দুঃখ হলো আমার। আমরাও তো মেয়ে ছিলাম। এমন নিষ্ঠুর তো কখনও হতে পারি নি। তারপর ভাবলাম, রাগ করে লাভ নেই—মেয়েকে বোঝাতে হবে। ওকে ডেকে খুব আদর করলাম। বললাম, কুমকুম, তোমাকে আমি আর বাপি কত ভালবাসি। তোমার সেবার অসুখ করলো, আমাদের কত দুঃখ হলো, তোমার স্কুল থেকে আসতে দেরি হলে আমি ছটফট করি। তবু আমার কাজ করতে হলে তুমি পয়সা চাইবে?"

কুমকুম গম্ভীর হয়ে ভাবলো একটু। তারপর বললো, "তুমি বলতে চাও, জনের মা জনকে ভালবাসে না? জন তো পয়সা ছাড়া বাড়ির কোনো কাজ করে না; কত পয়সা দেবে সে নিয়ে রীতিমতো দরদস্তুর হয়।"

সুচিত্রার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল, সোজা বললো, "তোমাকে আমার কথা মতো চলতে হবে। এ বাড়িতে কী নিয়ম চালু থাকবে, তা আমি ঠিক করবো। চোখের সামনে থেকে মেয়েকে দূর করে সরিয়ে দিলুম। ওর বাবা তখন ছিল না এখানে। দু'দিন পরে ফিরতেই ব্যাপারটা বললুম। প্যান্ট-কোট-টাই পরে বড় বড় গাড়িতে ঘুরে বেড়ালেই সভ্য হওয়া যায় না। যে-দেশে ছোট ছেলেমেয়েও পয়সা

ছাড়া বাপ-মায়ের কাজ করে না, তাকে সভ্য দেশ বলে না।"

সুচিত্রা যে রেগেছে তা বুঝলেন কুমকুমের বাবা। বললেন, "রাগ কোরো না, শরীর খারাপ হবে। আমি বরং কুমকুমের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখি।" সুচিত্রা বললো, "আমাদের যুগে কথাবার্তা নয়, থাপ্পড়ই ছিল এর ওষুধ। কিন্তু যে-দেশে বাস করছি, সে-দেশে থাপ্পড় মারলে মেয়ে হয়তো থানায় রিপোর্ট করবে।"

সুচিত্রা বললো, "আমার সামনেই কুমকুমের সঙ্গে ও কথাবার্তা বললো। বুঝলুম, মেয়ের কাঁচা পয়সার লোভ হয়েছে—ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সাকড়ি দেখে। সেই পয়সায় তারা ইচ্ছে-মতো জিনিসপত্তর কেনে। আমি বললুম, আমাদের সময়ে তো ভাল ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সা থাকতো না। যখন যা দরকার হতো বা কেনবার ইচ্ছে হতো মাকে বললেই আনিয়ে দিতেন। বুঝতে পারছি, এখন আর ও নিয়ম চলবে না।"

সুচিত্রা আবার একদিন কুমকুমকে ধরলো। বললো, "তোমার পয়সার দরকার হলে চেয়ে নেবে। এই নাও এক ডলার : যা ইচ্ছে কিনবে।"

খুব খুশি হলো কুমকুম। পয়সাটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিলো। সুচিত্রা তখন বললো, "দেখো কুমকুম, এই যে তোমাকে পয়সা দিলুম এর সঙ্গে কাজকর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। দরকার হলে তুমি পয়সা চাইবে—কিন্তু কখনও কাজ করতে বললে, পয়সার কথা তুলবে না। এতে বাপির আর আমার অপমান হয়, মনে কষ্ট হয়।"

এই পর্যন্ত বলে সুচিত্রা থামলো। আমি ওকে অভিনন্দন জানালাম, "জটিল সমস্যার বেশ তো সহজ সমাধান করলে।"

"সমস্যার সমাধান হলো কই?" সুচিত্রা দুঃখের সঙ্গে জানালো। "মেয়ে এসে বলে, এটা কিনবো ওটা কিনবো। আমি পয়সা দিয়ে দিই। তারপর হঠাৎ জনের মা টেলিফোন করলেন, এখনই একবার আসতে চান। এখানে এই নিয়ম। পাশের বাড়ির লোক হলেও হঠাৎ বেল টিপবে না। ফোন করে, অনুমতি নিয়ে তবে বাড়িতে আসবে।"

জনের মা এসে সুচিত্রাকে বেড রুমে নিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ

করে বললেন, "চিত্রা, আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। কুমকুমের ভবিষ্যৎটা তুমি নষ্ট করছো কেন? কুমকুম তোমাদের মেয়ে, তাকে নষ্ট করার এভরি রাইট তোমাদের আছে। কিন্তু এর ফলে আমার জন-এরও নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে।"

ভদ্রমহিলার কথা শুনে সুচিত্রা তো তাজ্জব।—"আপনি কী বলছেন?"

এগনেসের কাছে জানা গেলো, জন গতকাল মায়ের কাছে দু'ডলার চেয়েছে। জন-এর মা সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বললেন, "তোমার লজ্জা করে না জন? কাজ না করে পয়সা চাইছো?" জন তাতে বেশ রেগে ওঠে। কুমকুমের কথা তুলে বলে, পয়সার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক কী? কুমকুমের মা তো ওকে বলে দিয়েছে, দরকার হলেই পয়সা চাইবে।

এগনেস গম্ভীরভাবে বললেন, "চিত্রা, প্লিজ ডোন্ট মাইণ্ড। কিন্তু তুমি নিজের সন্তানের আত্মসম্মান নষ্ট করছো। তাকে ভিখিরী হতে উৎসাহ দিচ্ছো। আমি তো জনকে একশো ডলার দিতে পারি। কিন্তু কেন দেবো?"

সুচিত্রা বললো, "শংকরদা বুঝুন ব্যাপারটা। আমার মেয়েকে দুটো পয়সা দিলে সেটা ভিক্ষা দেওয়া হলো! আমি কিন্তু ছাড়ছি না। এখান থেকে আট মাইল দূরে আর এক বাঙালী থাকেন। মিস্টার এণ্ড মিসেস্ কর। ওঁদের ছেলের বয়সও আট-নয় বছর। ওঁদের একই সমস্যা—ছেলেকে কাজ করতে বললে পয়সা চাইছে। ওঁরা একটু নরম প্রকৃতির মানুষ। বলছিলেন, যস্মিন দেশে যদাচার। ভাবছেন ছেলেকে মজুরি দিয়েই কাজ করাবেন। আমার কর্তাও ওঁদের দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছিলেন। আমি কিন্তু খাপ্পা হয়ে উঠেছি। বলেছি, কিছুতেই না। বিদেশে আছি বলে সন্তানকে অমানুষ করতে পারবো না। বাবা-মায়ের কাছে পয়সা নিয়ে কাজ করবে, এ হতে দেবো না।"

সুচিত্রার সমস্যা শুনে আমিও গম্ভীর হলাম। বললাম, "ব্যাপারটা কঠিন বটে।"

সুচিত্রা বললো, "জিনিসটা আমার কাছে মোটেই ছোট নয়। মেয়ের সঙ্গে বাপ-মায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কটা এর ওপরেই নির্ভর করছে। দরকার হলে আমি কুমকুমকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো। আমিও না হয় কয়েক বছর দেশে গিয়ে থাকবো। ও তো নিজের দেশে চাকরি পাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, মেয়েকে আমি বাড়ির কাজের জন্যে পয়সা দেবো না। মেয়ে এখনও নিজের গোঁ নিয়ে বসে আছে—আমিও ওকে কিছু করতে বলি না।"

ভাবলাম, সুচিত্রাকে বলি, মানিয়ে-গুছিয়ে চলো। কিন্তু এক্ষেত্রে কী উপায় ? ছোট্ট এই ঘটনার মধ্যে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুখোমুখি সজ্ঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পনেরো মিনিট ধরে অনেক মাথা ঘামালাম। কোনো সমাধান খুঁজে পেলাম না। এগনেস যা বলেছেন, তার মধ্যে যুক্তি আছে। ওঁরা শিশু বয়স থেকে সন্তানদের আত্মনির্ভর করে তুলতে চাইছেন। ওঁরা ভাবছেন ইণ্ডিয়ানরা সন্তানদের পরনির্ভর করে রাখেন, বড় বয়সেও তারা খোকা হয়ে থাকে, জাতটা ভিখিরীর জাতে পরিণত হয়। আর সুচিত্রা ভাবছে, সংসারের গোড়ার কথা। বাবা-মা এবং সন্তানদের ভালবাসার মধ্যে পবিত্রতা থাকবে। সে-সম্পর্ককে পয়সা কেন কলুষিত করবে ?

দুই সভ্যতার এই সজ্ঘর্ষ সুচিত্রার সংসারে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এটা এড়িয়ে যেতে পারলেই ভাল। কিন্তু কোনো পথ তো খুঁজে পাচ্ছি না।

সুচিত্রা বললো, "আমি অনেক ভেবেছি শংকরদা। ওঁর সঙ্গে তো রাতের পর রাত ধরে আলোচনা করেছি। মিস্টার এণ্ড মিসেস্ করও ভেবেছেন। কিন্তু মানিয়ে-গুছিয়ে চলার পথ তো খুঁজে পেলাম না।"

বললাম, "আমি উঠি সুচিত্রা। প্লেনে বসেই মাসীমাকে বিস্তারিত লিখে দেবো। ওঁরা সে-যুগের মানুষ, সমাজতত্ত্বও পড়েন নি। তবু তো মা, জেনে রাখুন।"

প্লেনে বসেই সুনয়নাদেবীকে আমি সব লিখেছিলাম। বলেছিলাম, "আমি কোনো আশা দেখছি না। তবে সুচিত্রাকে আপনি ভাবতে

বারণ করে দেবেন। না-হলে ওর শরীর খারাপ করবে।"

রচেস্টার থেকে বেরিয়ে নানা পথ ঘুরে সপ্তাহ দুয়েক পরে আমি ডেনভারে হাজির হয়েছিলাম। ওখানে হোটেল থেকে সুচিত্রাকে দূরপাল্লার ফোন করলাম। ভাবলাম, জেনে নিই ও আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরবে কিনা।

ওপার থেকে সুচিত্রার স্বর পরিষ্কার শুনতে পেলাম। "শংকরদা, কবে আসছেন?" সুচিত্রাকে বেশ খুশি-খুশি মনে হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "অমিত, কুমকুম ওরা কেমন আছে।" সুচিত্রা হৈ হৈ করে বললো, "খু-উ-ব ভাল। শংকরদা, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। পরশু মা'র চিঠি পেয়েছি। মাকে সব লিখে দিয়ে আপনি যা উপকার করেছেন। এখন ভাবছি, মাকে আগে লিখি নি কেন? ওঁরা তো সেকালের জয়েন্ট ফ্যামিলির মেয়ে, মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে ওঁদের তুলনা নেই।"

"সমাধানটা কী?" আমার জানবার প্রবল আগ্রহ হলো।

সুচিত্রা টেলিফোনের ওধার থেকে বললো, "মা লিখেছেন, সামান্য ব্যাপারে অত ভাববার কী আছে? কুমকুম এখনকার মতো মিস্টার করের বাড়িতে কাজ করুক, আর মিস্টার করের ছেলে সঞ্জয় তোর বাড়িতে কাজ করে টাকা রোজগার করুক। তাহলে ওদেরও কেউ ভিখিরী বলবে না, তোদেরও মনে কষ্ট হবে না। জানেন শংকরদা, মিস্টার কর তো হাতে চাঁদ পেয়েছেন। আমার কর্তা একটু আগেই কুমকুমকে মিস্টার করের বাড়িতে কাজ করবার জন্যে নিয়ে গেছেন। মিস্টার করের ছেলে কাল আমাদের ঘরদোর পরিষ্কার করতে আসবে।"

আমি স্তম্ভিত। সুচিত্রা বললো, "রাগ করে কী লাভ? আমাদের মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে হবে। তাই না?"

আমার উত্তরের আগেই ডেনভার-রচেস্টার দূরপাল্লার টেলিফোন

রচেস্টার থেকে ডেনভারের পথে যে ক'টি বড় বড় জায়গায় যাত্রাভঙ্গ করেছিলাম তার মধ্যে বোস্টন অন্যতম। আমেরিকান সংস্কৃতির মহত্তর দিক সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহী, বোস্টন তাঁদের কাছে তীর্থস্থানের মতো। বোস্টনের অদূরেই দুই পৃথিবীপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, সংক্ষেপে এম-আই-টি।

বোস্টনের বিমানবন্দরে নেমেই প্রথমে কিন্তু আমার বন্ধু প্রিয়ব্রতর কথা মনে পড়ে গেলো। প্রিয়ব্রত বার বার বলেছিল, "যখন বোস্টনে যাচ্ছিস তখন মিস্ ডরোথি গ্রাহামের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করিস।"

বিমানবন্দর থেকে হোটেলে পৌঁছে ডাইরি খুললাম. মিস্ গ্রাহামের ঠিকানা প্রিয়ব্রত গোটাগোটা করে লিখে দিয়েছে

বিদেশে যাবার ঠিক আগেই আমি প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ওর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া। "বিদেশে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে, তাহলে ব্রাদার মনে-টনে রাখিস—যদি কখনও মনঃকষ্ট দিয়ে থাকি তবে ক্ষমা করিস।" বন্ধুকে এই ধরনের কিছু একটা বলবো ভেবে গিয়েছিলাম।

কিন্তু প্রিয়ব্রত চ্যাটার্জি মনমরা হয়ে বাড়িতে বসে আছে। আমাকে দেখেই প্রিয়ব্রতগৃহিণী মনে ভরসা পেলেন, মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, "খুব ভাল হলো। ওকে দেখুন তো, কী হয়েছে ওর।"

ঘরে ঢুকে দেখলাম প্রিয়ব্রত চুপচাপ বসে চিন্তা করছে। সামনের কাপে চা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে রয়েছে। ছাইদানির ওপর একটা সিগারেট জ্বলে যাচ্ছে। অন্য সময়ে আমাকে দেখলেই প্রিয়ব্রতর মুখে হাসি

হয়। আজ কিন্তু তেমন কোনো উৎসাহ দেখলাম না প্রিয়ব্রতর মধ্যে। গভীর কোনো সমস্যার মধ্যে ডুবে রয়েছে সে।

জিজ্ঞেস করলুম, "কী হলো ? বাংলা পাঁচের মতো মুখ করে বসে আছিস কেন ?"

প্রিয়ব্রত বললো, "বোস। একটা কোশ্চেনের উত্তর দিতে পারিস ?"

"একটা কেন, দশটা কোশ্চেনের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু তার আগে, তোর এই অবস্থা কেন বল ? বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস ? কতবার বলেছি, তোর মেয়ে বড় হচ্ছে, এখন আর ওয়াইফের সঙ্গে মনোমালিন্য নিরাপদ নয়।"

প্রিয়ব্রত সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালো। বউ সম্বন্ধে সে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। প্রিয়ব্রতর মনোরাজ্য জুড়ে এই মুহূর্তে একটি মাত্র মহিলা বিরাজ করছেন—তাঁর নাম মিস্ ডরোথি গ্রাহাম।

ভীষণ বকুনি দিতে যাচ্ছিলাম প্রিয়ব্রতকে। গল্প-উপন্যাসের নায়করা এবং চলচ্চিত্রের তারকারা যা-ই করুক, সংসারে নায়কদের রোমান্টিক কোনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়াটা মোটেই নিরাপদ মনে করি না। বললাম, "প্রিয়ব্রত, তোকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোর মেয়ের বয়স আটবছর হ'ত চলেছে।"

প্রিয়ব্রত বললো, "তুই যা ভয় পাচ্ছিস তা নয়, যদিও 'এ সপ্তাহ কেমন যাবে'তে ভৃগু লিখেছেন অপরিচিতা অবিবাহিতা রমণী কর্তৃক মানসিক অশান্তি সৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা।"

"ব্যাপারটা তা হলে কী ?" আমি জানতে চাই।

"তার আগে তুই আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দে।"

"বল।"

"ঈশ্বর কাদের জন্যে আমেরিকা সৃষ্টি করেছিলেন ?" প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করলো।

বললুম, "এমন-কিছু শক্ত কোশ্চেন নয়। সোজা উত্তর, আমেরিকানদের জন্যে।"

"বেশ!" প্রিয়ব্রত খুশি হলো। ছাইদানি থেকে আধপোড়া সিগারেট তুলে একটা টান দিয়ে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করলো, "চায়না এবং রাশিয়া বাদ দিয়ে রেস্ট অফ দি ওয়ার্লড ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছিলেন?"

"তুই ভীষণ গোলমেলে সব প্রশ্ন করছিস। কোশ্চেনটা ভগবানকেই করা উচিত তোর," আমি প্রস্তাব করি।

"কোশ্চেনটার উত্তর আমি পেয়ে গেছি, ব্রাদার। তোর কাছে শুধু মিলিয়ে নিতে চাই," প্রিয়ব্রত ঘোষণা করলো।

"তাহলে শুধু শুধু কেন দগ্ধাচ্ছিস? উত্তরটা তুই দে," আমি আবেদন জানাই।

"বাকি পৃথিবীটা তৈরি হয়েছে ফরেন-ট্যুরিস্টদের জন্যে," প্রিয়ব্রত বললো।

আমি মুখিয়ে উঠতে চাইছি, প্রিয়ব্রত আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, "তুই দেখ। কলকাতার রাস্তাঘাট আমরা পরিষ্কার রাখার জন্যে কী যুক্তি দেখাচ্ছি? না, ফরেন-ট্যুরিস্টরা নোংরা পছন্দ করে না। কাগজে লিখছে, ভিখিরিদের কলকাতার কয়েকটা জায়গা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া দরকার, কারণ ভিখিরিরা ফরেন-ট্যুরিস্টদের বিরক্ত করে। বস্তিউন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কোয়ার্টার তৈরি থেকেও অগ্রাধিকার দিয়ে এদেশে আমরা ইন্দ্রপুরীর মতো হোটেল তৈরি করছি, কারণ ফরেন-ট্যুরিস্টরা এসব পছন্দ করে। পার্কে ফুলগাছ বসানো থেকে আরম্ভ করে মদ খাবার, নাচবার, সাঁতার কাটবার সব ব্যবস্থা আমরা করছি ফরেন-ট্যুরিস্টদের নামে।"

আমি তর্ক করি, "দেখিস নি প্রাইম মিনিস্টার জনসাধারণের কাছে আবেদন করেছেন, ট্যুরিস্টরা হলো আমাদের সম্মানিত অতিথি। অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করাটা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির একটা অঙ্গ।"

প্রিয়ব্রত কান না দিয়ে বললো, "মায় কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে আমরা যে চিন্তিত তার কারণ ফরেন-ট্যুরিস্টরা

কলকাতা এড়িয়ে যাচ্ছে। যেন, ফরেন-ট্যুরিস্টরা যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করতো তা হলে এ বিষয়ে আমাদের আপত্তি ছিল না।"

"প্রিয়ব্রত তোর হলো কী?" আমি জিজ্ঞেস করি। "মড়া কলকাতার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দিস না। আফটার অল, আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ম্যাপ থেকে কলকাতা উঠে যেতে বসেছে। একের পর এক বিমান-কোম্পানি কলকাতা থেকে পাততাড়ি গুটোচ্ছে।"

প্রিয়ব্রত বললো, "কালকেই একজন রাজনৈতিক নেতাকে ইণ্টারভিউ করছিলাম। উনি বললেন, ওরা একদিন পিকিং ছেড়েও পালিয়ে ছিল। দুটো পয়সার লোভে ওরা জাহান্নমে যেতেও রাজী আছে। দেখছেন না, এখন আবার পিকিং-এ আপিস খোলবার জন্যে কত ছটফটানি!"

"এটা নিশ্চয় তোর নিজস্ব মত নয়," আমি প্রিয়ব্রতকে জিজ্ঞেস করি।

প্রিয়ব্রত বললো, "আমার চাকরিই হলো লোকের কাছে মতামত সংগ্রহ করা, তুই তো জানিস। তারপর সেইসব মতামত যোগবিয়োগ করে একটা ছবি আঁকবার চেষ্টা করি আমি। আমার নিজস্ব মতামতের কোনো দাম নেই।"

বিলেত থেকে গ্যালপ পোলের এই দুরূহ কাজটা শিখে এসে প্রিয়ব্রত বিখ্যাত এক বিজ্ঞাপন এজেনসির সঙ্গে যুক্ত আছে। বিভিন্ন কোম্পানি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সে জনমত সংগ্রহ করে বেড়ায়, তারপর সেইসব মতামত বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট দেয়। অমুক সিগারেট থেকে অমুক সিগারেট আপনি কেন ভাল বাসেন? তাজা বলে? স্বাদ চমকৃত বলে? না, প্যাকেট চকচকে বলে? অনেক সময় চাঞ্চল্যকর সব তথ্য বেরিয়ে যায়। কোম্পানির বড়-কর্তাদের ধারণা ছিল, অমুক সিগারেটের তামাক কড়া বলেই জনপ্রিয়। জনমত বিশ্লেষণে কিন্তু দেখা গেলো অমুক সিগারেটের

বিজ্ঞাপনে যে-মেয়েটির ছবি ছাপা হয় তাকে খুব মনে ধরেছে বলেই লোকে সিগারেট কিনছে।

সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকেও কিছু কিছু কাজ করছে প্রিয়ব্রত। যেমন ট্যুরিস্টদের সম্পর্কে একটা সমীক্ষা চালাচ্ছে। প্রায়ই তাকে এয়ারপোর্টে এবং বিভিন্ন হোটেলে যেতে হয়; জেনে নিতে হয়, এতো দেশ থাকতে তাঁরা কেন ইণ্ডিয়াতে বেড়াতে এলেন? ইণ্ডিয়ার মধ্যে কলকাতাকে তাঁরা প্রথম পছন্দ করলেন কেন? কী কী সুখ তাঁরা ইণ্ডিয়াতে প্রত্যাশা করেন? যেসব ট্যুরিস্ট প্লেনে ভারত ছাড়ছেন তাঁদেরও নানা প্রশ্ন করে প্রিয়ব্রত এবং তার সহকারীরা। এই কাজের জন্যে কয়েকটি শিক্ষিতা সুন্দরী মহিলাকে পার্টটাইম কাজ দিয়েছে প্রিয়ব্রত।

এইসব স্মার্ট মহিলারা যেসব প্রশ্ন করেন তা অনেক মাথা ঘামিয়ে তৈরি করা হয়েছে। পর্যটকদের উত্তরগুলো প্রয়োজন হলে কমপিউটরে ঢুকিয়ে নানা সমস্যা সমাধানে কাজে লাগানো হবে। এইসব প্রশ্নের মধ্যে আছে—ইণ্ডিয়াতে সব চেয়ে আপনার কী ভাল লেগেছে? কোন কোন জায়গা এবং কোন অভিজ্ঞতা আপনার খারাপ লেগেছে? আর কী কী সুখ পেলে আপনি এদেশে আরও বেশীদিন থাকতেন? আপনি কি নিজের দেশে ফিরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের ইণ্ডিয়া ভ্রমণে উৎসাহ দেবেন?

এই সব খোঁজখবর করতে গিয়েই প্রিয়ব্রত বোধ হয় কুমারী ডরোথি গ্রাহামের পাল্লায় পড়েছে আমি সন্দেহ করলাম। এ বিষয়ে আরও জানবার জন্যে তার ওপর চাপ দিলাম। বললাম, "যার জন্যে তুই মুখ শুকনো করে বসে আছিস সেই মিস্ গ্রাহামের কথা তা বেশ এড়িয়ে যাচ্ছিস।"

"নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে পড়েছি," করুণ স্বীকারোক্তি করলো, প্রিয়ব্রত। "ট্রাভেল এজেন্টদের বলেছিলাম, যাঁরা কলকাতায় এসে নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে যান, এমন দু'একজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই। কায়দা করে এঁদের

কাছ থেকে বার করে নিতে চাই, কেন কলকাতা তাঁদের পছন্দ হলো না।"

"এ আর এমন কী শক্ত কাজ?" আমি মতামত দিই।

"ফরেন-ট্যুরিস্টরা যে ভীষণ পোলাইট। সহজে অপ্রিয় সত্যকথা বলতে চান না। কাজটা তাই বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়," প্রিয়ব্রত উত্তর দিলো।

"মিস্ গ্রাহামের ব্যাপারটা তুই কিন্তু এখনও এড়িয়ে যাচ্ছিস," আমি বললাম।

"মিস্ গ্রাহামই বরং আমাকে এড়িয়ে চলছেন। তোকে ভদ্রমহিলার ব্যক্তিগত খবরাখবরগুলো দিয়ে দিই, নইলে তোর সন্দেহ কমবে না। মিস্ ডরোথি গ্রাহামের বয়স আটচল্লিশ, উচ্চতা পাঁচফুট দশ ইঞ্চি, চুলের রং লাল, ডান গালে একটা তিল আছে, ওজন অন্তত পঁচাত্তর কেজি। বোস্টনের কোন এক কোম্পানিতে টাইপিস্টের কাজ করেন।"

"খোঁজখবর তো অনেক যোগাড় করেছিস," আমি একটু রসিকতা করবার চেষ্টা করি। "প্রাণের দায়ে অনেকেই অবশ্য এইসব খবরাখবর হাতের কাছে রাখে।"

"প্রাণের দায় যতটুকু না হোক পেটের দায় তো বটেই। ট্রাভেল এজেন্ট ফোন করে জানিয়েছে, মিস্ ডরোথি গ্রাহাম প্রথম প্লেনেই ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন। অথচ এলেন মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে।"

"তাহলে তো ইন্টারেস্টিং কেস! তুই যা চাচ্ছিস তাই তো পেয়ে যাচ্ছিস," আমি মতামত দিই। এ বিষয়ে আমার বলবার অধিকারও আছে, কারণ প্রিয়ব্রত মাঝে মাঝে আমাকেও ফরেন-ট্যুরিস্ট ইন্টার-ভিউয়ের কাজে লাগিয়েছে।

প্রিয়ব্রত দুঃখ করলো, "যা চাচ্ছি তা পাচ্ছি কোথায়? মার্কনি হোটেলে দু' দু'বার ফোন করে মেসেজ রাখলাম, কিন্তু এখনও ভদ্রমহিলা খোঁজখবর করলেন না।"

"অজানা-অচেনা লোক হোটেলে মহিলাকে ফোন করলে তিনি কেন আগ্রহ দেখাবেন ?"

"অজানা-অচেনা নন, ব্রাদার। চব্বিশ ঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। জাপান, হংকং, তাইল্যাণ্ড ঘুরে ভদ্রমহিলা কলকাতায় নেমেছেন।"

"তুই ইণ্টারভিউ করেছিলি বুঝি ?" প্রিয়ব্রতকে জিজ্ঞেস করি।

"ইণ্টারভিউতে মিস্ গ্রাহাম এমন সব কথা বললেন যে আমি তাজ্জব।"

"যেমন ?" আমি জানতে চাই।

প্রিয়ব্রত তার অভিজ্ঞতা বললো। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করেছিল, "নানা গোলমালের খবর শুনেও আপনি কেন এখানে এলেন ?" ভদ্রমহিলা সবাইকে তাজ্জব করে উত্তর দিয়েছিলেন, "কোথায় গোলমাল হচ্ছে না আজকাল ? নিউইয়র্ক, টোকিও, হংকং কাকে বাদ দেবেন ? নিউইয়র্কের বহু জায়গায় মেয়েরা একলা পথ দিয়ে হাঁটতে সাহস করে না। শ্লীলতাহানি, খুনোখুনি লেগেই আছে।"

মিস্ গ্রাহাম আরও বলেছিলেন, "মিছিল, মিটিং রায়ট ইত্যাদি থেকে তোমরা ইচ্ছা করলে ফরেন এক্সচেঞ্জ রোজগার করতে পারো। আফটার-অল যেসব গোলমালের কথা আমরা কাগজে পড়ি বা টেলিভিশনে দেখি সেগুলো অনেকেই নিরাপদ দূরত্ব থেকে নিজের চোখে থ্রি-ডাইমেনশনে দেখতে পেলে খুশি হতেন। জাপানীরা এই সুযোগ পেলে ফরেন-ট্যুরিস্টদের দেখাবার জন্যেই টোকিওতে স্পেশাল রায়টের ব্যবস্থা করতো। বুলেট-প্রুফ কাঁচের তৈরি এয়ার-কণ্ডিশন লাক্সারি কোচ থেকে রায়ট দেখবার জন্যে এবং রঙীন ছবি তোলবার জন্যে হাজার হাজার ট্যুরিস্ট আসতো।"

কলকাতার দারিদ্র্য ও নোংরামির কথাও উঠেছিল। মিস্ গ্রাহাম সোজাসুজি বলেছিলেন, "প্রাচুর্য এবং পরিচ্ছন্নতা দেখবার জন্যে কোনো আমেরিকানের বিদেশে যাবার প্রয়োজন নেই।"

"কলকাতা সম্বন্ধে তাহলে মিস গ্রাহামের যথেষ্ট সহানুভূতি

রয়েছে। না হলে এতো গোলমালের মধ্যে উনি কেন এসেছেন এখানে ?" আমি বলি।

"সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন মহিলাও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কেন ?" প্রিয়ব্রতকে বেশ চিন্তিত মনে হলো।

"কী এমন ঘটলো ? কেউ কি প্রাণের ভয়-টয় দেখালো ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মিস্ গ্রাহামের সঙ্গে কথা বলতে না পেরে ওঁর সহযাত্রী বান্ধবী মিসেস্ কার্টারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ওঁকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে জানলুম, তেমন কিছুই ঘটে নি। কলকাতায় ওঁরা দুজনে একসঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন ! কলকাতায় ট্যুরিস্টরা নিউইয়র্ক থেকে একশগুণ নিরাপদ বোধ করতে পারেন—মিসেস্ কার্টারের কাছে মিস্ গ্রাহাম এই মন্তব্য করেছেন।"

"তাহলে আচমকা কলকাতা ছেড়ে যাবার কী কারণ হতে পারে বল তো ?" প্রিয়ব্রত আমাকেই জিজ্ঞেস করে বসলো।

আমি ভেবেচিন্তে উত্তর দিলাম, "মুখে যা-ই বলুন, কলকাতার জঞ্জাল দেখে মহিলা নিশ্চয় ভয় পেয়েছেন। ওয়ার্লডের আর কোনো শহরে এতো খাটা পায়খানা এবং নরক আছে বল ?"

আমার সঙ্গে একমত হতে পারলো না প্রিয়ব্রত। মিসেস্ কার্টারের কাছ থেকে সে যতটুকু খবর যোগাড় করতে পেরেছে তাতে মিস্ গ্রাহাম বড়বাজার, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ এসব কিছুই দেখেন নি। শুধু একবার বালিগঞ্জে এবং লেকে ট্যাক্সি চড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। "বালিগঞ্জে ময়লা আছে একথা পাকিস্তানের পাবলিসিটি অফিসারও বলতে পারবেন না।"

"তুই ভালভাবে খোঁজ করে দেখ, ব্যক্তিগত কোনো কারণেই হয়তো মিস্ গ্রাহাম ইণ্ডিয়া ছেড়ে যাচ্ছেন। দেশ থেকে হয়তো জরুরী টেলিগ্রাম বা চিঠি এসেছে। হয়তো সেখানে কেউ অসুস্থ।"

আমার কথা শুনে মোটেই উৎসাহ পেলো না প্রিয়ব্রত। বললো, "সে কি আর আমি খোঁজ করি নি? এরকম কোনো কারণ ঘটে নি, তাহলে মিসেস্ কার্টার জানতেন। তাছাড়া মিস্ গ্রাহামের স্বাস্থ্যও খুব ভাল রয়েছে, তেজী ঘোড়ার মতো টগবগ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

আমি ব্রেনের মোটরটা এবার ফুল ফোর্সে চালিয়ে দিলাম। এতোদিন সায়েবসুবোদের সঙ্গে মিশে সামান্য এক মার্কিনী কুমারীর কলকাতা ত্যাগের কারণ আন্দাজ করতে পারবো না, এ কেমন কথা? জিজ্ঞেস করলাম, "মিস্ গ্রাহাম কোথাকার লোক বললি?"

"বোস্টনের।"

আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "তার মানে নিউ ইংলণ্ডের সংস্কৃতি ওঁদের। সেই পিউরিটান কালচার, যা ধার্মিক ও চরিত্রবান পিলগ্রিম ফাদাররা বহু বছর আগে ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তুই তো জানিস বোস্টনের লোকরা এখনও ভীষণ মার্জিত এবং রক্ষণশীল।"

"তাই নাকি?" প্রিয়ব্রত যেন আশার আলোক দেখতে পেলো।

বললাম, "ব্যাপারটা এখন জলের মতো সহজ হয়ে যাচ্ছে। হয় হোটেলের কোনো পাজি লোক টেলিফোনে মিস্ গ্রাহামের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। নিঃসঙ্গ মহিলাকে হোটেলে দেখলে এরকম কুপ্রস্তাব করার অভ্যাস কিছু লোকের থাকে। আর না হয়, দক্ষিণ কলকাতায় যখন গিয়েছিলেন তখন রাস্তার চ্যাংড়া ছেলেরা অশোভন ব্যবহার করেছে।"

হাতে যেন স্বর্গ পেলো প্রিয়ব্রত। বললো, "খুবই সম্ভব ব্যাপারটা। মেয়েঘটিত ব্যাপারে কলকাতা ক্রমশ কী রকম স্বাধীন হয়ে উঠছে, সে তো চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।"

প্রিয়ব্রত এবার ট্রাভেল এজেন্সিকে ফোন করলো। তারপর বললো, "আমার সঙ্গে তুইও একবার দমদমে চল। মিস্ গ্রাহাম একটু পরেই প্লেনে উঠবেন। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক, যদি

মুখ খোলেন। গভরমেণ্ট এখন খুব সিরিয়াস। কলকাতায় ফরেন-ট্যুরিস্ট আসে তার জন্যে কর্তৃপক্ষ সব কিছু করতে আছেন। আমাদের জানতেই হবে, মিস্ গ্রাহামের কী অসুবিধে হলো।"

দমদম এয়ারপোর্টে আমরা সময়মতো পৌঁছতে পারলাম না। বিরাট এক শোভাযাত্রা কলকাতার রাস্তায় বিশ্রী নট-নড়ন-চড়ন ঘটিয়েছে। দমদমে পৌঁছে জানা গেলো, মিস্ গ্রাহামের প্লেন ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে।

আমার বিদায়দিনেও বন্ধুবর প্রিয়ব্রত বিমানবন্দরে এসেছিল এবং সুযোগ বুঝে মিস্ গ্রাহামের ঠিকানা আমার ডাইরিতে লিখে দিয়ে বলেছিল, "বোস্টনে যখন যাচ্ছিস তখন খোঁজখবর করিস।"

বোস্টনে আমার অনেক দেখবার শোনবার ছিল। বোস্টনের অদূরেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গুণগ্রাহী অধ্যাপকের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতের ফলেই স্বামী বিবেকানন্দ একদা পশ্চিমী জগতে খ্যাতনামা হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট আকাঙ্ক্ষী তরুণ বন্ধু শ্রীরমেন সেনের সাহায্যে মিস্ ডরোথি গ্রাহামের অ্যাপার্টমেণ্টে হাজির হয়েছিলাম।

টেলিফোনে আগেই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করা ছিল। তিনি নিজে দরজা খুলে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। মিস্ গ্রাহামের হাবভাব কথাবার্তায় বোঝা গেলো, কলকাতা তাঁকে মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারে নি—মহিলা এখনও বেশ নার্ভাস হয়ে আছেন।

রমেন সেন আমার পরিচয় দিলো—বেঙ্গলী রাইটার।

আমি বললাম, "ট্যুরিস্ট বিভাগের মিস্টার চ্যাটার্জির বন্ধু আমি। কলকাতার সত্তর লক্ষ লোকের পক্ষ থেকে তাঁরা আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কলকাতার দারিদ্র্য, নোংরামো, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশা এবং রাজনৈতিক উত্তাপ উপেক্ষা করেও আপনি ঐ শহরে

আঃআপনি হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে আসবার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন ? "সে কি জানি মার্কনি হোটেলে আপনি আটদিনের জন্যে ঘর বুক নি..রছিলেন।"

একটু থেমে বললাম, "আমার বন্ধু মিস্টার চ্যাটার্জি খবর পেয়েছেন, আপনি প্রথম দিন বিকেলবেলায় দক্ষিণ কলকাতা বেড়াতে গিয়েছিলেন।"

মিস্ গ্রাহামের মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। ওর ঘোরাফেরা সম্পর্কে আমরা এতো খবরাখবর রেখেছি জেনে হয়তো একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন।

রমেন ছেলেটি বেশ স্মার্ট। সে বললো, "মিস্ গ্রাহাম্, এঁদের চিন্তা, কেন আপনি হঠাৎ কলকাতা ত্যাগ করলেন ? দক্ষিণ কলকাতায় এমন কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল কি, যার জন্যে আপনি মার্কনি হোটেলে ফিরে এসেই প্রোগ্রাম পরিবর্তন করলেন ?"

আকারে বিপুলা মধ্যবয়সিনী মিস্ গ্রাহামের গণ্ডদেশ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। তারপর নিজেকে আয়ত্তাধীনে এনে বেশ দুঃখের সঙ্গে বললেন, "তোমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার খুব শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু কলকাতার রাস্তা ঘুরে এবার বুঝলাম খবরের কাগজ এবং বই পড়ে সব খবর পাওয়া যায় না।"

আমি ততক্ষণে নোটবই বার করে ফেলেছি। বললাম, "বোস্টনের মহিলা আপনি। কলকাতার ছেলেমেয়েদের নৈতিক অধঃপতন নিশ্চয় আপনাকে বেদনা দিয়েছে। লেকের ধারে বিকেলবেলায় ছেলেমেয়েদের কাণ্ডকারখানা আপনার নজরে পড়েছে নিশ্চয়।"

"না না, সেটাই তো স্বাভাবিক। ছেলেমেয়েরা রাস্তায় হাত ধরাধরি করে ঘুরবে, পরস্পরকে আদর করবে, আলিঙ্গন করবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাতে বিরক্ত হবার কী আছে ?" মিস্ গ্রাহাম আমার ভুল সংশোধন করলেন।

"তাহলে ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

পরেই প্লেনে উঠবেন।

কলকাতায় যা দেখলাম, তাতে আমার সমস্ত শরীর ঘিনঘিন ক ইণ্ডিয়ার এই ব্যাপারটা আমার জানাই ছিল না।"

অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে প্রশ্ন করলাম। "লেকের ধারে যুবতীদের চুম্বন করতে দেখেছেন?"

"যুবক যুবতীরা অবশ্যই রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরস্পরকে চুম্বন করতে পারে। সে দৃশ্য দেখলে তো ভরসা পেতাম।" মিস্ গ্রাহাম বেশ গম্ভীরভাবেই বললেন, "সেরকম একটা সীনও কলকাতায় নজরে পড়লো না।"

"রাস্তার মোড়ে কোনো ছোকরা আপনাকে দেখে সিটি বাজিয়েছে বা কোনো কু-মন্তব্য করেছে?" রমেন জিজ্ঞেস করলো।

"তাহলেও তো ব্যাপারটা অশ্লীল হয়ে উঠতো না। ছেলে-মেয়েরা পরস্পরকে দেখে এরকম আচরণ করতেই পারে," মিস্ গ্রাহাম বললেন।

আমাদের বিদায় দেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে মিস্ গ্রাহাম বললেন, "আজব দেশ তোমাদের। ছেলেমেয়েদের জোড়ে-জোড়ে ঘুরতে দেখা যায় না। মাই গড্, প্রকাশ্য রাস্তার ওপর ছেলেরা ছেলেদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে, পরস্পর পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরছে—এও আমাকে দেখতে হলো! এবং সেখানে আমাকে থাকতে হবে? আমাদের দেশে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে, কিন্তু এখনও আমেরিকায় প্রকাশ্য রাজপথে এমন অশ্লীলতা বরদাস্ত করা হয় না।"

মিস্ গ্রাহাম দরজা বন্ধ করে দিলেন। রাস্তায় বেরিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। রমেন জিজ্ঞেস করলো, "কী হলো শংকরবাবু?'

"রাস্তায় ছেলেরা ছেলেদের হাত ধরে গল্প করছে, এতে কী অন্যায় হলো তা মাথায় ঢুকছে না।"

মিটমিট করে হাসলো রমেন। বললো, "ব্যাপারটা আমি বুঝেছি। এজন্যে আমিও এখানে ভুগেছি। কলকাতায় আমাদের অভ্যেস বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাতধরাধরি করে কিংবা গলাজড়াজড়ি

রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, আড্ডা মারা। এখানে একমাত্র হোমোসেক্সুয়ালদের ওই অভ্যেস আছে। এখানকার সমাজে পুরুষরা প্রকাশ্যে যতখুশী মেয়েদের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ঘুরে বেড়াক—রেস্ট্রিকশন নেই। কিন্তু এক পুরুষের হাত ধরে অন্য পুরুষের যাতায়াত অত্যন্ত অশ্লীল ব্যাপার—কেউ সহ্য করবে না।"

রমেন বললো, "আমি এসব জানতাম না। আমার এক সহপাঠী এখানে মার্কিনী মহিলা বিয়ে করেছে। অনেকদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাকে জড়িয়ে ধরলাম, তারপর কলকাতার পুরনো কায়দায় হাত ধরাধরি করে অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরলাম। বন্ধুপত্নী সেই দেখে রেগেমেগে টং হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। পরের দিন শুনলাম, তিনি নাকি এতোই বিরক্ত হয়েছেন যে ডাইভোর্সের কথা ভাবছেন। প্রকাশ্য দিবালোকে আমরা নাকি তাঁর সামাজিক সম্মান নষ্ট করেছি!"

রমেন বললো, "বন্ধুটি তার পরের দিনই আমাকে অ্যাডভাইস দিয়েছিল, মেয়েদের দেহ নিয়ে এখানে যা খুশি করো, কিন্তু কখনও ভুলেও ছেলেদের গায়ে হাত দিও না।"

মিস্ গ্রাহামের ঘটনা থেকেই বুঝেছিলাম ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক সব দেশে সমান নয়। আমেরিকায় যখন এসেছি, তখন সুযোগ পেলে এদেশের খবরাখবর কিছু যোগাড় করতে হবে।

এই সুযোগ পেলাম মিসেস্ জেন লুইসের কাছে।

ওমাহার কাছে ছোট্ট এক শহরে মিসেস্ লুইসের লিভিং রুমে বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার কালিঘাটের হরেনবাবুর কথা মনে পড়ে গেলো।

হরেনবাবু বিরক্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে আমাকে বলেছিলেন, "উঠতি-বয়সের ছেলেমেয়েগুলো গোল্লায় গেলো। সনাতন সবকিছু বিসর্জন দিয়ে দেশটা এবার সত্যিই নরক হয়ে উঠলো। লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেরা মেয়ে-ইস্কুলের পাশে ঘুরঘুর করবে এবং একই বয়সের মেয়েরা এদের আস্কারা দিয়ে ফিকফিক করে হাসবে এ-দৃশ্য আমাদের ছেলেবেলায় কল্পনাতীত ছিল। চরিত্র বলে দেশে কিছু রইলো না।"

হরেনবাবুর হতাশার কারণ তাঁর পনেরো বছরের ভাইপো এবং চতুর্দশী কন্যা। চক্ষুরত্ন বিস্ফারিত করে হরেনবাবু বলেছিলেন, "ছেলে নয় তো, কালাপাহাড়! পরীক্ষা দিতে যাবার সময় পর্যন্ত বাপ-মাকে প্রণাম করে না। ছোকরা বীণাপাণি ইস্কুলের মেয়েদের এমন বিরক্ত করেছে, যে হেডমিস্ট্রেস ওর বাপকে খবর দিতে বাধ্য হয়েছেন। আগের দিন হলে, এইসব ছেলেকে আঁতুড়ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেলা হতো।"

তারপর ফিসফিস করে হরেনবাবু জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমাদের বউদির বক্তব্য। "খুব তো পরের ছেলের নিন্দে করছো। আগে নিজের মেয়ে সামলাও।"

হরেনবাবুর মেয়ের ইস্কুল-খাতার মধ্যে এক ছোঁড়ার চিঠি পাওয়া গেছে। নাম-ধাম কিছুই নেই, শুধু লেখা—'শিখা, তোমার মুখের হাসিতে চুম্বক আছে।' শিখা এই সম্পর্কে বাবা-মা অথবা মিস্ট্রেসের কাছে রিপোর্ট না-করে চিঠিটা নীরবে নিজের লেখার খাতার মধ্যে রেখে দেওয়ায় হরেনবাবুর স্ত্রী দুশ্চিন্তায় নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করেছেন। মেয়ের স্কুলে যাওয়া চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হরেনবাবু। ঘরের এইসব 'কেলেঙ্কারি' বাজারে রটলে, হরেনবাবু আর সমাজে মুখ দেখাতে পারবেন না।

আমাদের দেশের এইসব সংবাদ খবরের কাগজে বেরোয় না; কিন্তু মিসেস্ লুইসকে আমি এসব সবিস্তারে বলেছি। খবরাখবর চেপে রেখে কোনো দেশকে বা জাতকে ছোট বা বড় করা যায় না বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার কথা শুনে, মধ্যবয়সিনী মার্কিনী মা মিসেস্ লুইস বেশ অবাক হয়ে গেলেন! বললেন, "তোমরা এখনও রূপকথার রাজত্বে বসবাস করছো! তোমাদের ছেলেমেয়েরা এখনও এতো পবিত্র রয়েছে, যে তাদের খাতার মধ্যে একটা দু'লাইনের চিঠি দেখলে বাবা-মায়েরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তোমাদের হরেনবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে আমি হিংসে করি।"

মার্কিন দেশে ছোট্ট এক শহরে মিসেস্ লুইসের সঙ্গে আমার পরিচয়। বিদেশীদের আপন করে নিতে আমেরিকান মেয়েদের জুড়ি নেই। সাধে কি আর স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, "এদেশের মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নেই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ আর দয়াবতী - মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। হরে হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম।...এদেশের বরফ যেমন সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন পবিত্র।...আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলেদের পথ চলবার জো নেই। আর এদের কত দয়া। যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়িতে স্থান দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে...সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে

যায়, কি না করে বলতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হবো না।"

মিসেস্ লুইস আমার জন্যে সারাদিন ধরে নানাভাবে পরিশ্রম করেছেন, তারপর কোনো আপত্তি শোনেন নি—সোজা বাড়িতে ধরে নিয়ে এসেছেন—ওঁদের বাড়িতে একটা রাত্রি কাটাবার জন্যে।

পরের দিন সকালে মিস্টার লুইস অফিস চলে গেছেন। মেয়ে লিন্‌ডা এবং ছেলে মিচেলকে ইস্কুলে পাঠিয়ে মিসেস্ লুইস নিশ্চিন্ত হয়েছেন—হাতে তেমন কাজ-কর্ম নেই। লিভিং-রুমে বসে আমার সঙ্গে তিনি গল্প করছিলেন। বলছিলেন, "উঠতি-বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাদের গোটা দেশের বাবা-মায়েরা বিব্রত। এদের আমরা কিছুতেই সামলাতে পারছি না। তাই তোমার ফ্রেণ্ড হরেনবাবুকে হিংসে করছি।"

আমি বললাম, "আপনাদের এখানে টিন-এজ কথাটা প্রায়ই শুনছি। থারটিন থেকে নাইনটিন এই প্রত্যেকটা বছরের পিছনে যে 'টিন' শব্দটা রয়েছে তার থেকেই আপনারা ভারি সুন্দর কথাটা তৈরি করেছেন। আমাদের দেশে 'টিন-এজ' বলে কিছু নেই—কৈশোরের পরেই যৌবন। প্রাচীন সাহিত্যে বয়ঃসন্ধির কবিতা কিছু আছে—কিন্তু সেখানে কবিরা শ্রীরাধিকার দেহে যৌবনের আবির্ভাব নিয়েই ব্যস্ত! তবে 'ব্রোঞ্জ-এজ', 'কপার-এজ', 'আয়রন-এজ'-এর মতো আমাদের দেশেও এবার 'টিন-এজ' আসছে। হরেনবাবু এদেরই উঠতি-বয়সের ছেলে-মেয়ে বলে বর্ণনা করেন।"

"উঠতি--কিন্তু মাঝে মাঝে 'পড়তি' বলে সন্দেহ হয়। বাচ্চাগুলো প্রথমে বেশ থাকে। কিন্তু বারো-তেরোতে পা দিয়ে ছেলেমেয়ে-গুলোর যে কি অধঃপতন শুরু হয়!" মিসেস্ লুইস দুঃখ করে বললেন, "আমরা চাই ছেলেমেয়েদের বন্ধু হতে। আমরা চাই ওরা সুখে থাকুক, ওদের স্বাস্থ্য যেন খারাপ না হয় এবং যেন কোনো বিপদে পড়ে না যায়। কিন্তু টিন-এজ ছেলেমেয়েরা ভাবে, বাবা-মা তাদের শত্রু—তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়াই হলো আমাদের একমাত্র কাজ।"

পরের বাড়িতে কয়েকঘণ্টার জন্যে এসেছি। তাদের দেশের পারিবারিক বিষয়ে আমি আর কী বলবো ?

"গতকালই আমাদের বাড়িতে একটা কাণ্ড হয়ে গেলো—তুমি লক্ষ্য করো নি।" মিসেস্ লুইস বললেন।

ওঁদের চতুর্দশী কন্যা লিন্ডা সুসজ্জিতা হয়ে সন্ধ্যাবেলায় ছেলেবন্ধুর সঙ্গে নাচে যাচ্ছিল, আমি দেখেছিলাম। যাবার আগে মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করে বেশ ভদ্রভাবে শুভরাত্রি জানিয়ে গেছলো।

মিসেস্ লুইস বললেন, "ব্যাপারটা ঘটেছিল—আমাদের বেডরুমে। আমার স্বামী ও আমি দু'জনেই একটু সাবধানী। মেয়ে কার সঙ্গে বেরোচ্ছে, উনি তার খোঁজখবর রাখেন। উনি মেয়েকে বললেন, নিজের মর্যাদা হারিও না, আর রাত এগারোটার মধ্যে ফিরে এসো। বাবার এই কথায় মেয়ের কী রাগ ! বললো, কারফিউ অর্ডার দিয়ে কী লাভ? যা ভয় পাচ্ছ তা করবার ইচ্ছে হলে এগারোটার আগেও করা যায়। উনি বললেন, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে বদনাম রটলে আমার ভাল লাগবে না।"

মিসেস্ লুইস বললেন, "মেয়ে রাত তিনটের আগে ফেরে নি। আমি তিনটে পর্যন্ত জেগে ছিলাম। তাতেও মেয়ের বিরক্তি !"

একটু থেমে মিসেস্ লুইস বললেন, "আজকালকার ছেলেমেয়েদের কোনো লাজলজ্জা নেই। এই মেয়েই কিছুদিন আগে আমাকে বললো, যখন দোকানে যাচ্ছ, আমার জন্যেও নিরোধ পিল কিনে এনো। আমাদের পুরনো যুগ থাকলে, গালে একটা চড় কষিয়ে দিতাম। তুমি লুকিয়ে-লুকিয়ে যা খুশী করো—কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের মাকে পিল কিনতে হুকুম দেবার অসভ্যতা সহ্য হয় না।"

আমি হতভম্ব। হরেনবাবুর উঠতি-বয়সের ভাইপো-ভাইঝিরা সত্যিই এখনো এই স্তরে পৌছয় নি।

মিসেস্ লুইস আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, "উঠতি-বয়সের এই বাধাবন্ধনহীন দৈহিক যথেচ্ছাচারই একদিন আমাদের সভ্যতাকে নষ্ট করবে।"

কান টানলেই যেমন মাথা আসে, তেমন উঠতি-বয়সের বিদেশী ছেলেমেয়েদের কথা এলেই হিপিদের প্রসঙ্গ উঠতে বাধ্য।

"জ্ঞানে গুণে গরীয়ান এবং ধনে মানে বলীয়ান আমেরিকানদের প্রেস্টিজ যদি দুনিয়ার হাটে কেউ পাংচার করে থাকে তারা হিপি।" এমন একটা কথা শুনেছিলাম আমাদের পাড়ার নগেনদার কাছে। নগেনদা এক আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করেন— আমেরিকান ট্যুরিস্ট এবং আমেরিকান ডলার এঁদের কাছে যথাক্রমে জগন্নাথদেব এবং পুরীর মহাপ্রসাদের মতো পবিত্র।

সেই নগেনদাও বললেন, "এদেশে আমেরিকান হলে ট্যুরিস্টদের সাতখুন মাপ ছিল। বেটারা বিদেশীমুদ্রায় টাঁকশাল। কিন্তু এই হিপিরা স্বজাতের মান-সম্মান কিছু রাখলো না। এরা নোংরা জামাকাপড় পরে, খালি পায়ে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, দামি হোটেলের ধারে-কাছে না গিয়ে ধর্মশালার খোঁজ করে, ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি তো দূরের কথা, কুলি পর্যন্ত ভাড়া করে না। বাবাজীরা নিজের মাল নিজে বয়। বাসে-ট্রামে এবং রিক্‌শায় ঘুরে বেড়ায়, ভাঁড়ে চা খায়, বিড়ি ফোঁকে, আর শুনেছি গাঁজায় দম দেয়।"

তিতিবিরক্ত নগেনদা বলেছিলেন, "এক বেটা হিপিকে সেদিন আপিস থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিলুম। ওমা! তার পরের দিন আমাদের নিউইয়র্ক আপিস থেকে টেলেক্স এলো, খোদ বড় সায়েবের জ্যেষ্ঠপুত্র নাকি হিপি হয়ে ইণ্ডিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোকরা যদি কোনোরকম অসুবিধায় পড়ে তবে আমরা যেন সাহায্য করি। আমার তো ভিরমি খাবার অবস্থা, কারণ গতকাল যে-ছোকরাকে প্রায় গলাধাক্কা দিয়েছি তিনিই নাকি আমাদের খোদ মালিকের বংশধর।"

নগেনদা বলেছিলেন, "বোঝো ব্যাপারটা! আমি ঘটনাটা বেমালুম চেপে গেলাম। আমাদের আপিসে ম্যাড্রাসি ম্যানেজারের

সঙ্গে আমার জিঞ্জার অ্যাণ্ড গ্রীন ব্যানানা সম্পর্ক—খবরটা তার কানে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমার টুয়েলভ্ ইয়ারের চাকরির টুয়েলভ-ও-ক্লক বাজিয়ে দিতো।”

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তারপর ?”

নগেনদা বলেছিলেন, “আমি পড়ি-তো-মরি করে ছুটলাম সাডার স্ট্রীটের এক নোংরা বাড়িতে ছোকরার খোঁজ করতে। গিয়ে দেখলাম রঙীন পাঞ্জাবি-পরা এক ডাঁসা মেমসায়েবের সঙ্গে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ছোকরা গ্লোব সিনেমার সামনে আলুকাবলি খাচ্ছে। আমি এক গাল হেসে, বিনয়ে বিগলিত কুর্নিশ জানিয়ে ছোকরাকে অনুরোধ করলাম, ‘চলো গ্র্যাণ্ড হোটেলে—ওখানে তোমার জন্য এয়ার-কণ্ডিশন স্যুইট ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তেমন ইচ্ছে হলে, সঙ্গের ওই মেমসায়েবকেও ডবলরুমে নিয়ে তোলো।’ তা ছোকরা সায়েব ওসব কথা কানেই তুললো না। কোথায় আমি ভেবেছিলাম, বড় সায়েবের ছেলে সন্তুষ্ট হলে ওকে ধরে ভাইপোটাকে আপিসে ঢুকিয়ে নেবো। তা নয় ছোকরা যা বললো শুনে আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো।”

“কি বললো ?” আমি নগেনদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

নগেনদা বলেছিলেন, “আমার আক্কেল গুড়ুম। সায়েব বললো, ‘কোনো রিক্শা মালিকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে পারো ? আমি রিক্শা টেনে দু-তিন টাকা রোজগার করতে চাই।’ এই বলে ছোকরা আলুকাবলির পাতা চাটতে লাগলো। জয়গুরু ! কত রোগের জার্ম যে ওই হিন্দুস্থানীর আলুকাবলিতে কিলবিল করছে তা ভগবানই জানেন। ছোকরার বাবা সেবার যখন নিউইয়র্ক থেকে কলকাতা আপিস দেখতে এলেন, তখন কলকাতার একনম্বর হোটেলের খাবার জল সায়েবের পক্ষে সাফিসিয়েণ্টলি নিরাপদ মনে না হওয়ায়, আমরা এরোপ্লেনে প্যারিস থেকে ড্রিংকিং ওয়াটার আনিয়েছিলাম।”

নগেনদা বলেছিলেন, “ছোঁড়াগুলো হোল আমেরিকান জাতের

ইজ্জত কেরোসিন করে দিলো। এরপর কে আর সায়েব দেখলে খাতির করবে বলো ?"

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলাম। নগেনদা বললেন, "বড় সায়েবের বড় ছেলের একটা জিনিস কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছিল। কোনো গ্যাদা নেই। আমাদের ম্যানেজার চিদাম্বরম ককটেলে নেমন্তন্ন করে কার্ড পাঠিয়েছিল। ছোকরা কোনো পাত্তাই দিলো না। আমি মশাই অফিসের এয়ার-কণ্ডিশনড গাড়িতে সেই একই ককটেলে যাবার পথে দেখি কিনা সায়েবের-পো চৌরঙ্গী রোডে বটগাছের তলায় বসে রিক্‌শাওয়ালাদের সঙ্গে ছাতু মাখছে।"

আমি মার্কিন মুলুকে যাচ্ছি শুনে নগেনদা বলেছিলেন, "ভায়া, এই হিপিদের হাঁড়ির খবরগুলো ভাল করে জেনে এসো তো।"

"আপনার কাছে কী কী খবর আছে, বলুন ?" নগেনদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

নগেনদা বললেন, "কী বলবো ভায়া, কিছুই বুঝতে পারি না। কেউ বলে এরা আমেরিকান সি-আই-এ। হিপি সেজে আমাদের পাড়ার গোপন খবরাখবর ফরেনে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমার ভাই তেমন বিশ্বাস হয় না, কারণ আমাদের পাড়ার খবরাখবর জেনে ফরেনের কী এমন লাভ হবে ?"

"তা হলে ?"

নগেনদা বলেছিলেন, "আসলে এরা হলো বড়লোকের বখাটে ছেলে। আদর পেয়ে-পেয়ে ওদের টুয়েলভ-ও-ক্লক বেজে গিয়েছে।"

নগেনদার শেষ মন্তব্যটুকু মার্কিন মুলুকে গিয়ে আমার বেশ মনে ছিল।

বড়লোকের বখাটে ছেলে বললেই এতোদিন আমার মানসপটে একটা নির্দিষ্ট ছবি ভেসে উঠতো। ছবিটি আমাদের পাড়ার বড়লোক বাবু ব্রজেন্দ্রলাল মল্লিক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র চুনীলাল মল্লিকের। স্বদেশে

আমার কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল মোটা না হলে বড়লোক হতে পারে না! বাবু ব্রজেন্দ্রলাল মল্লিক দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় সমান সাইজের ছিলেন। তাঁর মধ্যপ্রদেশের বেড় কত ফুট হতে পারে তা আমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারতাম না। ভাগ্যে ব্রজেন্দ্রবাবু ফুলপ্যান্ট পরতেন না, তা-হলে দর্জি বেশ বিপদে পড়ে যেতো ; কারণ একখানা ফিতেয় বড়লোকের কোমর মাপা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

চুনীলাল কৈশোরে তেমন মোটা ছিল না। কিন্তু যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারাতেও ক্রমশ বাপের ধাঁচ আসতে আরম্ভ করলো। সে গিলে-করা আজানুলম্বিত ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরতো, গলায় সোনার হার, হাতে ডজনখানেক তাবিজ। চুনীলালের গাড়ি পাড়া দিয়ে চলে গেলে অদ্ভুত এক গন্ধ ভুরভুর করে ছড়িয়ে পড়তো। শুনেছি, প্রতিদিন পুরো একশিশি ফরাসী সেন্ট ব্যবহার করতো চুনীলাল।

চুনীলাল কিছুদিন আমাদের ইস্কুলে লেখাপড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। আধডজন প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে সে অভিমন্যুর মতো লড়েছে। কিন্তু যা খুব সহজে ইয়ার বন্ধুদের কাছে সে আয়ত্ত করেছিল তা হলো ত্রৈভাষিক (ইংরিজী, বাংলা ও হিন্দী) খিস্তি, সন্ধ্যায় নিষিদ্ধস্থানে গমন এবং বেপরোয়া মদ্যপানের অভ্যাস। চুনীলালকে আমরা কখনও নিজের হাত ব্যবহার করতে দেখি নি। বেলা সাড়ে-ন'টার আগে তাকে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া বারণ ছিল। তারপর দু'জন চাকর আধঘণ্টা ধরে দলাই-মালাই করবেন নন্দদুলালকে। শুনেছি, নিজে স্নান পর্যন্ত করতে পারে না চুনীলাল। ভাত খাবার আসন থেকে বাবুকে তুলে দেবার জন্যে দু'জন চাকর দাঁড়িয়ে থাকতো। মোটর গাড়িতে উঠে নিজে কখনও দরজা বন্ধ করতো না চুনীলাল। কম বয়সে অনেক ঘটা করে ব্রজেন্দ্রলাল মল্লিক সুলক্ষণা সুন্দরী পুত্রবধূ ঘরে এনেছিলেন। কিন্তু চুনীলাল ঘরের ছেলে হবার জন্যে বড়লোকের ছেলে হয় নি!

ওঠে তা বৃহৎবপু, অলস, মদ্যপ, চরিত্রহীন একটি কুৎসিত আকার। আমার কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীর সব ধনীরাই অনেকটা ব্রজেন্দ্রলাল-চুনীলাল জাতীয় হবেন। সুতরাং হিপিরা যখন বড়লোকের বখা-ছেলে, তখন তারাও নিশ্চয় চুনীলালের মতো ফুর্তিতে ও মদ্যপানে পৈতৃক সম্পত্তি ওড়াবে—স্বতঃই আন্দাজ করেছিলাম।

নিউইয়র্কের পার্কে একদল হিপিকে দেখেছিলাম। কেন জানি না প্রথম দর্শনেই একটু মায়া পড়ে গেলো। এরা যদি বড়লোকের বখা ছেলে হয়, তাহলে আমাদের চুনীলাল মল্লিকদের সঙ্গে এদের কোনো সাদৃশ্য নেই। চুনীলালরা সারাক্ষণ চাকরবাকরদের হুকুম করে এবং ইয়ার-বন্ধু ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকেই পাত্তা দেয় না। কিন্তু আমরা যুবকরা কাউকে কোনো হুকুম করে না।

কাঠের বেঞ্চিতে জড়ভরতের মতো আত্মভোলাদের যাই করুক, আমরা

পার্কে ঘুরতে ঘুরতে আমিও একটা কিছুদিন আগে গ্রীনউইচ বেঞ্চিতে দু'জন তরুণ তরুণী চোখ দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিলো। আমরা বয়স বাইশ তেইশ। মুখে একগাদা নে পুলিস-কনস্টেবলদের বাচ্চাদের শতচ্ছিন্ন নীল রংয়ের হাফপ ছিলাম। পুলিসদের সম্মানে আমরা তপস্বিনীদের মতো এ া কবেতে চাই। আমরা তোমাদের গান্ধীর রংয়ের হাফপ্যান্ট পরেছে। ।"

যায় ভিতরে কোনো অ, "তুমি মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছো?"

বালিকাটির। ওরা ছাত্রাবস্থায় তাঁকে দেখেছি শুনে মেয়েটি বললো, তাকিয়ে আছে। বলে কেন? ওঁকে যদি তোমাদের পছন্দ না-হয়ে ব্যাপারটা বোঝবএখানে পাঠিয়ে দিলে না কেন? আমরা এই পুরো দেড়ঘণ্টা স তাঁকে গুরু করে রাখতাম।"

যুবক-যুবতী লো, "আমার খুব গান্ধীকে দেখতে ইচ্ছে করে—হি তখন বিন এ গ্রুভি ক্যাট।"

কনগে! ক্যাট মানে তো বেড়াল! আর গ্রুভি কথাটার অর্থ ভগ বাবা? গান্ধীজীকে ওরা বেড়াল বলছে কেন? পরে শুনেছি

তখনও যদি এখানে বসে থাকো, তাহলে বিপদে পড়ে যাবে।"

ছোকরাটি নড়েচড়ে বসলো। পুলিসকে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, "আমরা আপনার কী করেছি?"

"তোমাদের সঙ্গে তর্ক করার মতো সময় বা ইচ্ছে কোনোটাই আমার নেই। যা-বলবার আমি বলে দিয়েছি," পুলিসটি চড়া গলায় বললো।

ছোকরাটি এবার আমার দিকে তাকালো। আমাকে দেখেই বুঝলো বিদেশী। তারপর বিরক্তভাবে বললো, "আমরা সাতে নেই পাঁচে নেই, চুপচাপ পাবলিক পার্কে বসে আছি। তাও পুলিসের কী ... দেখলেন তো? ভগবানের অরুচি এই দেশকে আবার ..."

... বুঝতে পারছি না। মহিলা এবার নড়েচড়ে ... করলেন, "পৃথিবীর কোন অংশ থেকে তুমি ..."

... মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, ...। গ্রেট পিপ্‌ল। গত বছর ...টিয়েছিলাম—এবছর বড়দিনে ...

...পিকে হয় জোড়ে না-হয় ...য়েকজনের মুখে বিশেষ ... ই মহামানবের ... কৃতজ্ঞতার ঋণ ... ত ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম ...রে সেন্ট পল ...লেন, 'এরা ... ঘরেপ্লের ... শ

হলো, স্বয়ং যীশুই আবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছেন।

দৈহিক সাদৃশ্য থাকলেই মহামানব হওয়া যায় না—কিন্তু যুবকদের মুখে কোথায় আশ্চর্য সরলতা ও পবিত্রতা রয়েছে। কেবল এদের চোখগুলো উজ্জ্বল নয়, কেমন যেন একটু ঘোলাটে।

হিপি যুবকটি আবার কথা বললো। "ওই ন্যাবটি এখনই এসে আমাদের মাথা ভাঙবে।" হিপি অভিধানে 'ন্যাব' মানে যে পুলিস তা আন্দাজ করে নিলুম।

ছোকরা বললো, "এই পার্কের উত্তর দিকে এক ব্লক গেলেই গুণ্ডারা প্রতিদিন রিভলবার দেখিয়ে নিরীহ পথিকদের কাছে পয়সা ছেনতাই করছে। সেখানে পুলিস কিছু করবে না। কিন্তু আমরা চুপচাপ বসে আছি, তা ওদের সহ্য হবে না।"

মেয়ে হিপিটি বললো, "কপগুলো, আমাদের যাই করুক, আমরা ওদের ভালবাসবো। জানো মিস্টার, কিছুদিন আগে গ্রীনউইচ ভিলেজে কপগুলো অনেক হিপির মাথা ফাটিয়ে দিলো। আমরা কিছুই করি নি; বরং পরের দিনে পুলিস-কনস্টেবলদের বাচ্চাদের জন্যে পিকনিকের ব্যবস্থা করেছিলাম। পুলিসদের সম্মানে আমরা একদিন নাচগানের আ..র করতে চাই। আমরা তোমাদের গান্ধীর অহিংসা নীতিতে বিশ্বাস করি।"

ছোকরা হিপি বললো, "তুমি মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছো?"

আমি কয়েকবার ছাত্রাবস্থায় তাঁকে দেখেছি শুনে মেয়েটি বললো, "তোমরা ওঁকে মারলে কেন? ওঁকে যদি তোমাদের পছন্দ না-হয়ে থাকে, আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিলে না কেন? আমরা এই গ্রীনউইচ ভিলেজে তাঁকে গুরু করে রাখতাম।"

ছেলেটি বললো, "আমার খুব গান্ধীকে দেখতে ইচ্ছে করে—হি মাস্ট হ্যাভ বিন এ গ্রুভি ক্যাট।"

অ্যাঁ! ক্যাট মানে তো বেড়াল! আর গ্রুভি কথাটার অর্থ কিরে বাবা? গান্ধীজীকে ওরা বেড়াল বলছে কেন? পরে শুনেছি,

ক্ষেত্রে শব্দটি হলো 'চিক' বা খুকুমণি।

হিপিনী বললো, "কপগুলো যদি আমাদের ওপর এইরকম অত্যাচার করে তাহলে আমরা তোমাদের দেশে চলে যাবো। পৃথিবীর প্রথম হিপি তো ইণ্ডিয়াতেই জন্মেছিলেন।"

তিনি আবার কে? আমার জানতে ইচ্ছে হয়। ছোকরা বললো, "লর্ড বুদ্ধ। রাজার পুত্র হয়েও তিনি এসট্যাবলিশমণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। রাজকীয় সুখের লোভ ত্যাগ করে প্যালেস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সত্যকে জেনে অনেকদিন পরে তিনি যখন আবার জন্মভূমিতে ফিরে এলেন তখন তাঁর বাবা পরাজয় স্বীকার করলেন।"

বুদ্ধ এবং গান্ধীকে এরা যে এতো সম্মান করে তা আমার জানা ছিল না। আমি বললাম, "পুলিস তোমাদের লাঠি মারলো অথচ তোমরা তাদের ছেলেদের খাওয়ালে; এই শুনে আমাদের ভগবান চৈতন্যদেবের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর শিষ্য নিত্যানন্দ একবার জগাই মাধাই নামক দুই স্বাধীন পুলিসের খপ্পরে পড়েছিলেন। তারা ইট মারলো, কিন্তু নিতাই তাদের ভালবেসে জয় করলেন।"

হিপিনী খুব আগ্রহ দেখালো। জিজ্ঞেস করলো, "তিনি এগজ্যাকটলি কী করলেন?"

আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হলো, "সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত রচনা হলো—মেরেছিস মেরেছিস কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দিবো না?"

হিপিযুগল আমাকে চেপে ধরলো, সুরটা শিখিয়ে দিতে হবে। আমি লাইনটা বাংলায় গাইলাম। ওরা বললো, ইংরিজী অক্ষরে লাইনটা লিখে দাও। আমি রোমান অক্ষরে লিখছি—মেরেছিস মেরেছিস কলসীর কানা। ওরা ততক্ষণে সুর করে লাইনটা প্র্যাকটিস করতে লাগলো।

এমন সময়ে পুলিসের পুনরাবির্ভাব। পুলিস প্রথমেই হিপি ছোকরার পেটে এক গোঁত্তা দিলো। তারপর ছোকরাকে প্রায় উলঙ্গ করে সার্চ শুরু হলো। মহিলাটিকে পুলিস বললো, "তোর গায়ে

স্টেশনে মেয়ে এসিস্টেন্ট আছে, সে তোর গোপন স্থান থেকে সব মাল বের করে ফেলবে।"

মেয়েটি শান্তভাবে বললো, "আমার কাছে কিছুই নেই। বিশ্বাস না হয় দেখো"—এই বলে মেয়েটি ঝপাং করে বুকের কাপড় খুলে অনাবৃত স্তনযুগলের মধ্যবর্তী উপত্যকা দেখিয়ে দিলো। মেয়েটি হয়তো সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতো, কিন্তু পুলিস তাকে নিবৃত্ত করলো।

পুলিসের দৃষ্টি এবার আমার ওপর পড়লো। "কী গোপন মেসেজ পাঠানো হচ্ছে? দেখি।" এই বলে আমার হাতের টুকরো কাগজটা ছোঁ মেরে সে কেড়ে নিলো। তারপর অদ্ভুত কয়েকটি শব্দ দেখে আরও চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে বেশ সন্দেহের সঙ্গে বিড়বিড় করতে লাগলো—মিয়ারচিজ মিয়ারচিজ কোলজির কন। বিরাট শিকার ধরার উত্তেজনায় পুলিস চিৎকার করে উঠলো, "নাউ! এতোক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেলো। তোমরা কোড ওয়ার্ডে গ্রাস এবং এল-এস-ডি সম্পর্কে খবর আদানপ্রদান করছো।"

হিপি মহিলা আমার হয়ে বললেন, "আমাদের ওপর যা অত্যাচার করছো করো। কিন্তু এই ভদ্রলোক নিরপরাধ ইণ্ডিয়ান।"

"কীরকম নিরপরাধ থানায় গেলেই বোঝা যাবে! ইণ্ডিয়া থেকেই তো টন টন মারিজুয়ানা এদেশে স্মাগল করা হচ্ছে—ভাবছো আমরা কিছুই জানি না। চলো বাছাধনরা এখন থানায়!"

এবার আমি সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। দেশ দেখতে এসে শেষপর্যন্ত হাজতে ঢুকতে হবে নাকি! হিপি যুবক আমাকে রক্ষা করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলো। বললো, "এটা খুবই অন্যায়। এই ভদ্রলোককে আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার কোনো যুক্তি নেই।"

আমি কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। কাঁদো কাঁদো অবস্থা। এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, আমেরিকায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে একটা সরকারী পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, "এই কার্ডের অধিকারী

অতিথিকে যেন সর্বপ্রকারে সাহায্য করা হয়।" আমি শেষবারের মতো চেষ্টা করবার জন্য আইডেনটিটি কার্ডখানা বার করে পুলিসের হাতে দিলাম। মন্ত্রবৎ কাজ হলো। আমার নাম ধরে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে পুলিস বললো, "মিস্টার অমুক, আপনার অসুবিধা সৃষ্টি করবার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি আমাকে বলেন নি কেন যে আপনি আমাদের সরকারের মাননীয় অতিথি ?"

পুলিস আমাকে সময়োচিত অভিবাদন জানিয়ে বললো, "এই যে অঞ্চল দেখছেন এখানে যতরকম বেআইনী নেশার মালের লেনদেন হয়। এই যে হিপিগুলো দেখছেন, এরা হলো আমাদের নেশনের কলঙ্ক। এরা কোনো কাজকর্ম করে না, স্নান করে না, দিনরাত শুধু মারিজুয়ানা, এল-এস-ডি ইত্যাদি খেয়ে, নানারকম নেশার ইনজেকশন নিয়ে নিজেদের এবং ফিউচার বংশধরদের শরীর স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করছে।"

আমার জন্যে হিপি দু'জনও তখনকার মতো রক্ষে পেয়ে গেলো। তাদের গলায় মৃদু ধাক্কা দিয়ে পুলিস বললো, "এ-যাত্রায় বেঁচে গেলি। যা পালা ! ফের যদি কালকে এখানে দেখি, মুশকিলে পড়ে যাবি !"

হিপিযুগল অপমানিত হলেও নিজেদের বিরক্তি প্রকাশ করলো না। যাবার আগে আমাকে বললো, "আমাদের জন্যে আপনার এই কষ্ট হলো, আমরা দুঃখিত।"

"বেশী বকবক করিস না, যা পালা !" পুলিস আবার ওদের বকুনি লাগালো।

ওরা দু'জন এবার আমাকে অবাক করে দিয়ে বাংলায় গান ধরলো, "মেরেছিস মেরেছিস কলসীর কানা·· ···"

গান গাইতে গাইতে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেলো। পুলিস আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলো। বললো, "ওরা কোনো একটা অদ্ভুত ভাষায় আমার বাপ-মা তুলছে। ওই ব্যাটাদের দুষ্টুমি—সব সময় ইংরিজীতে কথা বলবে না। নিজেদের খুশী মতো

দিয়ে গালাগালি করবে। জানে ইংরিজীতে কিছু বললে, আমি ঘাড় ধরে থানায় নিয়ে যাবো।"

আমি বললাম, "ওরা বাংলায় গান গাইছে। বাংলা আমার মাতৃভাষা।"

উৎফুল্ল হয়ে পুলিস বললো, "খুব ভাল হয়েছে। চট করে অনুবাদ করুন তো ওরা কী বলছে, দৌড়ে ধরে নিয়ে এসে বাছাধনদের মজা দেখিয়ে দিচ্ছি। ফরেন ভাষায় শালারা আর কোনোদিন যাতে পুলিসকে গালাগালি না করতে পারে তার শিক্ষা দিয়ে দেবো।"

আমার অনুবাদ শুনে পুলিসপ্রবর তো থ! প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায় না। জিজ্ঞেস করলো, "আর ইউ শিওর, কথাগুলো কোনো কোড নয়?"

আমি বললুম, "মোটেই না। প্রত্যেক বেঙ্গলীর এই গান মুখস্থ।"

হতাশ হয়ে পুলিস জিজ্ঞেস করলো, "শেষের দিকে কী বলছে? আমাকে ওদের সঙ্গে লাভ-অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়তে বলছে? ভগবান আমাকে রক্ষে করুন! ওদের মেয়েগুলোর গায়ে যা গন্ধ! তুমি যদি ওদের প্যাডে যাও বুঝবে।"

"প্যাড আবার কী বস্তু?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

পুলিস বললো, "যেখানে ওরা ঢালা-বিছানায় কুড়ি পঁচিশ জন একসঙ্গে শুয়ে থাকে। প্যাডে এমন দুর্গন্ধ তোমাকে কী বলবো!"

একটু থেমে সে বললো, "তুমি বিদেশী। আমাদের দেশ দেখতে এসেছো। তোমাকে বলা উচিত নয়, কিন্তু এই কমুনিটি প্যাডগুলো হলো নরক। কতকগুলো সিনিয়র হিপি নাকি সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে এইগুলো চালায়। সারাদিন টোটো করে ঘুরে গাঁজা-ভাং খেয়ে জোড়ে জোড়ে কচি কচি হিপি ছেলেমেয়ে রাত্রে এখানে শুয়ে পড়ে। তারপর গোরু ঘোড়ার মতো ওরই মধ্যে যা করে তা তোমার না শোনাই ভাল।"

পুলিসকে বললাম, "এক কাপ কফি খাবেন নাকি?"

বললো, "এখন ডিউটিতে রয়েছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এইসব ছেলেমেয়েরা কোথা থেকে আসে?"

পুলিস বললো, "ভগবান জানেন! আমি অনেকদিন এই লাইনে আছি, কয়েক বছর আগেও এসব হাঙ্গামা ছিল না। হঠাৎ কী যে হলো, পঙ্গপালের মতো হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বাপমায়ের সংসার ছেড়ে ইস্কুল-কলেজে নাম কাটিয়ে হিপি হচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জাত বলে আমাদের যে গর্ব ছিল তা এদের দৌলতে নষ্ট হতে বসেছে। এরা সব সময় জোড়ে জোড়ে ঘোরে। কোনো একটা পাড়ার কাছাকাছি দলবেঁধে থাকে। এরা বেজায় কুঁড়ে। এদের কোনো উচ্চাভিলাষ নেই, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো ভাবনা নেই। যে-সমাজ তোদের এতো সুখে রেখে বড়সড় করেছে তোরা শুধু তাদের গালাগালি করবি? সোসাইটির সবাই নাকি লোভী, সবাই নাকি খারাপ, শুধু ওরাই ভাল। তা বাপু সবাই যদি খারাপ, দেশটা যদি সত্যিই গোল্লায় গিয়ে থাকে, তাহলে সাজেশন দে, বল্ কীভাবে সমাজকে ভাল করা যায়—তা বলবে না।"

একটু থামলো পুলিস। তারপর বললো, "ওদের আসল লোভ নেশাভাঙের। প্রথমে তোমাদের দেশ এবং নেপাল থেকে আসা মারিজুয়ানা দিয়ে আরম্ভ করবে। ওদের কাছে নাম হলো 'ঘাস'। এই ঘাস কখনো সিগারেটের ভিতর পাকিয়ে, কখনও কুকির সঙ্গে ভেজে, কখনও চায়ের সঙ্গে ভিজিয়ে এরা খাচ্ছে। তাতে নাকি ওরা মানসিক আনন্দ পায়—সব কিছু ভুলে একেবারে আনন্দলোকে চলে যায়। ডাক্তাররা বলছে, ঘাস জিনিসটা সর্বনাশা। কিন্তু এই বেঁড়েদের সঙ্গে তর্কে পেরে উঠবেন না। থানায় গিয়ে গোঁত্তা খাবার পরও মুখের ওপর বলবে, জুসের থেকে ঘাস অনেক ভাল।"

"জুস কী জিনিস?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"জুস হলো মদ—বিশেষ করে হুইস্কি। ওদের মতে হুইস্কি নাকি ঢের বেশী স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। হুইস্কি খাওয়ার পরে হ্যাংগওভার হয়, ঘাসের নাকি ওসব দোষ নেই। হুইস্কি খেলে নাকি

দেহমন অধঃপতনে যায়, আর ঘাস নাকি চড়চড় করে মানুষকে ওপরের দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ইস্কুল-কলেজে কুসঙ্গে পড়ে ছেলেপুলেরা ঘাসে হাতেখড়ি করে, তারপর নেশা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হিপি হওয়া ছাড়া পথ থাকে না। আইন অনুযায়ী এদেশে ঘাস আমদানি বন্ধ। কিন্তু কী করে যে লাখ লাখ হিপি এই ঘাসের সাপ্লাই পাচ্ছে তা আমরাও বুঝতে পারি না। তবে ঘাসের দাম অনেক এখানে। যারা সস্তা-গণ্ডায় ফুর্তি করতে চায় তারা এখন আপনাদের দেশে চলে যাচ্ছে।"

আমি মনে মনে বললাম, এটা মন্দ নয়। আমাদের দেশে যারা সস্তায় হুইস্কি খেতে চায় তারা ফরেনে যাবার জন্যে উন্মুখ. আর বিদেশের ছেলেমেয়েরা সস্তায় গাঁজার কল্কেতে দম দেবার লোভে ইণ্ডিয়ায় আসতে চায়। একেই তো বলে 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে'!

পুলিস বললো, "ঘাস দিয়ে শুরু—তারপর হিপিদের প্রমোশন হয় এল-এস-ডি তে। ১৯৪৩ সালে একজন সুইস কেমিস্ট হঠাৎ এই কেমিক্যাল আবিষ্কার করেন। দুনিয়ার লোকরা বলে, সুইসরা কখনও যুদ্ধে নামে না, পৃথিবীর মঙ্গল ছাড়া ওদের মাথায় নাকি কিছুই নেই। এখন আপনারা বিবেচনা করুন। আমাদের দেশের যদি শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ হয়, তা এই সুইসদের তৈরি এল-এস-ডির জন্যেই হবে। এল-এস-ডি সম্বন্ধে পুলিস লাইনে আমাদের পড়াশোনা করতে হয়। পচা রাই সরষের ওপর একরকম ছাতা পড়ে। লিসারজিক অ্যাসিডের সঙ্গে যা মেশানো হয় তা এতোদিন রবার ভালকানাইজ করবার জন্যে টায়ার কারখানায় লাগতো, নাম ডাইএথাইল অ্যামিন। ওই মেশানো জিনিসটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ডিসটিল করবার সময় ক্লোরোফরম, বেনজিন ইত্যাদি কী সব ব্যবহার করে। এল-এস-ডি বড়ি খেলেই আট থেকে বারো ঘন্টা ডেঞ্জারাস অবস্থা। ছেলেমেয়েগুলোকে এই অবস্থায় দেখলে কষ্ট হয়—কখনও রেগে উঠছে, কখনও কাঁদছে,

কখনও হাসছে, কখনও ভয় পাচ্ছে, কখনও দুশ্চিন্তায় গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছে। ছোঁড়াগুলো তবু বুঝবে না, বলবে অ্যাসিড খেয়ে ট্রিপ করছি। কোথায় যাত্রা করছিস বাবা? নরকে!"

পুলিস এবার হাতঘড়ির দিকে তাকালো। শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেবার আগে বললো, "এইসব জায়গায় বেশী রাত্রি পর্যন্ত একলা ঘুরবেন না—হিপিগুলোর বড্ড অর্থকষ্ট, আপনার কাছ থেকে সব কিছু কেড়েকুড়ে নিতে পারে।"

এই কেড়েকুড়ে নেবার ব্যাপারটা বোধহয় সত্যি নয়। কারণ হিপিরা সাধারণত নির্বিবাদী শান্তিপ্রিয়। নিজেদের নিয়েই বুঁদ হয়ে আছে, পৃথিবীর অন্য কোথায় কী হচ্ছে সে সম্পর্কে এদের কোনো আগ্রহ নেই। হিপি রাজ্যে একলা অনেক ঘুরেছি। কিন্তু আমাকে কেউ কখনও ভয় দেখায় নি। এই বিপদ বরং সুসভ্য ওয়াশিংটনে, নিউ ইয়র্কে এবং শিকাগোর বিখ্যাত অঞ্চলে যথেষ্ট আছে। অনেকেই দিনদুপুরে এবং রাতের অন্ধকারে এইসব জগদ্বিখ্যাত শহরে যথাসর্বস্ব গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। হিপিরা ওসব করে না, তবে অনেক সময় ভিক্ষে চায়। বিশেষ করে বিদেশীদের কাছ থেকে। স্বদেশীদের কাছে সহানুভূতি পাবে না বলেই ওদের বিশ্বাস।

এই ভিক্ষের ব্যাপারে আমি একটা ছেলেমানুষী মতলব এঁটেছিলাম। ভিখিরীর দেশ থেকে এসেছি; বিদেশে যে হাত পাতবে তাকে বঞ্চিত করবো না, বরং যা চাইবে তার ডবল দেবো।

ডেনভার, কলারোডো থেকে ট্রেনে চড়ে আমি আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তে হাজির হয়েছিলাম। সেখানকার বিরাট এক শহরে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে বার হচ্ছি এমন সময় এক তরুণ হিপি যুবক আমার কাছে এসে বললো, "দশটা সেন্ট (আমাদের দশ পয়সার মতো) কি তুমি স্পেয়ার করতে পারো?"

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হলো। আরও মনে পড়লো, এদেরেই বাবা-কাকাদের দান করা গম খেয়ে একসময় দুর্ভিক্ষের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের প্রাণ রক্ষা হয়েছে।

আমি বললাম, "দশ কেন, কুড়ি সেণ্ট তোমাকে দিতে পারি, যদি বলো ওই পয়সা নিয়ে তুমি কী করবে?"

"দুপুরবেলায় কিছু খেতে চাই আজকে।" ছোকরা বেশ শান্তভাবে উত্তর দিলো।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমারও লাঞ্চের সময় হয়েছে। বললাম, "আমিও খেতে যাবো ভাবছিলাম। আমি যদি তোমাকে খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করি?"

ছোকরা আমাকে অজস্র ধন্যবাদ দিলো, কিন্তু নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে দ্বিধা দেখালো। বললাম. "এতো ভাববার কী আছে?"

"না মহাশয়, আপনার অসুবিধা ঘটাতে চাই না। আপনি দশটা সেণ্ট দিলেই আমার এবেলা চলে যাবে।"

আমি আরও চেপে ধরতে, ছোকরার সংকোচের কারণ বুঝতে পারলাম। অদূরে একটি কিশোরী হিপিনীও শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় পরে ভিক্ষা করছে। ওদের ইচ্ছে দু'জনে একসঙ্গে খাবে। আমি বললুম, "ওঁকেও নিয়ে চলুন—তিনজনে কোথাও গিয়ে সামান্য কিছু খাওয়া যাবে।"

ছোকরার আত্মসম্মানে লাগছিল বোধ হয়। বললো, "দশটা সেণ্ট চেয়ে আপনাকে এইভাবে অসুবিধায় ফেলবার ইচ্ছে আমার ছিল না।"

আমি বললাম, "ওসব ভদ্রতার কথা ভুলে যান। আপনার বান্ধবীর আপত্তি না থাকলে চলুন।"

মেয়েটির নাম ডোরা। টোনি নামক যুবক হিপি তাকে গিয়ে নিমন্ত্রণের কথা বলতেই সে এমন হেসে ফেললো, যা আমি কোনোদিন ভুলবো না। সেই হাসির মধ্যে অনির্বচনীয় সরলতা ও পবিত্রতা ছিল। ভিক্ষা আমাদের দেশে কলুষিত হয়েছে; এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে নীচতা ও দারিদ্র্য। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যেদিন ভিক্ষার মধ্যে ছিল বিনয় ও পবিত্রতা। এই পবিত্রতা কখনও কখনও দেখেছি ব্রাহ্মণ বন্ধুবান্ধবদের পারিবারিক উপনয়ন সংস্কারে। [illegible]

দণ্ডধারী তরুণ সন্ন্যাসী গৈরিক ভিক্ষার ঝুলিটি খুলে যখন বলে, ভবান, ভিক্ষাং দেহি অথবা ভবতি, ভিক্ষাং দেহি—তখন অপূর্ব লাগে। আজ অনেকদিন পরে কেন জানি না সেই অনুভূতি হলো আমার!

ডোরা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো, "হে বিদেশী, দু'জন ভিখিরীর জন্যে কেন তোমার মধ্যাহ্নভোজনে ছন্দপতন ঘটাবে ?"

কিশোরীকে বললাম, "আমি ভিখিরীর দেশ থেকে এসেছি তার নাম ভারতবর্ষ। তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে আমার ভাল লাগবে।"

সরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে কিশোরী এবার সখার দিকে তাকালো। তারপর বললো, "উনি যখন এতো করে বলছেন, তখন চলো।"

কাছাকাছি একটা সেলফ-সার্ভিস রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলাম আমরা। এখানে কোনো বেয়ারা টেবিলের কাছে এসে অর্ডার নেয় না, কাউণ্টার থেকে খাবার এনে খেতে হয়। এবং খাবার পর নোংরা ডিশগুলো একটা চৌবাচ্চায় রেখে আসতে হয়। অতিথিদের টেবিলে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী খাবে ?"

ডোরা বললো, "আমরা আজকাল যেসব খাবার খেয়ে থাকি তা এখানে পাবে না আমরা পছন্দ করি টাটকা সব্জি, কিছু ফল এবং দুধ। তুমি বরং একটা হেভি স্যুপ এবং দু'এক টুকরো রুটি দেখো।"

টোনি বললো, "তারপর কফি খাওয়া যেতে পারে। ডিপফ্রিজে জমা টিনের কৌটোতে রাখা খাবার খাইয়ে ব্যবসাদাররা দেশটার সর্বনাশ করছে। তোমাদের দেশ যেন কখনও এই ডিপফ্রিজ এবং টিন ফুডের খপ্পরে না পড়ে। আমাদের গভরমেণ্টও স্বীকার করছে, প্রত্যেক বছর টিন, বোতল এবং বাক্সে রাখা খাবারের মাধ্যমে প্রত্যেক আমেরিকানের পেটে তিন পাউণ্ড কেমিক্যাল প্রিজারভেটিভ চালান যাচ্ছে। এর ফল বিষময় হতে পারে।"

ওদের বসতে বলে, আমি খাবারের লাইনে দাঁড়ালাম। মিনিট চারেক পরে খাবার হাতে ফিরে দেখি গোলমাল বেধেছে। দো কানের ম্যানেজার আমাদের টেবিলে এসে ওদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন। আমি বেশ লজ্জায় পড়লাম। হাতজোড় করে ম্যানেজারকে বললাম,

"এঁরা আমার অতিথি, ওঁদের কী দোষ হয়েছে? কেন চলে যেতে বলছেন?"

ম্যানেজার গম্ভীরভাবে বললেন, "এই রেস্তোরাঁর নিয়ম—খালি পায়ে লোককে এখানে ঢুকতে দিতে বাধ্য নই।"

আমি বললাম, "আমি যে দেশ থেকে এসেছি সেখানে বেশীর ভাগ লোকের পায়ে জুতো নেই। খালি পায়ের সঙ্গে নোংরামির সম্পর্ক কী? বড়জোর বলতে পারেন, যে খালি পায়ে হাঁটছে, তার নিজের বিপদের সম্ভাবনা বেশী।"

ম্যানেজার ওসব কথা কানে নিলেন না। বললেন, "আমি কোনো আর্‌গুমেণ্টে ঢুকতে চাই না। একবার এইসব লোক আমার রেস্তোরাঁয় ঢুকলে ভদ্রলোকেরা এখানে আসা বন্ধ করে দেবে।"

আমি করুণভাবে আবেদন করলাম, "যদি আপনি এদের খেতে না দেন, তা হলে আমাকেও ওদের সঙ্গে চলে যেতে হয়। আমাদের খাবার কেনা হয়ে গিয়েছে। যদি মিনিট পনেরোর জন্য দয়া করেন।"

ম্যানেজার কী ভেবে শেষপর্যন্ত রাজী হলেন।

আমরা খাওয়া শুরু করলাম। টোনি বললো, "এই আমাদের দেশ! দেখলে তো? এদের যত পাপ সব কার্পেটের তলায় এবং মনের মধ্যে লুকনো থাকে। আমার খালি পা তো তোমার কী? পায়ে জুতো নেই বলে ওরা সেখানে আমাকে প্লেন থেকে নামিয়ে দিয়েছে। অথচ পয়সা দিয়ে এরা সিনেমায়, থিয়েটারে রেস্তোরাঁয়, ক্যাবারেতে পা-থেকে মাথাপর্যন্ত উলঙ্গ দেহ দেখতে যায়।"

একটু পরেই টোনি নিজের কথা বলতে আরম্ভ করলো। টোনির বয়স উনিশ। শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সে। বাবা সম্প্রতি কোনো কোম্পানির কর্ণধার হয়েছেন।

টোনি বললো, "এই ভদ্র আমেরিকান সমাজ সম্বন্ধে আমার ঘেন্না হয়ে গিয়েছে। লোকগুলোর মধ্যে লোভ ও উচ্চাশা ছাড়া আর কিছু নেই। জীবন থেকে এদের কেবলমাত্র প্রত্যাশা—মোটা

এবং একখানা প্রমোদ তরণী—এখানে বলে ইয়াট। আমার বাবা-মা'র এসব তো ছিলই, তাছাড়াও অনেক কিছু ছিল। আমাদের তিনটে গাড়ি আছে, দুটো বাড়ি আছে, কানট্রি ক্লাবের মেম্বার আমরা। বাড়িতে টেলিভিশন থেকে আরম্ভ করে দুনিয়ার ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আছে—কোনোটা দাঁত মাজবার জন্যে, কোনোটা দেহ দলাই-মলাইয়ের জন্যে, কোনোটা ভুঁড়ি কমাবার জন্যে, কোনোটা চুল শুকনো করবার জন্যে, কোনোটা গোঁফ সরু করবার জন্যে। কিন্তু আমার পিতৃদেব কি সুখী হয়েছেন? মোটেই না। অত্যধিক পরিশ্রম করেন ভদ্রলোক, কাজের চাপে শরীর ও মন দুই ক্ষয়ে যাচ্ছে। তার ওপর সবসময় ইনকামট্যাক্সের চিন্তা। মাথার যন্ত্রণায় ভদ্রলোক পাগল—কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না। সাফল্যের মই বেয়ে ওপরে উঠে ভদ্রলোক দেখছেন, সেখানেও আর একটা মই লাগানো আছে—আরও ওপরে ওঠা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। মাঝে মাঝে ভদ্রলোক খুব রেগে ওঠেন—কখনও চুপচাপ মনমরা হয়ে বসে থাকেন। প্রচুর হুইস্কি গেলেন। ভদ্রলোকের দেহে বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। এই ধরনের সাফল্য দেখলে আমার গা-বমি করে। আমি ওই ইঁদুরদৌড়ে অংশ নিতে রাজী নই। অথচ বাবার ইচ্ছে, আমাকে নিজের কার্বন কপি বানাবেন। আমি বছর দুই আগে ওঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।"

টোনি বললো, "টয়েনবি সম্প্রতি লিখেছেন, হিপিরা হলো আমেরিকান-মার্কা জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে মানবতার সাবধান-করা লাল লণ্ঠন—রেড ওয়ার্নিং লাইট।"

"বাড়ি থেকে পালিয়ে কী করলেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"এক বন্ধু বললো প্লাস্টিক হিপি হ। সেটা হলো সারা সপ্তাহ রুজিরোজগার করে কিছুদিনের জন্যে কিংবা দু'দিনের জন্যে হিপি হওয়া। আমি বললাম, না। আমার মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বলছে। আমি প্রতিবাদ করতে চাই।"

টোনি বললো, "ঘুরতে ঘুরতে আমি ক্যালিফোর্নিয়াতে হাজির

হলাম। সেখানে এক গুরু পাকড়ালাম। তিনি বললেন, 'ঘাস খাও। অ্যাসিড নাও। তুরীয় আনন্দে ডুবে থাকো। প্রাণ যা চায় তাই করো। শুধু এমন কিছু কোরো না যাতে অন্যের কষ্ট হয়। মানুষকে ভালবাসো।' আমার চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গেলো। আমি গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরলাম, ঘরে রবিশঙ্করের ছবি টাঙালাম। চকচকে ঝকঝকে রংয়ে ঘর সাজালাম, নাচগান হৈ-হুল্লোড় করলাম। সাইকেডেলিক মিউজিকে মনের কী আনন্দ হয় তা কী করে অন্যকে বোঝাবো ? প্রথম প্রথম এল-এস-ডি খেয়ে মনে হতো আমি মহাশূন্যে পড়ে যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি ? কোথাও আশ্রয় পেলে তবে তো লাগবে ' মহাশূন্যে তো কোনো ভয় নেই।"

"তারপর ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"এই অবস্থায় ভিক্ষে করা শিখলাম। শিখলাম পয়সা জমানো মহাপাপ। কখনও পরের দিনের কথা ভাবতে নেই। যা আছে তা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হয়।"

"আর কী করতেন ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"যা মন চায়। শরীর এবং মনকে এতোদিনের শেকলবাঁধা অবস্থা থেকে মুক্তি দিলাম। সেক্সও করেছি প্রচুর—অবশ্য ঠকিয়ে নয়, জোর করে নয়। যার দেহের সঙ্গে আমার দেহ যুগলবন্দী হবে তার অনুমতি ও সমর্থন নিয়ে—বাই মিউচ্য়াল কনসেন্ট। সেক্সের টেনসন থেকে মুক্তি পাবার পরে শুরু হয়েছে আত্ম অনুসন্ধান। মাঝে মাঝে বাড়ির কথা মনে হয় নি এমন নয়। শেষে ওই পিছুটান কাটাবার জন্যে ক'জন হিপি মিলে পুরনো আমিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সৎকার করলাম। আমার পুরনো নাম পর্যন্ত কাউকে বলি না।"

"তারপর ?"

"তারপর চলে গেলাম পশ্চিমের এক হিপি কমিউনে। সেখানে এক পোড়ো জায়গায় হিপি-সভ্যতা গড়ে উঠেছে। পুরনো কুয়েকটা মোটরগাড়ির ছাদ দিয়ে সেখানে গুহা বানানো হয়েছে। সামনের জমিতে কিছু শাকসব্জি এবং ফসল ফলানো হয়। তাই দিয়ে চলে যায়।

অন্যসময় কিছু ধূপ তৈরি করতাম আমরা। সেই বেচে কোনোরকমে এক আধখানা পাঁউরুটি কেনা যেতো। এখন আমি অনেকটা নিজেকে বুঝতে পারছি। অনেক শান্ত হয়েছি—সংসারের ওপর সেই প্রচণ্ড রাগ আর নেই। এখন আমি প্রাণভরে ছবি আঁকি। মাঝে মাঝে সেতার বাজাতে ইচ্ছে করে—পয়সা যোগাড় হলে একটা যন্ত্র কিনতাম।”

“এখন আপনি কী হতে চান?” আমার প্রশ্ন।

টোনি হাসলো। “আমি কিছুই হতে চাই না। আমার প্রাণ যা চায় তাই করতে চাই। আমার কোনো অ্যামবিশন নেই। এই অ্যামবিশনের আগুনেই তো আমাদের জাতটা ধ্বংস হতে বসেছে। আমি বুঝেছি. আমি নিজেই জীবনধারণের পক্ষে সাফিসিয়েণ্ট রিজন।”

ডোরা এতোক্ষণ চুপচাপ টোনির কথা শুনে যাচ্ছিল। ওর বয়স সতেরো। একেবারে কচি চেহারা। সে বললো, “টোনির মতো আমি অত বুঝি না। টোনি বড্ড পড়াশোনা করে। আমি অ্যাসিড খেয়ে সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকতে চাই। জানো, ইট ইজ এ গ্রেট গ্রেট অভিজ্ঞতা। যদি পারো একবার খেয়ে দেখো—তুমি কখনও রিগ্রেট করবে না।”

“ডোরা, তোমার বাবা-মা'র কথা বলো,” আমি অনুরোধ করি।

ডোরা বললো, “আমার বাবা-মাকে দেখলে মনে হবে এরকম সজ্জন পৃথিবীতে আর জন্মায় নি! কিন্তু দু'জনেই বেড়ালতপস্বী। বিজনেসে আমার বাবা বহুলোককে ঠকিয়েছেন--টাকা ছাড়া আমার বাবা আর কিছুই বোঝেন না। দিনরাত মনে মনে যোগ বিয়োগ করছেন তিনি—ওঁর মাথার মধ্যে একখানা আই-বি-এম কমপিউটার বসানো আছে। আর আমার মা বাইরে বড়াই করবেন, তিনি খুব উদার মতের মানুষ। কিন্তু একবার যেমনি শুনলেন আমাদের পাড়ায় একজন নিগ্রো ভাড়াটে আসছে, মা'র কি দুশ্চিন্তা! জনে জনে ফোন করে মা বলতে লাগলেন—এখনও সময় আছে, কিছু একটা করা যায় না? আমার এসব ভাল লাগে না—পড়াশোনাও ভাল লাগে

না। আমি পালিয়ে এসে বেশ সুখে আছি।”

ঘড়ির দিকে নজর পড়লো আমার। নির্ধারিত পনেরো মিনিট অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। এখনই হয়তো ম্যানেজার সায়েবের পুনরাবির্ভাব হবে।

টোনি ও ডোরা ব্যাপারটা বুঝলো। তারাও উঠে পড়লো। আমাকে ধন্যবাদ জানালো।

আমেরিকা থাকাকালে এর পরেও আমি কিছু কিছু হিপিদের সান্নিধ্যে এসেছি। এরা সবাই যে বখাটে তা মোটেই সত্যি নয়—আবার সবাই যে খুদে যীশুখ্রীষ্ট তাও ঠিক নয়। এদের একটা আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এরা কিছুটা বিপথগামী। এরা প্রতিবাদ করছে, কিন্তু কোনপথে মুক্তি তা জানতে এখনও উৎসাহী নয়।

বেশীর ভাগ আমেরিকান এদের নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। বলেন, এরা মোটেই রিপ্রেজেনটেটিভ আমেরিকান নয়। সেটা সত্যি কথা। দেশের বেশীর ভাগ ছেলে মেয়েই এখনও পর্যন্ত প্রচলিত আমেরিকান জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী। হিপিদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়।

ওদেশ থেকে ফিরবার পথে বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবির মতামত সংগ্রহ করেছিলাম। টয়েনবি কিছুদিনের জন্যে আমেরিকায় স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিটিং অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন। টয়েনবির মতে, হিপিরা আমেরিকান জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। মধ্যবিত্ত আমেরিকান চিন্তাধারায় যে-কোনো কাজকে বিচার করা হয় সেই কাজের বদলে কত ডলার আসে তাই দিয়ে। অর্থের বাইরেও যে কাজের মূল্যায়ন হতে পারে আমেরিকান সমাজে এই বিশ্বাস হিপিরাই আনতে পারে।

টয়েনবির মতে, সাচ্ছল্য জিনিসটা আমেরিকায় অপেক্ষাকৃত নতুন। দু'তিন পুরুষ আগেও আমেরিকানরা ক্ষেতখামারে থাকতো। দু'তিন পুরুষ অবিমিশ্র সুখ ভোগ করে ওরা বুঝতে পারছে এতে পরিপূর্ণ আনন্দ নেই। টয়েনবি খোঁজখবর নিয়ে বলেছেন, হিপিদের মধ্যে

নানারকম লোক আছে। কিছু লোকের মধ্যে শুধু ভড়ং, কিছু লোক একেবারে বোগাস, কিছু লোক স্রেফ কুঁড়ে—গতর খাটিয়ে কিছু করতে চায় না। বেশীর ভাগ হিপিই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। অনেকের বাবা বড় বড় কোম্পানিতে উঁচু পোস্টে আছেন। এইসব কোম্পানিতে কোনো আদর্শ নেই—স্রেফ আরও টাকা রোজগারের ধান্দায় পরিবারের সবাই ব্যস্ত। ফলে এরা সবাই রক্ষণশীল, কোনোরকম পরিবর্তন এঁদের কাম্য নয়।”

হিপিদের একজন আরাধ্য পুরুষ হলেন দ্বাদশ শতাব্দীর সেন্ট ফ্রানসিস অফ অ্যাসিসি। এই ইটালীয় মহাপুরুষের বাবা ধনী বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু পারিবারিক সম্পদের মোহ ত্যাগ করে সেন্ট ফ্রানসিস স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন—তিনি বনে বনে পশু-পাখিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। টয়েনবির মতে, হিপিরা যে সেন্ট ফ্রানসিসের ভক্ত হবে তাতে আশ্চর্য কী? তিনি নিজেই তো সেকালের হিপি।

টয়েনবির আসল দুশ্চিন্তা, ঘাস ও অ্যাসিড। হিপি অন্দোলনের এইটাই অন্ধকার দিক। এইসব নেশায় এদের শরীরের সর্বনাশ হচ্ছে—এদের কাজের ক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে। তবে নেশা-ভাঙ সব দেশে সব যুগে গোলমাল বাধিয়েছে। আগে ছিল মদ এবং আফিম। এখন এল-এস-ডির পালা।

হিপিদের কথা চিঠিতে আমার এক মাস্টারমশায়কে লিখেছিলুম। তিনি পরের চিঠিতেই লিখেছিলেন, “আমেরিকানরা তো বুদ্ধিমান জাত—ওরা হিপিদের এতো ভয় পাচ্ছে কেন? যা বুঝতে পারছি, কিছু ছেলেপুলের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রশ্ন জেগেছে। তবে বড্ড ছটফটে জাত তো, তাই একটু আধটু ভুল করে বসছে। এল-এস-ডি ফেন্সেস্রডি খেয়ে ওরা আধ্যাত্মিক সমস্যার রাসায়নিক সমাধানের চেষ্টা করছে। কেমিক্যাল সলিউশন অফ স্পিরিচুয়াল প্রবলেম যে সম্ভব নয় তা বুঝলেই ওরা অনেক এগিয়ে যাবে। তখন কেউ ওদের নাগাল পাবে না। গোটা মার্কিন জাতটা একদিন অনেক বড় হবে, দেখিস।”

চাঁপার মাকে আমি সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি। চৌধুরী বাগান লেনে আমরা যে-বাড়িতে ভাড়া ছিলাম তারই লাগোয়া বস্তিতে থাকতো চাঁপার মা। এতো কাছাকাছি বাড়ি যে চাঁপার মা ঘর থেকেই আমার মাকে বলতো, "ও উকিল-মা, আমার যেতে একটু দেরি হবে। চাঁপা সকাল থেকে বমি করছে।"

আমরা ঘরে বসেই চাঁপার মার কথা শুনতে পেতাম। আমাদের বাড়িতে বাসন মাজতে মাজতে চাঁপার মা চিৎকার করতো, "ও চাঁপি, পোড়ারমুখী ভাত রাঁধতে রাঁধতে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? উনুনে ফ্যান পড়ার আওয়াজ যে এখান থেকে শুনতে পাচ্ছি।"

চাঁপার বয়স ছিল আমারই মতো। হয়তো আমার থেকে দু'এক বছরের বড়। চাঁপার মা বাসন মাজতে মাজতে আপন মনে গজ গজ করতো, "কত পাপ করেছিনু গত জম্মে, তাই এ-জম্মে দুধের বাচ্চা কোলে নিয়ে ভাতারখাগী হলাম। বাপ কত দেখেশুনে বে দিয়েছিল কপালে সহ্য হলো নি।"

সেই দুধের বাচ্চা চাঁপাকে কত কষ্ট করে তিলে তিলে যে বড় করতে হয়েছে তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়ানোর যে কি দুর্গতি তা আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীরা জেনেও জানি না। অন্যদিকে অত্যন্ত সমাজসচেতন, প্রগতিশীল এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েও আমরা ভৃত্যদের কষ্টের দিকে চোখ বুজে থাকি।

চাঁপার মা-কে পাঁচ-ছ'টা বাড়িতে কাজ করতে হতো। না করলে পেট চলে না। আর চাঁপা সকাল থেকে মায়ের পিছন পিছন ঘুরতো। ছোট মেয়েকে বাড়িতে একলা রেখে যেতে মা ভরসা পেতো না।

এরই মধ্যে চাঁপার মা আবার শনি পুজোতে টাকা খরচ করতো। আমাকে প্রসাদ এনে দিতো। আমার মাকে চাঁপার মা বলতো, "বারের দেবতার নজর তো ভাল নয়। তাই ওনাকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করছি মা।"

কিন্তু এতো চেষ্টা করেও কোনো ফল হয় নি। কত কষ্ট করে, নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে এবং বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষে করে চাঁপার বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর চাঁপা যেদিন বরকে নিয়ে ফিরে এলো সেদিন চাঁপার মা একবেলা ছুটি নিয়েছিল। জামাইকে আদর করবার জন্যে আমাদের বাড়ি থেকে আলাদা বাসনপত্র নিয়ে গিয়েছিল। নতুন জামাই এবং মেয়েকে বসবার জন্যে মা দুটো ভাল আসনও দিয়েছিলেন।

কিন্তু এতো সুখ চাঁপার বেশীদিন সহ্য হয় নি। একটা দুধের বাচ্চাকে কোলে করে বিধবা চাঁপা বস্তিবাড়ির সেই অন্ধকার ঘরে ফিরে এসেছিল।

বস্তিজীবন সম্পর্কে আমার যতটুকু ধারণা আছে তা চাঁপার মায়ের দয়াতেই। ছোটবেলা থেকে কতবার ওদের বাড়িতে গিয়েছি। নিজের চোখে ওদের জীবন-সংগ্রামের নানা দৃশ্য দেখেছি। পঞ্চাশ-ষাটজন লোকের জন্যে মাত্র একটা পায়খানা। একটা কল। সেখানে জলের জন্যে বালতি, ঘড়া, গামলা ইত্যাদির লাইন লেগে আছে। তাও প্রায়ই কলে জল আসে না। তখন সবাই ছোটে গলির মোড়ে টেপাকল দখল করতে। সেখানে খণ্ডযুদ্ধ লেগেই থাকে।

ভোর চারটে থেকে চাঁপার মায়ের জীবন শুরু হতো। বাড়িতে ঘড়ি নেই, তবু কেমন আন্দাজ করে প্রতিদিন যে ঠিক সময়ে চাঁপার মা উঠে পড়তো তা আমাকে আজও বিস্মিত করে। ঝটপট কাছাকাছি একটা বাড়িতে আঁচের ব্যবস্থা করে এবং এঁটো বাসনগুলো কলতলায় নামিয়ে দিয়ে, চাঁপার মা পৌনে-পাঁচটার সময় আমাদের বাড়িতে চলে আসতো।

আমাদের বাড়িতে তখন খুব সকাল-সকাল চা হতো। একটা গেলাসে নিজের পাওনা চা ঢেলে নিয়ে চাঁপার মা বাড়িতে ছুটতো। যেতে যেতেই চিৎকার করতো, "ও চাঁপি, মুখপুড়ী, তোর যে জমিদারের মাগ হয়ে জন্মানো উচিত ছিল। এখনও ঘুম থেকে উঠলি না, কখন কাজে যাবি?" বস্তিতে ফিরে গিয়ে ঘুমন্ত মেয়েকে অর্ধেক

মাঝে মাঝে আবার নাতনীকে কোলে করে আমাদের বাড়িতে আসতো চাঁপার মা। নাতনী কোনো আব্দার করলে দিদিমা বিরক্ত হয়ে উঠতো। বাসন মাজতে মাজতে চাঁপার মা বলতো, "ওর লক্ষ্মি নাম দিলে কী হবে? আসলে হাড়-জ্বালানী।"

আমি অবশ্য হাড়-জ্বালানোর তেমন কিছু দেখতাম না। নিজের মনেই লক্ষ্মী আমাদের বারান্দায় বসে বসে দিদিমার কাজকর্ম দেখতো। আর একটু বড় হয়ে, ওখানে বসে বসেই ইট আর বালি যোগাড় করে লক্ষ্মী আপন মনে বাসন-মাজা বাসন-মাজা খেলতো।

চাঁপার মার পরিবার সম্বন্ধে ছোটবেলায় অত বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরে মনে মনে আমি ওদের সম্মান করতে শিখেছি। কত অল্পে সন্তুষ্ট ওরা। কী কষ্টের জীবন। দু'বেলা ভাতও জুটতো না অনেক সময়ে। একটা দিনও কাজ থেকে ছুটি নেই। অথচ কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, কোনো লোভের প্রকাশ নেই। আমাদের এই সমাজের এঁটো বাসনগুলো পরিষ্কার করবার জন্যেই যেন চাঁপার মাকে ঈশ্বর সংসারে পাঠিয়েছিলেন।

চাঁপার মার ধৈর্যেরও শেষ নেই। বুকে করে নিজের মেয়ে এবং নাতনীকে আগলে রাখতো। আর রেগে গেলে নিজের মেয়েকে বলতো, "গত জন্মে কত পাপ করেছিলি তাই ভগবান তোকে শাস্তি দিচ্ছে। পেটে একটা ছেলেও ধরতে পারলি না। আমার মতো যমে নেবার আগে পর্যন্ত বাসন মাজবি আর বাটনা বাটবি।"

চাঁপার মায়ের বস্তিতে আমার একটা জিনিস নজরে পড়তো। অন্তত জন দশ-বারো বিধবা ওখানে থাকে। ছোটবেলায় আমি একবার চাঁপার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বিধবা কেন হয়?"

চাঁপার মা বলেছিল, "পাপ করলে।"

"পাপ তো ছেলেরাও করে। ওরা কেন বিধবা হয় না?"

চাঁপার মা জিভ কেটে বলেছিল, "ছিঃ! ছেলে মেয়ে এক হলো?"

আমাদের বাড়ির পাশে ঠাকুরমশায় থাকতেন। তিনি আমাকে

বলেছিলেন, "ভগবান যা করেন তার পিছনে একটা কারণ থাকে। ডজন ডজন থান-পরা বিধবা না থাকলে ঠিকে-ঝি পাওয়া যেতো না। সাধারণ মানুষের কত কষ্ট হতো তা হলে, ভাবো।"

মিসেস্ উডফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পরেই চাঁপার মা এবং মেয়ের কথা আরও গভীরভাবে মনে পড়ছে। বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা মিসেস্ উডফোর্ডের। আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রং। ভদ্রমহিলা আমার বন্ধু রমাপতিদার বাড়িতে জ্যানিটারের কাজ করেন।

বিরাট বড়লোকের দেশ আমেরিকা। ডজন ডজন ঝি পাওয়া যায় না। খুব কম বাড়িতেই কাজের লোক আছে। যাদের আছে, যেমন রমাপতিদার, উপায় নেই বলেই। ব্যাচেলর রমাপতিদা ফ্ল্যাট নিয়ে একলা বসবাস করেন।

রমাপতিদার এই ফ্ল্যাটের একটা বাড়তি চাবি মিসেস্ উডফোর্ডের কাছে থাকে। নীল রংয়ের জার্মান গাড়ি চালিয়ে কৃষ্ণকায়া বিশালবপু মিসেস্ উডফোর্ড রমাপতিদার ফ্ল্যাটে আসেন। নিজের স্কার্টের ওপর একটা সাদা অ্যাপ্রন চাপিয়ে নেন—বাংলা সিনেমায় ডাক্তার-নায়িকাদের যেমন পরতে দেখা যায়। তারপর একটা খাতায় মিসেস্ উডফোর্ড লেখেন, ক'টার সময় এলেন। ঝটাঝট কাজকর্ম শেষ করে—মানে ঘরদোর পরিষ্কার করে, বিছানাটা টেনে তৈরি করে—মিসেস্ উডফোর্ড এক কাপ কফি তৈরি করবেন। কফি খেয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লগবুকে লিখবেন কখন রমাপতিদার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। মাসের শেষে লগবুক দেখে ঘণ্টা হিসেবে টাকা দিতে হবে মিসেস্ উডফোর্ডকে।

রমাপতিদার সঙ্গে মিসেস্ উডফোর্ডের কদাচিৎ দেখা হয়। কারুর কিছু বক্তব্য থাকলে চিঠি লিখতে হয়। লগবুকের মধ্যে স্লিপ রেখে যান মিসেস্ উডফোর্ড। আর মিসেস্ উডফোর্ডের প্রাপ্য চেক রমাপতিদা ওই লগবুকের মধ্যে রেখে যান। ঘণ্টায় পনেরো টাকা

"মিসেস্ উডফোর্ড যে কম সময় থেকে বেশী সময় লিখছেন না, তার প্রমাণ কী?" আমি জানতে চেয়েছিলাম। রমাপতিদা বলেছিলেন, "এসব ছেঁড়ামি এখানে সাধারণত কেউ করে না। উনি তো বলেই নিচ্ছেন যে তোমার টাইমের মধ্যেই তোমার উনুন জ্বেলে কফি খাবো। কফিও তোমাকে সাপ্লাই করতে হবে।"

অফিসের কাজে রমাপতিদা ভোরবেলায় বেরিয়ে যেতেন। আমি তখনও শুয়ে থাকতাম। মিসেস্ উডফোর্ডের আওয়াজে ঘুম ভাঙতো। হুড় হুড় করে কাজ সেরে ঝড়ের বেগে বৃদ্ধা মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, "টেল মিস্টার চ্যাটার্জি, কাল আমি নাও আসতে পারি। আমার নাতনীর বাচ্চা হবার সময় হয়ে এসেছে: একবার হাসপাতালে যেতে হবে।"

রমাপতিদা ফিরে আসবার পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এই যে শুনেছিলাম আমেরিকায় পারিবারিক টান কমে যাচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা নিজেদের ধান্ধায় থাকে, বাবা-মার খবরাখবর করে না!"

রমাপতিদা বললেন, "বুঝছি এখানকার বস্তি-জীবন সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান হয় নি। এখানকার এই গরীব নিগ্রো পরিবার সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিয়ে যাও, তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলে যাবে। বুঝবে ভারতবর্ষের গরীবদের সঙ্গে এ দেশের গরীবদের কী তফাত।"

রমাপতিদা নিজেই আমার সঙ্গে রিসার্চ স্কলার ঝর্না দাশগুপ্তের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ঝর্না ওই শহরেই থাকে এবং মিসেস্ উডফোর্ডকে ভালভাবে চেনে।

"ওঁর সঙ্গে আপনার এতো আলাপ হলো কী করে?" আমি ঝর্নার কাছে জানতে চাই।

ঝর্না বললো, "ওঁদের বস্তিতেই তো আমরা এখন বেশী সময় কাটাচ্ছি।"

"ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা ফাঁকি দিয়ে এখন পাড়া বেড়াচ্ছেন নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম [illegible] তখন আমরা কয়েকজন

ঝর্না বলেছিল, "মোটেই না। ইউনিভার্সিটিই আমাদের এখানে পাঠাচ্ছে। মস্ত একটা বস্তিতে আমাদের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা সমীক্ষা চালাচ্ছে—এখানকার প্রত্যেকটা পরিবারের জীবন-ধারা সম্পর্কে আমরা খবরাখবর যোগাড় করছি।"

"তাতে আপনাদের লাভ?" আমি জানতে চেয়েছিলাম।

ঝর্না বলেছিল, "অনেক লাভ শংকরবাবু। দেশের বিভিন্ন ধরনের মানুষরা কেমনভাবে আছে, কী তাদের ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা তা যদি না জানা থাকে তা হলে একদিন অকস্মাৎ বিস্ফোরণ হবে। এবং তখন সব কিছুই আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জানতে হবে।"

কথাগুলো ঝর্না যে স্বদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলছে তা আমার বুঝতে বাকি রইলো না।

ঝর্না বললো, "পারিবারিক খবর জানার নানা পন্থা আছে। খাতা কলম নিয়ে একদিন দেখা করে কিছু প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করার একটা রেওয়াজ আছে। কিন্তু আমরা দেখছি, এইভাবে সব সময় পারিবারিক চিত্রটা পুরোপুরি পাওয়া যায় না। তাই এখন আমরা প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট কয়েকটি করে পরিবারের সঙ্গে ভাব-সাব রাখছি। আমরা মাঝে-মাঝে এদের বাড়িতে যাই; কথাবার্তা বলি, এদের সঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটাই। তারপর বাড়ি ফিরে এসে কিছু কিছু ঘটনা নোট করে ফেলি। প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটা করে ফাইল আছে কিছুদিন পরে দেখা যায়, টুকরো টুকরো দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলো জুড়ে-জুড়ে সমাজের নিচুতলার বেশ অন্তরঙ্গ একটা ছবি পাওয়া যাচ্ছে।"

"স্কুলে স্কুলে বই মুখস্থ না করে, আপনারা জীবনের পাঠশালা থেকে সোজাসুজি পাঠ নিচ্ছেন, এটা খুবই আশার কথা," আমি বলি। "একদিন হয়তো আমাদের দেশে ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের জন্যে এইভাবে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা হবে। তখন আমাদের ছেলেমেয়েরা জানবে পৃথিবীটা কেমনভাবে চলছে, তারা কিছুতেই

আর টুকে পাস করতে চাইবে না; কারণ বই থেকে টুকবার অবকাশই ছাত্রছাত্রীদের থাকবে না।"

ঝর্না বলেছিল, "আমরা যে সমীক্ষাটা চালাচ্ছি, তা আরও মজার হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, বছর আষ্টেক আগে এই জায়গায় আর একদল ছাত্রছাত্রী ঠিক একই ধরনের সমীক্ষা চালিয়েছিল। ফলে আট বছর আগে এবং পরের ছবিগুলো তুলনা করা যাচ্ছে এবং বোঝা যাচ্ছে মানুষগুলো কোনদিকে চলেছে।"

ঝর্নার সঙ্গে বেরিয়ে একদিন এই গরীবদের বস্তি দেখে এলাম। বস্তি বলতে আমাদের চোখের সামনে যে-দৃশ্য ভেসে ওঠে তার সঙ্গে মার্কিনী বস্তির ঠিক মিল হয় না। কারণ এখানকার বাড়িগুলো পাকা এবং তিনতলা। প্রত্যেক বাড়িতে আলো, জল এবং পায়খানা আছে, যদিও ভীষণ নোংরা অবস্থায় রাখা হয়েছে এই বাড়িগুলো। ঢুকতে গেলে দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবার অবস্থা। চাঁপার মায়েদের বস্তিও নোংরা, সামনে খোলা নর্দমা ভটভট করছে, কিন্তু ঘরগুলোর ভিতর এবং উঠোনটা যথাসাধ্য পরিষ্কার।

ঝর্না যে-বাড়িগুলো দেখালো সেগুলো যে অনেকদিন মেরামত হয় নি তা দেখলেই বোঝা যায়। কমন প্যাসেজের সিঁড়ির সামনে যার যা-খুশী ফেলে রেখেছে···ভাঙা রেফ্রিজারেটর, পুরনো প্যাকিং-বাক্স, টিন ইত্যাদি কোণে কাণে জড় হয়ে রয়েছে। সে-বিষয়ে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের একটুও মাথাব্যথা নেই। এইসবের মধ্যে যে প্রচুর ইঁদুর বসবাস করছে তা আমি বাজী ধরে বলতে পারি।

"এ এক আশ্চর্য জগৎ," ঝর্না বলেছিল। "আমাদের দেশের গরীবদের মধ্যে এমন পরিবেশ খুঁজে পাবেন না। আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি তিনটি বাচ্চার মধ্যে দুটি বাচ্চা এখানে বাবা এবং মা উভয়ের সান্নিধ্য পায় না।"

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম।

ঝর্না বললো, "ওই যে মিসেস্ উডফোর্ডকে দেখলেন, ওঁরা তিন

নাতনীরা। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার—এঁদের কারুরই বিয়ে হয় নি, অথচ ছেলেপুলে হয়ে যাচ্ছে।”

ঝর্নার মুখেই শুনলাম, ছেলেদের মতো মেয়েরাও এখানে বারো তেরো বছর বয়স থেকে মাস্তান হয় এবং দল বেঁধে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মিসেস্ উডফোর্ডের নাতনী জোন এমনি এক মাস্তান দলে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়।

এইসব মেয়ে-দলের সঙ্গে আবার ছেলে মাস্তানদের পরিচয় থাকে। যে ছেলে-মাস্তানের দু'চারটে মেয়ে-বান্ধবী নেই বন্ধুমহলে তার প্রেসটিজ থাকে না। যে-ছোকরা মেয়েমানুষদের হাঙ্গামায় যেতে চায় না সে বন্ধুদের চোখে ছোট হয়ে যায়। দলের বন্ধুরা চায়, মেয়ে পটাবার ক্ষমতা যে তোমার আছে তা হাতে কলমে দেখাও। মেয়েদের মন জয় করতে না-পারলে তারা 'থ্যাক্-থু' করবে, আর মেয়েরাও অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফিকফিক করে হাসবে।

ঝর্নার মুখে শুনলাম, এই অবৈধ সম্পর্ক মিসেস্ উডফোর্ডের নাতনীকে মোটেই চিন্তিত করে না। তার বক্তব্য, "সমর্থ মেয়েমানুষের দিকে পুরুষমানুষের নজর তো পড়বেই! কুমারী থাকার জন্যে তো ঈশ্বর মেয়েদের পৃথিবীতে পাঠান নি।" জোন এবং তার দলের বান্ধবীদের কাছে সেক্স একটা খেলার মতো। তারা জানে, পুরুষমানুষরা দেখা হলেই পটাবার চেষ্টা করবে এবং তাদের একটু লাই দিলেই বিছানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে। এ-বিষয়ে তাদের যা আপত্তি সেটা নৈতিক কারণে নয়, 'আমাকে বোকা বানিয়ে মজা লুটে গেলো', বা 'গোলমালে না পড়ি' এই জন্যে।

ঝর্নার কথাবার্তা শুনে আমি তো তাজ্জব। আমাদের দেশের চাঁপার মায়েরা এদের তুলনায় দেবী। দারিদ্র্য ছাড়া অন্য নোংরামি তাদের এইভাবে গ্রাস করে নি। সামান্য খেতে পরতে পেলেই তারা ধন্য হয়ে যায়।

ঝর্না বললো, "এ-দেশে নিচুতলার নিচু মানুষদের নিয়ে অনেক [illegible] একটা রিপোর্ট আপনাকে দেবো।"

"বাবা-মা'রা ছেলেমেয়েদের বাধা দেন না?" আমি জানতে চাই।

"দেন, কিন্তু শোনে কে? তাঁরা অবশ্যি অস্বস্তি বোধ করেন, কিন্তু বেশী ভয় পান না। তাঁরা বলেন, আমরা আর এ-ব্যাপারে কী করতে পারি? মাঝে মাঝে তাঁরা ছেলেদের উপদেশ দেন, খুব সাবধান না হলে কিন্তু নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে হবে।"

জোনের কথা আরও জানবার চেষ্টা করি। কারণ ওরই সমবয়সী লক্ষ্মীকে আমি ভালভাবে জানি। বেচারা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে, আর মুখ বুজে মা এবং দিদিমাকে বাসন মাজার কাজে সাহায্য করে। পৃথিবীতে জন্ম নিয়েই সে যেন এক মহা অপরাধ করে ফেলেছে এমন সদাশঙ্কিত ভাব। চাঁপার মা দুঃখ করে বলেন, "এ মেয়েকে যে কী করে পার করবো! টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি কিছুই নেই। একেবারে জলে ফেলে দিতে হলেও আজকাল আড়াই শ' টাকা লাগে। বন্ধক দেবার মতো একটা জিনিসও নেই।" আমার মা আশ্বাস দিতেন, "নামে লক্ষ্মী, কাজে লক্ষ্মী। কিছু চিন্তা কোরো না। ওপরে ঈশ্বর আছেন। তোমরা একটি ভাল ছেলে দেখো। তেমন অসুবিধে হলে আমাদের বাড়ি থেকেই মেয়ে দেখিও।"

ঝর্না বললো, "জানকে যদি লক্ষ্মীর কথা শোনাই, তাহলে আমাকে পাগল ভাববে। এখানকার মাস্তান মেয়েরা তো ছেলে পাকড়াও করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব! কারণ সে যে আকর্ষণীয়া এবং 'সমর্থ' মেয়েমানুষ তার প্রমাণ দিতে চায় বান্ধবীদের কাছে। কিন্তু তা বলে বিছানা-প্রক্রিয়াটা সবার সঙ্গে নয়। মাত্র কয়েকজনের সঙ্গে— যাদের ভাল লেগেছে এবং যারা ভয় দেখিয়ে কাবু করেছে। কথা না শুনলে, অনেকে খুন জখম করবে কিংবা মুখ পুড়িয়ে দেবে ভয় দেখায়।"

"এই ভয়েই তো আমরা তিন-চারজন বান্ধবী এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াই," জোন বলেছিল। "যখন অনেকদিন ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয় না তখন কিন্তু মন খারাপ হয়ে যায়। তখন আমরা কয়েকজন

ছোকরাকে ফোন করি এবং এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলি যে ওদের না এসে উপায় থাকে না। ওদের আবার গাড়ি আছে। গাড়ি চড়তে আমার খুব ভাল লাগে।"

জোন বললো, "কোনো ছোকরা যদি বেশী ছটফট করে, তাকে সামলাবার জন্যে আমি ঠাণ্ডা মেরে যাই। তোমার তো অন্য গার্ল ফ্রেণ্ড আছে, এই বলে সম্পর্ক ভেঙে দিই। অন্য মেয়েরাও তখন আমাকে সাপোর্ট দেয়।"

"বিয়ে-থা?" আমি ঝর্নার কাছে জানতে চেয়েছিলাম।

ঝর্না বলেছিল, "শংকরবাবু, এদের সঙ্গে আপনি দিন পনেরো থেকে যান—একটা উপন্যাসের উপকরণ পেয়ে যাবেন। নিচুতলার মানুষগুলোর সমস্যা জানতে পারলে পুরো সমাজটাকে বোঝা আপনার পক্ষে অনেক সোজা হবে।"

একটু হেসে ঝর্না বলেছিল, "আপনার চাঁপার মা সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে নাতনীর বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না। আর এখানে বাবা মা, নায়ক নায়িকা কেউ বিয়ের কথা তুলতে চায় না। বিয়ের নাম শুনলে সবাই আঁতকে ওঠে।"

এরা বলে, বিয়েটা হলো রেসপনসিবিলিটি উইদাউট রিওয়ার্ড—বিয়ের মন্ত্র পড়ার পর শুধু দায়িত্ব আছে, কোনো মজা নেই। ছেলেদের কাছে বউ মানেই বিপদ—সংসারে টাকাকড়ি ছাড়ো, সাবধানে থাকো, বউ-এর কথায় ওঠো বসো। মেয়েরাও মোটেই বিয়েতে লালায়িত নয়। কারণ বিয়ে মানেই দিদিমা এবং মায়ের পরিচিত সংসার ছেড়ে অন্য এক অপরিচিত পরিবেশে গিয়ে ওঠো। দিদিমা এবং মায়ের বাড়িতে অগাধ স্বাধীনতা, যখন খুশী বাড়ি ফেরো, যার সঙ্গে খুশী ঘুরে বেড়াও। বিয়ে করলেই কোমরে শেকল পরতে হবে। কোনো ছোকরার সঙ্গে কথা বললেই, স্বামীর কাছে উত্তর দাও। তাছাড়া, বর খাওয়াবে কিনা কে জানে! চারদিকে তাকিয়ে জোন যা দেখছে! খুব কম বেটাছেলেই নিয়মিত সংসারে টাকা দেয়। দায়িত্বহীন একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে লাভ কী?

"বিয়ে যদি করতেই হয়, কেমন স্বামী তোমার পছন্দ," জোনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

দাঁত দিয়ে নিজের নখ কাটতে কাটতে কৃষ্ণকুমারী জোন বলেছিল, "এমন স্বামী যে রান্নাবান্না করবে এবং সংসারের সমস্ত কাজের দায়িত্ব নেবে। যার অনেক টাকা থাকবে এবং যে রোজ সন্ধ্যাবেলা মজার মজার জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে।"

ছেলেরাও বলে, "বিয়ের মধ্যে উৎসাহজনক তেমন কিছু নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারো, বিছানায় রেগুলার একটা মেয়ে পাওয়া গেলো যার জন্যে মারামারি কাটাকাটি করতে হবে না। মাস্তান দলের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কারণ, দলের লোকরা কোনো বিশেষ মেয়ের প্রতি কেউ খুব গদ্‌গদ্ হয়ে পড়ে তা পছন্দ করে না।"

জোনের বক্তব্য: "ছেলেদের তোমরা জানো না। এক একটি শয়তান। এই তো আমাদের বান্ধবী মার্থা বিয়ে করলো ডেভিডকে। ওদের আগেই ছেলেপুলে হয়েছিল। ডেভিডের তখন চাকরি আছে। ওর ব্যক্তব্য, টাকা যখন আনছি তখন আবার বাড়ির কাজ করবো কেন? ওসব বউ বুঝুক—ছেলে সামলাক, আমার সেবা করুক। বেচারা মার্থা তাই করছিল। কিন্তু কত দিন লোকটা সংসারে টাকা দিয়ে যাবে কে জানে? এরকম দেবতা স্বামী আর ক'টা আছে? বেচারা মার্থা তাই একটা চাকরি যোগাড় করেছে। ডেভিড অমনি সংসারখরচের টাকা কমিয়ে দিয়েছে। ওর প্রাণের ইচ্ছে, বউ সংসারে টাকা ঢালুক, আর আমি আমার টাকায় বাইরে ফুর্তি করি।"

হি হি করে হেসে উঠলো জোন। বললো, "এখন চাকা ঘুরে গিয়েছে। এখন মার্থাই ডাণ্ডা ঘুরোচ্ছে।"

ব্যাপারটা যা জানা গেলো, ডেভিড যে-দোকানে চাকরি করতো সেখানে একটু গোলমাল হয়। একদিন ডিউটি সেরে ডেভিড বেরুতে যাচ্ছে সেই সময় মালিকের ছেলে বললো 'আধঘণ্টা থেকে যাও।' ডেভিড মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, 'ওভার-টাইম চাই।' মালিক

পুত্র বলেছিল, 'অত আব্দার সয় না। যদি কাজ পছন্দ না হয়, আমার পাছায় চুমু খাও!' তারপর যা হয়—রাগারাগি, কথা কাটাকাটি এবং চাকরি খতম। মার্থা এখন সুযোগ পেয়েছে। স্বামী বেকার হওয়ামাত্রই স্বামীসেবা বন্ধ। ঘরদোর সামলানো, ছেলে ধরা এবং রান্নাবান্নার সব কাজ ডেভিডের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। স্বামী মহারাজ রেগেমেগে কয়েকদিন বাড়ি থেকে উধাও হয়েছিল। নিশ্চয় কোনো পার্ট-টাইম কাজে কিছু ডলার কামিয়ে নিয়েছে। টাকা ফুরনো মাত্র আবার সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে এসেছে। মার্থাও প্রতিশোধ নিচ্ছে। মাইনে পেয়ে একদিন বাড়ি ফেরে নি, বাইরে ফুর্তি করে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া, বোনের সঙ্গেও পরামর্শ করেছে মার্থা। সে বুদ্ধি দিয়েছে, যতদিন মিন্‌সে রোজগার করবে না, ততদিন ওর সঙ্গে এক বিছানায় শোবার কোনো প্রয়োজন নেই।

জোনের মায়ের খবরাখবরও ঝর্না রাখে। মিসেস্ উডফোর্ড কাউকে বিয়ে করেন নি। তাঁর মেয়েও কাউকে বিয়ে করে নি। মেয়ের মেয়েদের নিয়েই এখন সমস্যা। দিদিমা অনেক সাবধান করে দিয়েছিলেন নাতনীদের। ছেলেদের সঙ্গে বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়ানোর ঝুঁকি কতখানি তাও অনেকবার বুঝিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যা হবার তাই হলো। পনেরো বছরের জোন মা হতে চলেছে খবরটা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লো না। যদিও মা, দিদিমা এবং মায়ের ফেভারিট বয় ফ্রেণ্ড বললেন, "ব্যাপারটা না-হলেই ভাল হতো।" যেমন বাবা মায়েরা ভয় পান ছেলের হাম-বসন্ত হতে পারে—কিন্তু হলে কী আর করা যাবে?

জোনের নিজের তেমন চিন্তা নেই। বাচ্চা সম্বন্ধে তার আপত্তি নেই, যদি না বান্ধবীদের সঙ্গে টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোর অসুবিধে হয়।

ঝর্না বললো, "ছেলে হবার পরেই তো জোন জাতে উঠবে।

কুমারীত্ব নিয়ে তাকে অযথা আর মাথা ঘামাতে হবে না। এবার থেকে প্রাণ যা-চাই তাই করতে পারবে। বাচ্চার জন্যে ওয়েলফেয়ার থেকে সরকারী টাকা পাওয়া যাবে।"

"বাড়ির অবস্থা কী?" আমি ঝর্নার কাছে জানতে চাই।

"বাড়ির প্রধান মিসেস্ উডফোর্ডকে আপনি তো চেনেন। চারটে পাঁচটা বাড়িতে ঝি-গিরি করেন এবং সংসার সামলান। এঁর ছেলে টম বাইরে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে সপরিবারে হাজির হয়ে মায়ের ঘাড়ে থেকে যায়। মাকে একটা পয়সা ঠেকায় না। দায়িত্বটা সবই যেন বেচারা মায়ের। যাবার সময় মাকে ফাঁসিয়ে গিয়েছে। আশি ডলারের ট্রাঙ্ককল বিল ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। ছেলে কখন যে লুকিয়ে লুকিয়ে ট্রাঙ্ককল করেছে তা মিসেস্ উডফোর্ড বুঝতে পারেন নি। পারলে, ছেলেকে ঘাড় ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বার করে দিতেন।"

মেয়ে প্যামেলা ড্রাগ স্টোরে কাজ করে। তিনটি অবৈধ সন্তানের জননী। জোন এর মধ্যে দ্বিতীয়া ছোটটিও মেয়ে, বয়স বছর বারো। বড় মেয়ে আগাথার ইতিমধ্যে দুটি অবৈধ সন্তান হয়েছে। তারা এই বাড়িতেই থাকে। বাড়িতে হৈচৈ লেগেই আছে। বাড়ির দ্বার অবারিত। কত রকমের লোক আসছে যাচ্ছে। একেবারে পুঁচকে নাতি দুটোর সমবয়সী বন্ধুরা আসছে, জিনিসপত্র ভাঙছে। এইসব বাচ্চারা নিজের খেয়ালেই থাকে—এদের বেশী দেখাশোনা করতে হয় না।

ঝর্না বললো, "এরা আমাদের দেশের বস্তির বাচ্চাদের মতোই দোকানে ছুটছে টুকিটাকি জিনিস কিনতে বাঁ হাতে নাকের সিকনি মুছছে। বাড়িতে বড়রা কেউ না থাকলেও এরা ভয় পায় না—প্রায়ই দরজা বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে খেলাধুলো করে, খাবার সময় খাবার নিয়ে খায়, নিজেরাই সময় মতো ঘুমিয়ে পড়ে।"

বাড়িতে আর যারা আসা-যাওয়া করে তাদের মধ্যে রয়েছে

ফ্রেণ্ড এবং ছোটবোনের বয় ফ্রেণ্ড যখন খুশী বাড়িতে ঢুকে পড়ে। মায়েরও বয় ফ্রেণ্ড আছে—তবে সংখ্যায় কম। তাঁদের বয়সও বেশী। মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে যান; কিংবা পাশের ঘরে সরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেন। শুধু দিদিমার কেউ খোঁজখবর করে না—পাশের ফ্ল্যাটের বুড়ী বান্ধবী মিসেস্ এলিস ছাড়া। ওঁদের দু'জনে দেখা হলে শুধু সংসারের কথাবার্তা হয়। কত কষ্ট করে কীভাবে যে মেয়ে এবং নাতি নাতনীদের দেখাশোনা করছেন তা নিয়ে আলোচনা হয় অথচ কেউ তাঁদের কথা শোনে না। সবাই যে যার তালে রয়েছে।

তার জন্যে মিসেস্ উডফোর্ডের কোনও অভিযোগ নেই। "এই তো প্রকৃতির নিয়ম। ওদের বয়স কম। এখনও 'শরীর' রয়েছে, ওরা জীবনকে একটু উপভোগ করে নেবেই তো।" ওদের যাতে বেশী কষ্ট না হয়, তা দেখবার জন্যেই তো মিসেস্ উডফোর্ড রয়েছেন। ওদের দেখাশোনার মধ্যে কষ্ট আছে, কিন্তু আত্মতৃপ্তিও খুঁজে পান বৃদ্ধা মিসেস্ উডফোর্ড। বড়লোক সাদা বুড়ীগুলোর মতো একলা একটা বিরাট বাড়িতে চেক বই নিয়ে পড়ে থাকার চেয়ে এ-জীবন ঢের ঢের ভাল, অন্তত মিসেস্ উডফোর্ড তাই বিশ্বাস করেন।

ঝর্না আরও বলেছিল, "জোন সন্তানসম্ভবা হবার পরে ওদের নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছিল।"

জোনের মা প্রথমে বেশ বকুনি লাগিয়েছিলেন মেয়েকে। মেয়ে কিছুই বলে নি।

দিদিমা বলেছিলেন, "আহা, প্রথম মা হতে চলেছে, শুধু শুধু বকছো কেন?"

দিদিকে বকুনি খেতে দেখে ছোট বোন ফিকফিক করে হাসছিল। সেই না দেখে বেজায় চটে উঠেছিল জোন। বলেছিল, দাঁত বার করে হাসছো কি? সামনের বছরে এই রকম সময়ে তোমারও একই অবস্থা হবে।"

সেদিকে মোটেই নজর নেই। দিদিমাকেই ছুটতে হলো ওদের সামলাবার জন্যে। মা বললেন, "খুকী, তোর মতো কুঁড়ে মেয়ে একটাও নেই পৃথিবীতে। কাজ না করে গতরে যে মরচে পড়ে গেলো।"

মেয়ে রেগে বললো, "বেশী গ্যাজর-গ্যাজর কোরো না।"

"করবো বই কি, হাজারবার করবো। মুরোদ তো কত জানা আছে। বাচ্চাদের বাপদের কাছ থেকে একটা পয়সাও তো আদায় করতে পারিস না।"

মেয়ে তেড়েমেড়ে উঠলো—"বেজন্মা হয়েছে বলেই তো ওয়েলফেয়ার থেকে চেক আসছে।"

"তবে আর কী! মাথা কিনে নিয়েছিস!" মা গজগজ করতে লাগলেন।

"মুখ যদি না সামলাও, তাহলে ছেলেদের বাপের কাছেই চলে যাবো। মিন্‌সে যদি বেশী ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করে, তাহলে কোর্টে কেস করে আমাকে নিতে বাধ্য করবো," মেয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

দিদিমা এতোক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমরা যেখানে খুশী যেতে পারো, কিন্তু বাচ্চারা আমার কাছে থাকবে।"

এরপর জোন সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছিল। জোনের পেটে যে সন্তান এসেছে তার বাবা কে এটা ঠিক করে নিতে হবে। কুমারী মায়ের গর্ভবতী হবার মধ্যে তেমন কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু কে এই সন্তানের জনক তা না জানা খুবই অসামাজিক এবং লজ্জাজনক! জোনের ইচ্ছে বিলকে এই সম্মানটা দেয়। বিল জোনের থেকে বয়সে বড়। যদিও বিল বিবাহিত, তবু ডাইভোর্স হলে জোন তাকে বিয়েও করতে পারে। পলকেও জোন ছেলের বাবা হিসেবে নির্বাচন করতে পারে। নির্ধারিত সময়ে তার সঙ্গেও জোনের দেহ-সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পল তার থেকে এক বছরের ছোট। আর পলকে তত ভাল লাগে না জোনের।

পল অবশ্য খবরাখবর নিচ্ছে। বাবা হতে তার আপত্তি নেই। এইটাই হবে তার প্রথম সন্তান। ছেলের বাপ হলে মাস্তানদের মধ্যে সে জাতে উঠবে। তাছাড়া জোনের ওপর তার একটু স্পেশাল অধিকারও জন্মাবে।

নিচু তলার এই নিচু নাটকের সঙ্গে পরিচয় ছিল না বলেই বোধহয় আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

ঝর্না বললো, "কী ভাবছেন?"

"ভাবছি, এই সমাজের শেষ পর্যন্ত হবে কী? আর জোনের অনাগত সন্তানের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত কে নেবে?"

"প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না। দ্বিতীয়টা বলে দিতে পারি। এই অনাগত সন্তানের জন্যে চিন্তা অন্য কারও নয়, সমস্ত দায়িত্ব বেচারা মিসেস্ উডফোর্ডের। তিনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ এই কুৎসিত সভ্যতার নীল বিষ তিনিই গ্রহণ করবেন। তাঁর তো নিজস্ব কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। মেয়ে, নাতনী, নাতনীর সন্তান—তাদের সুখী রেখে যেতে পারলেই তাঁর আনন্দ। তিনি বলেন, "ওদের বয়স কম, তাই শরীরের নেশায় পাগল হয়ে রয়েছে। বয়স বাড়লে ওরা আমার মতো শান্ত হয়ে যাবে, আমারই মতো তখন ওরা নিজেদের নাতি-নাতনীদের জন্যে চিন্তা করবে।"

আমি আর কিছু বলি নি। কিন্তু আমার চোখের সামনে চাঁপার মা এবং মিসেস্ উডফোর্ডের ছবি বারবার এক সঙ্গে ভেসে উঠছিল।

চাঁপার মা ও মিসেস্ উডফোর্ডের মতোই আর একটি আশ্চর্য জোড় আমার দিদিমা ও মিসেস্ জেনিংস।

আমেরিকা ভ্রমণে এসে যে ক'জন মানুষের সঙ্গে আমার দীর্ঘস্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল মিসেস্ জেনিংস নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতমা। মিসেস্ জেনিংস আমাকে সিয়াট্ল শহর ঘুরে দেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এক পলকের সেই দেখা থেকে আমরা দু'জনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। দু'জনে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। ভাব হবার একটা কারণ, মিসেস্ জেনিংসকে দেখেই দিদিমার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

এখন থেকে অনেকদিন আগে ১৯০৫ সালে হুগলী জেলার রঘুনাথপুর গ্রামে এবং মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার ওমাহাতে দুটি ফুটফুটে ফর্সা মেয়ে প্রায় একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। একজনের নামকরণ হয়েছিল গোলাপসুন্দরী, আর একজনের রোজালিণ্ড।

গোলাপসুন্দরী যথাসময়ে, অর্থাৎ চোদ্দবছর বয়সে, ঘটকের মাধ্যমে পাত্রস্থ হয়েছিলেন ভদ্রকালীতে। পাত্র আমার মায়ের কাকা শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদিমা ভীষণ মা-কালীর ভক্ত। তাই এখনও দুঃখ করে বলেন, "এমন কপাল করে এসেছিলুম যে চোদ্দ বছর বয়স থেকে মায়ের নাম করাও বন্ধ হলো।" কলকাতার কালীঘাটে যেতে হলে দিদিমাকে জিভ বার করে কালীঠাকুরের পোজ দেখিয়ে বলতে হতো, "অমুকের" ঘাটে যাচ্ছি।

মিসেস্ জেনিংসকে দিদিমার এই ব্যাপারটা বলেছি। মিসেস্ জেনিংস বিশ্বাস করেন নি। বলেছেন, "ডোন্ট কিড মি। অর্থাৎ

মেয়েদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়—সেই নাম তোমার দিদিমা বাদ দেবেন কেন?" তারপর মিসেস্ জেনিংস যা বলেছিলেন তার অর্থ হলো, "ওঁদের দাম্পত্যজীবনে তাহলে নিশ্চয় কোনো গোলমাল এসেছিল।"

এই সন্দেহের ব্যাপারটা দিদিমার কাছে রিপোর্ট করি নি। করলে কী ধরনের বিস্ফোরণ হতো তা আমার জানা আছে। কিন্তু দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছি, "স্বামীর নাম করতে আপত্তি কী?"

দিদিমা বলেছেন, "তোমাদের আর কী, বলেই খালাস। আর আমি স্বামীর নাম মুখে এনে নরকে গিয়ে ভাজা-ভাজা হই।"

আমি মিটমিট করে হেসে বলেছি, "কিন্তু দিদিমা, তুমি যে রেগে আমার দাদুকে মিন্‌সে বলো, তার বেলায়?"

দিদিমা তেড়ে-মেড়ে বিছানার ওপর উঠে বসেন। "মিন্‌সেকে হাজার বার মিন্‌সে বলব। লজ্জা করে না? অনাথা মাগকে ফেলে কেটে পড়লি। তোর আর কি, ওখানে বসে স্বর্গসুখ ভোগ করছিস, আর আমি থান কাপড় পরে কাঁচকলা সেদ্ধ খেয়ে সংসারের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছি।"

কম বয়সে দুটি মেয়ে আর দুটি ছেলে নিয়ে দিদিমা বিধবা হয়েছিলেন। দাদুর একটা ম্লান অস্পষ্ট ছবি দেওয়ালে টাঙানো আছে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে দিদিমা বলেন, "দাঁড়াও মিন্‌সে, তোমার সুখের দিন শেষ হয়ে এসেছে। একবার গিয়ে পৌঁছুই, তখন হাড় ভাজা-ভাজা করে ছাড়বো।"

দিদিমার এ-গল্পও মিসেস্ জেনিংসকে বলেছি। মিসেস্ জেনিংস বুঝে উঠতে পারেন নি। তখন আমাকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে, "দিদিমার বিশ্বাস, বিয়েটা জন্ম-জন্মান্তরের। কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পরজন্মে আবার গোলাপসুন্দরীর খপ্পরে পড়বেন, তখন দিদিমা শোধ তুলবেন।"

মিসেস জেনিংসকে বলেছি, "দিদিমা থানকাপড় ছাড়া পরেন না,

অমাবস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদির নাম করে মাসের অর্ধেক দিন উপবাসী থাকেন।" মিসেস্ জেনিংস দুঃখ করে বলেছেন, "পুওর গোলাপ সুনডারি। লাইফের সাধারণ সুখ থেকে তোমার দিদিমা নিজেকে বঞ্চিত করতে গেলেন কেন?"

মিসেস্ জেনিংস নিজেকে বঞ্চিত করেন নি। আঠারো বছর পর্যন্ত বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারপর বিয়ে করেছেন পছন্দসই এক ছোকরাকে। মিসেস্ জেনিংস আমার কাছে গল্প করেছেন, "তখন কিন্তু আমাদের চরিত্র বলে একটা জিনিস ছিল। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো সেক্সটাকে আমরা ডাল-ভাত করে ফেলি নি। আমার নাতনী বিশ্বাসই করে না যে, বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবার আগে জনের সঙ্গে আমি বিছানায় যাই নি।"

দেশে ফিরবার পরে আমার কাছে এই গল্প শুনে দিদিমা মাথা চাপড়াতে শুরু করেছেন। "ওরে আমার সতীসাধ্বী রে!" তারপর জিজ্ঞেস করেছেন, "সায়েবদের দেশে সব মেয়েমানুষই কি তাহলে বেশ্যা হয়ে গিয়েছে? কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওদেশে তো যীশুকেষ্ট নাম নিয়ে জন্মেছিলেন!"

দিদিমাকে ঠাণ্ডা করাতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। বলেছি, "ছি ছি দিদিমা, সবাই বেশ্যা হতে যাবে কোন দুঃখে? বেশ্যাকে ওরা আমাদের থেকে কম ঘেন্না করে না। তবে যস্মিন দেশে যদাচার!"

"তা বলে বিয়ের আগে স্বামীর বিছানায় যাবে? কী লজ্জার কথা গো!"

"দিদিমা তোমার পবিত্র বিয়ের কথা মিসেস্ জেনিংসকে বলেছি। সমস্ত খুঁটিনাটি শুনে তাঁর তো আঁতকে উঠে ফেণ্ট হবার অবস্থা।"

"কেন?" হাওড়া হাট থেকে কেনা টকটকে লাল রংয়ের গামছা পরে স্নান ঘরে ঢুকবার মুখে দিদিমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছেন।

"মিসেস্ জেনিংস ভয়ে শিউরে উঠে বলেছিলেন, একটা অজানা-

বলার পরই আমার শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে সে দরজা বন্ধ করে দেবে! কিছু মনে কোরো না, এটা তোমার কাছে অশ্লীল মনে হচ্ছে না? এ-দেশের কোনো মেয়ে এই অবসিনিটি সহ্য করবে না।"

দিদিমার উত্তর পেতে দেরি হলো না। "স্বামীর সঙ্গে ফুলশয্যা হবে, তাতে অশ্লীলতা কী? আ মলো যা!"

রোজালিণ্ড এবং গোলাপসুন্দরী দু'জনেরই জীবনে বিয়ের পর নানা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এই এতোদিন পরে সে-সবের পুনরাবৃত্তির করে লাভ নেই। দিদিমাও ছেলেপুলের মা হয়েছেন, মিসেস্ জেনিংসেরও ছেলেমেয়ে হয়েছে। তফাতের মধ্যে দিদিমার একটা বিয়ে, মিসেস্ জেনিংসের দুটো। প্রথমে নাম হয়েছিল রোজালিণ্ড ব্রাউন। তারপর বিধবা মিসেস্ ব্রাউন বিয়ে করলেন মিস্টার জেনিংসকে।

"একটা বিয়ের পর আবার বিয়ে! মরণ আর কি!" দিদিমা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলেন।

দিদিমা যে দাদুর দ্বিতীয় পক্ষ তা কারুর অজানা নয়। বললুম, "বউ মরে গেলে দ্বিতীয় পক্ষ করতে যদি দোষ না হয়, তা হলে বিধবা বিয়েতে আপত্তি কী?"

দিদিমার উত্তর, "সব ব্যাপারে পুরুষমানুষদের সঙ্গে মেয়েমানুষের তুলনা চলে না, ভাই। এমনিভাবে রেষারেষি করলে, কোন দিন মেয়েরা বলে বসবে, পুরুষমানুষ যখন পেটে ছেলে ধরে না, তখন আমরাও গভ্যযন্তন্না ভোগ করবো কেন?"

দিদিমার বক্তব্য শুনে মিসেস্ জেনিংস লিখেছিলেন, "তোমাদের দেশের মেয়েরাও তো হিউমান বিয়িং। তুমি কী বলতে চাও, স্বামীর মৃত্যুর পর তোমার দিদিমার মনে কখনও বিবাহিত জীবনের সুখ ফিরে পেতে ইচ্ছে করে নি?"

এই প্রশ্ন দিদিমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছি। দিদিমা আমাকে একটু আস্কারাও দেন। আমার প্রশ্ন শুনে বলেছেন, "বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে বৈকি। বে হবেও শিগ্‌গির। তোরা এসে কত

পড়বে। খোকা পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করবে—মাথাটা শুধু কামানো থাকবে এই যা। যমের সঙ্গে বে হবে।"

মিসেস্ জেনিংস আমাকে বলেছেন, "জীবনটাকে যতটা পেরেছি এন্‌জয় করে নিয়েছি। কানাডা, ইয়োরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ঘুরেছি। শুধু ইণ্ডিয়ার তাজমহল দেখতে পেলেই আর কোনো দুঃখ থাকতো না। সেই সঙ্গে দিল্লীর মতিমহলে তন্দুরী-চিকেন টেস্ট করার ইচ্ছে আছে।"

দিদিমাকে প্রশ্ন করেছি, "দিদিমা তুমি লাইফটা এন্‌জয় করেছো।"

"সে আবার কি জিনিস? লেখাপড়া-জানা ছেলেমেয়েরা আজকাল যে কী সব জিজ্ঞেস করে বসে, বুঝি না।"

দিদিমাকে বোঝালাম, "এন্‌জয় মানে উপভোগ করা। প্রাণ যা চায় সেইসব ফুর্তি করে নেওয়া। মিসেস্ জেনিংস বলেন, এন্‌জয় না করলে মরবার সময় আপসোস হবে। মরেও শান্তি পাওয়া যাবে না।"

দিদিমা রেগে উঠলেন। "কত পাপ করেছিলাম, তাই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে গেলাম। মরবার পরেও যাতে নরকে জ্বলে-পুড়ে মরি, তার ব্যবস্থাও করতে বলছিস? যম যদি শোনে ভাতারখাগী হয়েও সারাজীবন ফুর্তি করেছি, তা হলে আমাকে কোলে করে সগ্‌গে পৌঁছে দেবে, তাই না?"

"কিন্তু দিদিমা, তোমার সব সাধ পূর্ণ হয়েছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

দিদিমা হিসেব করতে বসলেন। "উনি বেঁচে থাকতে কাশী দর্শন করিয়েছিলেন। কেন মিথ্যে বলবো, খোকা আমাকে গয়া, বৃন্দাবন, হরিদ্বার ঘুরিয়েছে। কাছের গোড়ায় বাবা তারকেশ্বর অনেকবার দয়া করেছেন। কলকাতায় 'অমুকের' স্থানও দেখেছি। শুধু বাবা পশুপতিনাথের মাথায় জল ঢালা হলো না। এই একটা ইচ্ছে রয়ে গেলো।"

এঁদের মধ্যে যোগসূত্র। আমার মধ্য দিয়েই এঁরা দু'জনে দু'জনকে জানেন—যদিও কাউকে বুঝে উঠতে পারেন না।

দিদিমা আমার নিজের নয়, মায়ের কাকিমা মাত্র। কিন্তু নিজের দিদিমা অনেকদিন গত হওয়ায়, এই দিদিমার কাছেই আদর-যত্ন পেয়েছি। দিদিমার দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর খোকামামা, অর্থাৎ কিরণচন্দ্র ব্যানার্জী, দিদিমাকে আগলে বেড়ান। রেলের চাকরিতে বদলি হতে হতে খোকামামা এখন আমাদের বাড়ির কাছাকাছি কোয়ার্টার নিয়েছেন। তাই মাঝে মাঝে দেখা হয় এবং দেখা হলেই দিদিমার সঙ্গে গাল-গল্প চলে।

আর আমেরিকায় না গেলে মিসেস্ জেনিংসের সঙ্গে আলাপই হতো না। সুদূর বিদেশে মিসেস্ জেনিংসের অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করে ধন্য হয়েছি। মিসেস্ জেনিংস কত সহজে আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। যেন আমি সত্যিই তাঁর নাতি। সেই থেকে পত্রালাপ আছে। মিসেস্ জেনিংস বড় বড় চিঠি লেখেন, ছবি পাঠান, নানা খবরাখবর দেন। আমিও যতদূর সম্ভব উত্তর দিই।

দেশে ফিরে দিদিমার কাছে বোধহয় মিসেস্ জেনিংসের গল্প একটু বেশীই করেছি। কারণ দিদিমা মুখ টিপে টিপে হেসে বলেছেন, "দেখিস ভাই, প্রেমে-টেমে পড়িস নি তো?"

বললাম, "গার্লফ্রেণ্ড বলতে এতোদিন তুমিই ছিলে, এখন আর একটা হলো।"

"তা কোনটিকে বেশী মনে ধরে?" দিদিমা জিজ্ঞেস করেছেন।

"দু'জন দু'রকম," আমি উত্তর দিয়েছি। "তুমি দিনরাত ঘরের মধ্যে শুয়ে, না হয় বসে থাকো, বড়জোর একটু দরজার সামনে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াও। মিসেস্ জেনিংস দিনরাত টো টো করে ঘোরেন, বাড়িতে প্রায় সবসময় চাবি মারা।"

দিদিমা মুখ কুঁচকে বললেন, "আ মলো যা। বিধবা মাগীকে তোর মামীর মতো পাড়াবেড়ানি রোগে ধরেছে আর কী! সংসার, শাশুড়ী

বউমা-র সমালোচনা একবার আরম্ভ হলে বিপদ। তাই দিদিমাকে অন্য আলোচনায় নিয়ে যাবার জন্য বললাম, "তুমি তো সাদা থান ছাড়া কিছুই পরো না, মিসেস্ জেনিংস কত ঝলমলে স্কার্ট পরেন।"

"কী অনাসৃষ্টি গা!" দিদিমা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। স্বামী-খাগীদের জন্যে ভগবান তো সাদা কাপড়েরই ব্যবস্থা করেছেন।"

"বিয়ের দিনে মিসেস্ জেনিংস সাদা গাউন পরেছিলেন, আমি ছবি দেখেছি," দিদিমাকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

"এ্যাঁ! বে-র দিনে বিধবার সাজ। স্বামীর মুণ্ডু ওই দিনেই চিবিয়ে খায় বুঝি ওরা?" দিদিমা রেগে অস্থির।

দিদিমার জামাকাপড় নিয়েও মিসেস্ জেনিংসের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আমার। এসব বিষয়ে মিসেস্ জেনিংসের ভীষণ আগ্রহ। তিনি নিজে সারাক্ষণ সভ্য-ভব্য জামাকাপড়, মোজা, জুতো, মাথায় জাল ইত্যাদি পরে থাকেন। আর আমার দিদিমা তো আজকাল খালি-গায়ে থাকেন বললেই চলে। পিত্তির প্রকোপটা বেড়েছে, তাই ব্লাউজটাও অনেক সময় গায়ে রাখতে পারেন না। ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার আছে—তাই দিদিমাকে দিনের অনেকটা সময় গামছা পরে কাটাতে হয়। মিসেস্ জেনিংসের স্কার্ট ও দিদিমার গামছার ঝুল প্রায় এক।

মিসেস্ জেনিংসের কাছে এসব কথা বোধহয় আমার খুলে বলা উচিত হয় নি। শুনে তো ওঁর ফেন্ট হবার অবস্থা। বললেন, "জ্ঞানগম্যি হওয়া বয়স্থা মেয়েরাই যখন তোমাদের দেশে এই কাণ্ড করছে, তখন আর আমার নাতনীদের দোষ দিই কী করে—ওরা ব্রা-লেস হয়ে ঘুরে বেড়াবেই তো।" গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন মিসেস্ জেনিংস। বলেছিলেন, "গোলাপ সুনডারি তোমার দিদিমা, সুতরাং আমার বলাটা শোভন নয়—কিন্তু কমবয়সী মেয়েদের সামনে উনি ভালো এগ্জামপল রাখছেন না।"

মধ্যে অহেতুক ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে দেওয়াটা কোনো ভদ্রলোকের কাজ নয়।

তবে মিসেস্ জেনিংসের সৌন্দর্যচর্চা সম্বন্ধে দিদিমাকে পুরো রিপোর্ট দিয়েছি। মার্কেটে বেরুবার আগে মিসেস্ জেনিংস পাকা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে নানা রকম পাউডার, স্নো, লোশন, সেন্ট ইত্যাদির সাহায্যে নিজেকে তৈরি করেন। শুনে দিদিমা বেশ বিরক্ত হয়েছেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছেন, "ষাঁড়ের আবার সাজ!"

ইণ্ডিয়ায় যে ভালো লিপস্টিকের দাম অনেক, তা মিসেস্ জেনিংস কোথা থেকে খবর পেয়েছিলেন। বিপদ বাধালেন আসবার দিনে। বললেন, "তোমার দিদিমাকে এই লিপস্টিক তিনটে দিও, উইথ মাই বেস্ট উইশেস।"

শুভেচ্ছা অবশ্যই পৌঁছে দেবো। কিন্তু লিপস্টিক দিদিমা ব্যবহার করেন না, আমার এই রিপোর্ট পেয়ে মিসেস্ জেনিংস তো বেশ অবাক। পাছে অন্য কিছু ভেবে বসেন সেই জন্যে মিসেস্ জেনিংসকে বলতে হলো, "দিদিমাও সকালে একঘণ্টা ধরে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কসমেটিক্স করেন, তবে নিজের জন্যে নয়। লর্ড কৃষ্ণ এবং রাধাকে স্নান করিয়ে, চন্দন কুনকুম ইত্যাদি দিয়ে সাজান।"

সাহেবরা আজকাল আবার লর্ড কৃষ্ণা সম্পর্কে ইণ্ডিয়ানদের থেকে বেশী খবরাখবর রাখেন। এঁদের নাম শুনেই মিসেস্ জেনিংস লজ্জায় ব্লাশ করেছিলেন। "লর্ড কৃষ্ণা হচ্ছেন তোমাদের প্রেমিকশ্রেষ্ঠ, আমাদের ডন জুয়ান। যিনি অপরের বিবাহিত ওয়াইফ মিসেস্ রাধা ঘোষের সঙ্গে গোপনে অ্যাফেয়ার চালিয়েছিলেন। তাই না?"

আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না। কিছু বললেই মিসেস্ জেনিংস বই-পত্তর খুলে আমাকে রেফারেন্স দেখিয়ে বসবেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে মিসেস্ জেনিংস বললেন, "এই ধরনের চরিত্রহীনতা এবং অ্যাডালটারি তোমার দিদিমা প্রশ্রয় না দিলেই পারতেন।"

মিসেস্ জেনিংসকে জেরা করে জানতে পারলাম এর পেছনেও

জেনিংসকে মহাভারতের এই 'ক্লিক-বাজ চরিত্রহীন হিন্দু ভদ্রলোকটি' সম্পর্কে অনেক কনফিডেনসিয়াল খবর সাপ্লাই করেছে।

দেশে ফিরে এসে দিদিমার কাছে যেতেই একগাল হেসে তিনি বলেছেন, "কী ভাই, বুড়ী হয়েছি বলে মনে ধরে না বুঝি? সেই যে বললি, একবার তোর দাত্বর ঘাট ঘুরিয়ে আনবি, এখন আর উচ্চ-বাচ্য করছিস না।"

মিসেস্ জেনিংস দু'খানা ব্যাগ হাতে একলা এরোপ্লেনে বিশ্বভ্রমণ করেন। দিদিমা বেচারা একলা কোথাও কখনও যান নি। পাশের বাড়িতে যেতে হলেও গার্জেন হিসাবে ছ'বছরের নাতিকে সঙ্গে নেন। রাস্তাঘাটও চেনেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে কালীঘাটে নিয়ে যাবো, প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় দিদিমার মেজাজ ঠাণ্ডা হলো। তখন মিসেস্ জেনিং-সের কথা তুললাম। বললাম, "তিনি তোমাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন।"

দিদিমা বেশ দুষ্টুমিভরা ডিটেকটিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তারপর জেরা শুরু হলো, "বলি, ওদেশের পাহাড় পর্বত বন-জঙ্গল ঠাকুর-দেবতার খবরাখবর না দিয়ে শুধু একটা মেয়ে-মানুষের কথা তুলছিস কেন ভাই?"

হেসে বললুম, "মিসেস্ জেনিংস তোমারই বয়সী, দিদিমা।"

"হাসলেই বোকা বনবো না, ভায়া! বুড়ী মেমরা ছোকরাদের বে করতে ভালবাসে শুনেছি।"

আমি বিনা প্রতিবাদে হাসতে লাগলাম। দিদিমা বললেন, "তা আমার সতীনটি তোকে পাকড়াও করলে কী করে।"

বললাম ব্যাপারটা। দিদিমা এখানে লোকজন ছাড়া বাড়ির বাইরে এক পা বাড়াতে পারেন না; আর ওখানে মিসেস্ জেনিংস অজানা-অচেনা লোককে শহর ঘুরিয়ে দেখান। পয়সার জন্য নয়, স্রেফ শখ। নিজের গাড়িতে নিজের তেল এবং সময় খরচ করে বিদেশীদের শহর দেখবার জন্যে মিসেস্ জেনিংস গভরমেন্টের খাতায় নাম লিখিয়ে রেখেছেন। আমাকে শহর দেখাতে গিয়ে এমন স্নেহ করে ফেললেন যে, হোটেল ছাড়িয়ে নিজের বাড়িতে এনে তুললেন

"তারপর ?" দিদিমা জেরা চালালেন।

"মিসেস্ জেনিংস বললেন, শংকর, তুমি আমাকে রোজালিণ্ড বলে ডেকো। আমি রাজী হলুম না। বললুম, দেশে আমার এক দিদিমা আছেন আপনার বয়সী। আপনাকেও গ্র্যাণ্ডমা বলে ডাকবো।"

"বুড়ী নিশ্চয় খুব খুশী," দিদিমা মন্তব্য করলেন।

"মোটেই খুশী নন। কারণ মেমরা ওখানে কেউ বুড়ী হতে চান না। উনি বললেন, বরং তুমি আমাকে 'ডিডিমা' বলে ডেকো।"

জেরার চাপে পড়ে দিদিমাকে মিসেস্ রোজালিণ্ডের রঙিন ছবি দেখাতে হয়েছিল। দিদিমা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফটো দেখে বললেন, "মরণ আর কী ? বিধবা না সধবা লোকে বুঝবে কী করে ?"

বললুম, "সধবা বিধবা বোঝবার কোনো উপায় নেই ওখানে।"

উত্তর শুনে দিদিমা মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "সাধে কী আর বলেছে ম্লেচ্ছ দেশ !"

দিদিমার আরও জ্বলে ওঠবার কারণ ছিল। পরের ছবিটা দেখে তিনি বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়েন আর কী। এই ছবিতে মিসেস্ জেনিংস একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন। দিদিমার কাতরোক্তি, "হা ভগবান, মেয়েমানুষ বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে এও আমাকে দেখতে হলো ! ঘোর কলি একেই বলে !"

সিগারেটের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে করতেই দিদিমা মুখে একটু দোক্তা গুঁজলেন। আমি কিছু না বলেই ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি। দিদিমা বললেন, "যতই সায়েব হোস, নাতবৌকে যেন সিগারেট ধরাস না।"

"সিগারেট ও দোক্তা তো একই জিনিস, দিদিমা," আমি বিনীতভাবে নিবেদন করি।

"ওই মাগী তাই বলেছে বুঝি ? ও মাগো ! ভূভারতে কে শুনেছে যে বিড়ি-সিগারেট আর দোক্তা এক জিনিস ? তাহলে দুধ আর তাড়িও এক জিনিস বল ?"

দিদিমার সঙ্গে এরপর তর্ক করা বৃথা।

তবে দেখেছি, দিদিমা ক্রমশ মিসেস্ জেনিংসকে সহ্য করতে আরম্ভ করেছেন। আর মিসেস্ জেনিংসও প্রতি চিঠিতে দিদিমা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছেন। বলতে গেলে দু'জনে দু'জনের ফ্রেণ্ড হয়ে উঠেছেন।

দিদিমার সঙ্গে দেখা হলেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "তোর সেই মেমসাহেব কেমন আছে? রুজ-লিপস্টিক মেখে মাগী এখনও পাড়া বেড়াচ্ছে নিশ্চয়?"

আমি বলেছি, "সেই রকমই তো রিপোর্ট। মিসেস্ জেনিংস তোমারও খবরাখবর করেছেন, এবং একটা কোশ্চেন করতে বলেছেন। কোশ্চেনটা হলো, এখনও তোমার কী কী ডিজায়ার আছে?"

"ডিজায়ার? সে আবার কী জিনিস বাপধন?" দিদিমা প্রশ্ন করেছেন।

"মানে এখনও তোমার কী কী আকাঙ্ক্ষা আছে?" আমি বোঝাবার চেষ্টা করি।

"লিখে দিস, একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা আছে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যমের হাত ধরে ভেগে পড়ার।"

ইদানীং দিদিমার শরীরটা আরও খারপ হয়েছে। এবং বাড়ির যা রিপোর্ট, অসুস্থতার অনুপাতেই দিদিমা খিটখিটে হয়ে উঠেছেন।

সেদিন মামার বাড়িতে যেতেই দিদিমা আমাকে ঘরের মধ্যে ডেকে পাঠালেন।

ইঙ্গিতে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে বললেন। বুঝলাম, বাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে তাঁর অনেক অভিযোগ জমা হয়ে আছে।

দিদিমা বললেন, "ঘোর কলিকাল—বুড়ো বাপ-মায়ের এখন আর দাম নেই।"

"কী হলো দিদিমা!" আমি প্রশ্ন করি।

"হবে আর কি বাছা! স্ত্রীলোকের ভাতার ছাড়া কেউ নেই।

কষ্ট পেতে হতো? বিয়ের পর সেবার আমার মাথা ধরেছিল। তোর দাদু অর্ধেক রাত ধরে এমন মাথা টিপে দিয়েছিলেন যে এখনও ভুলতে পারি না। এখন বুড়ী বিধবাকে দেখে কে? একটু বাতান্তক তেল মালিশ করে দেবার সময় এ-বাড়ির কারুর নেই।"

দিদিমার মাথার গোড়ায় ওষুধের শিশি দেখতে পেয়ে বললাম, "ওই যে ওষুধের শিশি দেখছি।"

দিদিমা মুখ বাঁকালেন, "ওসব দায়-সারা। লোকলজ্জার ভয়ে বুড়ীর জন্যে সুধীর ডাক্তারের কাছ থেকে দুটো ট্যাবলেট এনে রাখলো। বড়ি খেয়ে বাতের অসুখ সারে না ভাই। এর জন্যে গরম তেল মালিশ করতে হয়। কিন্তু কে আমার দাসী-বাঁদী আছে বল?"

একটু থেমে দিদিমা বলে চললেন, "খোকার আপিস রয়েছে। বৌমা সংসার আর রান্না নিয়ে ব্যস্ত। নাতিদের ফুটবল খেলা আছে।"

"ডাকছি মামীমাকে," আমি বললাম। কারণ আমি জানি মামীমা যথাসাধ্য দিদিমার পরিচর্যা করেন।

দিদিমা বাধা দিলেন, "ডেকে কোনো লাভ নেই। এখনই লোক-দেখানো দু'মিনিট মালিশ আরম্ভ হবে। তারপর ভূভারতে সবাই জেনে যাবে, শাশুড়ীর মালিশের জন্যে রান্না দেরি হয়েছে, সোয়ামির আপিসে লেট হয়েছে, ছেলেরা মাস্টারের কাছে বকুনি খেয়েছে।"

"তুমিও ছাড়বে কেন? মামা এলে সমস্ত ফাঁস করে দিও।" আমি পরামর্শ দিই।

"বলি না কি? রোজই তো বলি, কিন্তু কে শোনে? এ-যে ঘোর কলিকাল! কলিকালে মায়ের চেয়ে মাগ বড় হবে একথা মুনি-ঋষিরা অনেকদিন আগে বলে গিয়েছেন।"

"মামীর না হয় কাজকর্ম আছে। তার ওপর ঝি কামাই করছে দু'দিন। নাতিকে হুকুম করবে," আমি দিদিমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করি।

"বয়স হোক, তখন বুঝবি ভায়া, আসলের চেয়ে ফাউ আরও

গভ্যযন্ত্রণা তবু সহ্য হয়, কিন্তু এর যে কী কষ্ট! যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নাতিকে মিষ্টি করে বললাম, লক্ষ্মী দাদা আমার, একটু গাঁটগুলো টিপে দে। তা ছোঁড়া ইচ্ছে করে এমন টিপুনি দিলে যে ত্রাহি মধুসূদন বলে ডাক দিতে হলো।”

হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে দিদিমা বললেন, “লোকে ভাববে বাড়িয়ে বলছি। কিন্তু তুই দেখ, এখনও ফুলে রয়েছে। পুলিসে খবর দিলে ফৌজদারী কেস হয়ে যাবে।”

“মামাকে বলো নি?” আমি জিজ্ঞেস করি।

“বলি নি আবার! কিন্তু ওই লোক-দেখানো একটু বকুনি হলো। ছেলে বললে, আমি বুঝতে পারি নি। আর বাপ তাই বিশ্বাস করে গেলো। পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ!”

মুখের মধ্যে একটা ছ্যাঁচা পান পুরে দিদিমা বললেন, “সে যুগ আর নেই, যখন বাপ-মাকে ছেলেমেয়েরা দেবদেবীর থেকে বেশী ভক্তি করতো।”

সেদিন মামার বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মামীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সাধারণ গেরস্থ সংসার, সবকিছু সামলাতে মামী হিমশিম খেয়ে যান। এরই মধ্যে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে শাশুড়ীর সেবা করেন। মামী জিজ্ঞেস করলেন, “কী আলোচনা হলো এতোক্ষণ?”

“বিষয়বস্তু টপ সিক্রেট!” আমি হাসি চেপে রেখে উত্তর দিলাম।

“মোটেই গোপন নয়। পাড়ার যাকে পাচ্ছেন তার কাছেই উনি রিপোর্ট করছেন। অথচ কাউকে গায়ে হাত দিতে দেবেন না। রেগে বলছেন, পা-টেপা আর ময়দা-মাখা এক জিনিস নয়, বাছা!”

এই একই সময়ে এয়ারমেলে মিসেস্ জেনিংসের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন, রিউম্যাটিক পেনটা একটু বেড়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শ মতো ক্লিনিকে গিয়ে রোজ আধঘণ্টা বাতের জন্য ব্যায়াম করছেন। ভাল ফল পাচ্ছেন। ছেলের খুব প্রশংসা করে লিখেছেন, “জন এবং ডটার-ইন-ল যে-ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তার তুলনা হয় না।”

দিদিমার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। এবার দিদিমার কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। দরজা বন্ধ করে আমার হাত দুটো ধরে বলেছেন, "আর যা করো ভাই, বাড়িতে হুগলী রঘুনাথপুরের মেয়ে ঢুকিয়ো না। রঘুনাথপুরে ছেলের বিয়ে দিয়ে যে কী গুখুরি করেছি।"

আমি বললাম, "সেকি দিদিমা! রঘুনাথপুরে তো তোমারও বাপের বাড়ি?"

"বাপের বাড়ি বলে সত্যি কথা, বলবো না?" দিদিমা কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর দিলেন।

"হলো কি তোমার?" আমি সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞেস করি।

"আগে হাতে মারছিল, এখন ভাতে মারছে আমায়। বিধবা মানুষ, ঘাস-চচ্চড়ি খেয়ে তো প্রাণধারণ করি। এখন বলে কিনা চায়ে চিনি দেবে না। দু'বেলা চার চামচ চিনি বাঁচিয়ে ওদের কী লাভ হবে বল তো?"

"ডাক্তার যে তোমাকে চিনি খেতে বারণ করেছে," আমি দিদিমাকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

"ওই কথাই ওরা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। গোড়া কেটে আর আগায় জল ঢেলে লাভ নেই। বিধবার বেঁচে সুখ কী? চিনি বন্ধ ক'রে আমাকে আর বাঁচাতে হবে না।"

"মামাকে বলেছো সে কথা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"বলেছি, কিন্তু কানে ঢোকে না। বউ যা বলছে তাই বেদবাক্য!"

"বউয়ের নামে কমপ্লেন করো ছেলের কাছে," আমি বুদ্ধি দিই।

"হা কপাল! সেই ছড়াটা জানিস না? যার কাছে তুই করবি নালিশ সে আমার মাথার বালিশ!"

এরপর আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করে গেলেন দিদিমা। ছেলেদের সঙ্গে এখন শুধু দেবার সম্পর্ক—গর্ভে ধরো, গু-মুত কেচে মানুষ করো, টাকা ছড়িয়ে লেখাপড়া শেখাও, তারপর হাতের মোয়াটি পরের মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে দাসী-বাঁদির মতো পড়ে থাকো, খাও-দাও, বাসন মাজো।"

আমার মনে পড়ে গেলো, মিসেস্ জেনিংস কিন্তু মোটেই ছেলের নিন্দে করেন না। বরং প্রতি চিঠিতে ছেলে এবং বউমার সুখ্যাতি প্রশস্তি থাকে।

দিদিমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "তোর পকেটে যেন আমার সইয়ের চিঠি?" মিসেস্ জেনিংসের ওপর রাগ কমে গিয়ে এখন দিদিমা ওঁকে সই বলে ডাকেন।

বললাম, "সইয়েরও বাতের অসুখ হয়েছিল, এখন একসাইজ করে ভাল আছেন।"

"ছেলেপুলের খবর কিছু লিখেছে নাকি? দিদিমা জিজ্ঞেস করেন।

"ছেলের এবং ছেলের বউয়ের প্রশংসা করে লিখেছেন, এরা খুউব ভাল, মাকে বেজায় ভালবাসে। বউমাটি খুবই মিষ্টি এবং নরম।"

"কপাল!" দিদিমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। "সন্তানভাগ্য কি সবার ভাল হয়," দিদিমা দুঃখ করলেন।

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মেম মাগীরা তো ছেলেদের জন্যে কোনো কষ্টই করে না। শুধু গভ্যে ধরে, কিন্তু বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায় না, এক ঘরে শুতে দেয় না, রাত্তির জাগে না, কাঁথা কাচে না, তিন বছর বয়স হলেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়ে দেয়। অথচ আমাদের কি যন্ত্রণা! কিন্তু দেখো, মেম মেয়ের কত সুখ, ছেলে এবং ছেলের বৌয়ের প্রশংসা লিখে ফুরোতে পারছে না।"

সুদূর বিদেশে মিসেস্ জেনিংসের সংসারের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মিসেস্ জেনিংসের ছেলে বিয়ের পরও মায়ের বাড়ির কাছাকাছি থাকে। ভদ্রলোক একটা চুল কাটার দোকানের মালিক।

বিরক্ত দিদিমা বললেন, "তুই তো নিজের চোখে এখানকার অবস্থা দেখেছিস। এ-বাড়ির লোকজনদের একটু বলে যা, মায়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়।"

আমি বললাম, "সত্যি দিদিমা, সব সময় মিসেস্ জেনিংস বলতেন, ববের মতন ছেলে হয় না। আমি ববের জন্যে প্রাউড।"

"তার মানে, এমন ছেলে যে গর্ভধারিণী মা তার জন্যে গর্ব বোধ করে, তাই তো!" দিদিমা নিজের ভাষ্য দিলেন।

আমি বললাম, "বব যখন বাড়িতে আসতো তখন সে এক দেখবার জিনিস। ছুটে এসেই মাকে জড়িয়ে ধরতো, মাকে চুমু খেতো।"

"আহা শুনলেও মনটা জুড়িয়ে যায়," দিদিমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

"আদর করা, জড়িয়ে ধরা তো দূরের কথা। কেমন আছো—একবার জিজ্ঞেস করতেই তোর মামার জিভ সরে না।"

আমাকে পরবর্তী বিবরণও দিতে হলো। আমি বললাম, "দিদিমা বব আবার খালি হাতে আসে না। মায়ের জন্যে ফুল আনে মাঝে মাঝে। ছেলে এবং বউ দু'জনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে, মামি ডার্লিং, তুমি কেমন আছো? কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? যদি কিছু করবার থাকে এখনই বলো। কোনো রকম লজ্জা কোরো না।"

"আমাকে না বলে, এসব কথাগুলো তোর মামাকে শোনাগে যা। একাদশীর দিন দায়-সারা গোটা কয়েক ফল হাতে করে ঘরে ঢোকেন। রোজ একবার দায়-সারা জিজ্ঞেস করবেন, গাঁটের ব্যথা কমলো কিনা। ব্যস, ওই পর্যন্ত।"

আমাকে বলতেই হলো, "ছেলের জন্যে মিসেস্ জেনিংস গর্ব বোধ করেন।"

"অমন মিষ্টি ব্যবহার পেলে, আমিও করতাম," দিদিমা দুঃখ করলেন।

"কিন্তু দিদিমা, সেবারে তুমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলে, তখন তোমার চিকিৎসার জন্যে মামা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা ধার করলেন। এখনও দেনা শোধ হয় নি। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়া পর্যন্ত মামীমা একদিনও বাড়ি থেকে বের হন নি।"

"রাঁখ রাখ, ওসব লোক-লজ্জার ভয়ে। বিনা চিকিৎসায় মা

মারা গেলে সমাজে যে মুখ দেখাতে পারবে না, সেই জন্যে।" দিদিমা মুখ বেজার করে জানালেন।

তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিদিমা বললেন, "তুই সইকে লিখে দে যে তিনি অনেক কপাল করে এসেছেন, তাই অমন ছেলে এবং বউ পেয়েছেন।"

সে-কথা যে মিসেস্ জেনিংসও সেবারে স্বীকার করেছিলেন মনে পড়ে গেলো। আমি তখন ওঁর বাড়িতে অতিথি। আমাকে ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে খাওয়াতে মিসেস্ জেনিংস ববের নানা গুণের তালিকা দিচ্ছিলেন। বব কী রকম স্মার্ট, ব্যবসায়ে কী রকম উন্নতি করেছে, মাকে কত ভালবাসে, ইত্যাদি।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে, ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে মিসেস্ জেনিংস আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, "আমাকে আধঘণ্টার জন্যে বেরুতে হবে। ববের সেলুনে চুলকাটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।"

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মিসেস্ জেনিংস বললেন, "বব যে আমার কত ভাল ছেলে তা তোমাকে কী বলবো! এই যে আমি চুল ছাঁটতে যাচ্ছি, কত যত্ন করে নিজে আমার চুল ছাঁটবে, কত সাবধানে মাসাজ করবে। এবং পুরো দামও নেবে না, আমাকে কুড়ি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেবে। আজকাল কেউ কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ে? এমন ছেলে ক'টা মেলে?"

কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ের ব্যাপারটা আমার দেহের মধ্যে বিদ্যুতের চাবুক দিয়েছিল। মায়ের চুল ছেঁটে পয়সা নেয়, এ কেমন সভ্যতা? কিন্তু মিসেস্ জেনিংসকে বিব্রত করতে সঙ্কোচ বোধ করেছি। দিদিমাকেও ব্যাপারটা বলতে গিয়ে বলতে পারি নি। দিদিমা যখন মিসেস্ জেনিংসের সন্তান-সুখের কথা বিশ্বাস করে একটু শান্তি পাচ্ছেন তখন আমি কেন বাদ সাধি?

মার্কিনী সভ্যতার যে দিকটা আমাকে মোটেই মুগ্ধ করতে পারে নি তা হলো বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি বয়োকনিষ্ঠদের মনোভাব। এতো সম্পদ, এতো প্রাচুর্য, এতো প্রেম, এতো দয়া থাকা সত্ত্বেও আমেরিকায় বৃদ্ধরা কেন যে অবহেলিত হন তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারি নি। এ সম্পর্কে বেশ কিছু ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তার আগে গিনি মাসীমার কথাটা সেরে ফেলি। গিনি মাসীমার দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে। ছেলেরা কৃতী এবং মেয়েদের ভাল ভাল বিয়ে হয়েছে। এঁদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক নেই। মেসোমশাই বীরেন রায় একসময় আমাদের বাড়ির পাশে থাকতেন। তখন থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা। সামান্য চাকরি করলেও মেসোমশাই অনেক কষ্ট ও যত্ন করে ছেলেদের মানুষ করেছেন এবং মেয়েদের জন্য সুযোগ্য জামাই যোগাড় করেছেন। বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের পাড়া ছেড়ে ওঁরা যতীন বাগচী রোডে উঠে গেলেও আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। মেসোমশাই ইতিমধ্যে রিটায়ার করেছেন এবং মোটামুটি ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে অবসর জীবন উপভোগ করছেন।

গিনি মাসীমা আমাকে দেখেই বললেন, "তুই তাহলে এলি?"

আমি হেসে বললাম, "না এসে উপায় আছে? পোস্টকার্ডে আপনি লিখেছেন, 'এই চিঠি টেলিগ্রাম মনে করিবা!' মা তো আমাকে গত রাত্রেই ঠেলেঠুলে পাঠাচ্ছিলেন। বলছিলেন, গিনিদি যখন টেলি পাঠিয়েছেন, তখন নিশ্চয় খু-উ-ব জরুরী দরকার'।"

বললেন, "অবি আমাকে এখনও ভালবাসে। হাজার হোক সমবয়সী তো—বুড়োবুড়ীদের দুঃখ বোঝে।"

আমি বিব্রত হয়ে মাথা চুলকোতে লাগলাম। "আমি গতকালই আসতাম, কিন্তু একটা নেমন্তন্ন ছিল—সেখানে দেরি হয়ে গেলো। আজ রুজিরোজগারের কাজ শেষ করেই ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি।"

আমি এবার নিচু হয়ে গিনি মাসীমার পায়ের ধুলো নিতে গেলাম। প্রায় বলপ্রয়োগ করে পদধূলি সংগ্রহ করতে হলো। কারণ গিনি মাসীমা বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। বেশ অভিমানভরা কণ্ঠে গিনি মাসীমা বললেন, "এসব জিনিস দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে, বাছা। ঘোর কলিযুগ তো, গুরুজনদের আর কোনো কদর নেই। আমার ছেলেরা তো ও-পাট চুকিয়েই দিয়েছে। সেদিন ছোট খুড়ীমা এলেন, খোকাকে অত করে ইশারায় পায়ের ধুলো নিতে বললাম, কিন্তু শুনলো না। খোকা অবশ্য অফিসে যাবার সময় আমার পায়ের ধুলো নেয়। কিন্তু সে দায়সারা।"

আমি চুপ করে রইলাম। গিনি মাসীমা আঁচলের খুঁটে বিশাল চাবির গোছা সামলে বললেন, "বুড়োমানুষদের এখন কোনো সম্মান নেই, বাবা। নেহাত দুটো ভাত-ডাল না-দিলে ছেলেরা সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না, তাই খেতে দেয়। কিন্তু ওই পর্যন্ত।"

ফিসফিস করে গিনি মাসীমা এবার পুত্রবধূ অর্থাৎ মন্টুর স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "একটা কথা শোনে না। যখন খুশী বাপের বাড়ি যাচ্ছে—যাবার সময় শুধু ধম্ম রক্ষের জন্যে জিজ্ঞেস করবে, মা, একবার বাবাকে দেখে আসবো?"

মাসীমা বিরক্তভাবে বললেন, "যাবেই যখন ঠিক করেছো, তখন জিজ্ঞেস করার মানেটা কী? আমরাও তো বউ ছিলাম, আমাদেরও শাশুড়ী ছিল। মন্টুর বয়স যখন ষোলো বছর তখনও পর্যন্ত শাশুড়ীর সঙ্গে ভয়ে কথা বলতে পারতাম না। বছরে একবার বাপের বাড়ি যাওয়া—তাও বাবা নিজে এসে শাশুড়ীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা

হজম হয় না—কোনটা যে নিজের বাড়ি আর কোনটা বাপের বাড়ি তা বোঝা যায় না।”

আমি চুপ করে গিনি মাসীমার কথা শুনে যাচ্ছি। তিনি দুঃখের সঙ্গে বললেন, “আমরা সেকেলে বুড়ীরা নাকি ছেলে মানুষ করার কিছু জানি না! আরে বাপু, তোমার ছেলের বাপকে কে মানুষ করেছিল? আদ্যিকাল থেকে আমরা শুনে এসেছি, ডিম গরম জিনিস—ছোট ছেলেদের খাওয়াতে নেই। কিন্তু বউমা শুনবেন না—ঐ তিন বছরের নাতিটাকে রোজ আধকাঁচা ডিম খাওয়াচ্ছেন। তা তোমার ছেলে, তুমি যা ইচ্ছে করো—কিন্তু ওইটুকু শিশুর পেটে কোনো গোলমাল হলে আমাকে তো চোখের সামনে দেখতে হবে! অসুখ করলেই ছোঁড়াটা ঠাকুমা ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারে না।”

“ছেলেকে বলেন না কেন?” আমি জানতে চাই।

গিনি মাসীমা বললেন, “কত কথাই তো বলতাম! কিন্তু এক কান দিয়ে ঢোকে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়! এখন আর সাহস হয় না, বাবা। কোনদিন হয়তো বলে বসবে, বউ-এর কথা আগে, না তোমার কথা আগে?”

মেসোমশাই কী বলেন, আমার জানবার আগ্রহ হয়। গিনি মাসীমা বলেন, “উনি তো কেমন ধরনের! মনের সব কথা হজম করে নেবেন। রেগে গেলেও বাড়িতে মুখ খুলবেন না। বিকেল বেলায় লেকের ধারে বেড়াতে যান। সেখানে যত রাজ্যের বুড়োদের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা ধরে বকবক করবেন। সেসব কথা আমাকে বলবেন না—ওঁর বন্ধু কেষ্টবাবু কিন্তু ফিরে এসে বউয়ের কাছে সব রিপোর্ট দেন। সেখান থেকে কিছু কিছু আমার কানে আসে। শুনি, উনিও আড্ডাতে বলেন, সমস্ত দেশটাই গোল্লায় যাচ্ছে। গুরুজনদের ভক্তিশ্রদ্ধা করা, খুড়ী-মাসীকে একটু দেখে শুনে আসা—এসব উঠে যাচ্ছে। এখন বউ-এর বাপের বাড়িই সব। যত টান ওই দিকে।”

বললেন, "কী যুগ পড়লো? তুই আজ পেন্নাম করলি তাই—না হলে পায়ের ধুলো কাকে বলে, ভুলেই যেতে বসেছিলাম!"

এমন সময় মেসোমশাই সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফিরলেন। আমাদের কী সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে তা গিনি মাসীমা ইঙ্গিত দিলেন। কিন্তু মেসোমশাই ওসবের মধ্যে বিশেষ ঢুকলেন না। স্ত্রীকে বললেন, "যে-যুগের যে-হাওয়া। আমাদের যুগে বাড়ির কর্তাই ছিলেন কর্তা। এখন তা নয়। এখন আমার অবস্থা ইংলণ্ডের রাজার মতো। I reign but I do not rule—আমি রাজত্ব করি কিন্তু শাসন করি না। সব ক্ষমতা এখন সাবালক ছেলে এবং বউমার হাতে। ওরা যা করতে বলবে আমাদের তাই করতে হবে।"

গিনি মাসীমা বললেন, "শুধু ছেলে-মেয়েদের কী দোষ দেবো? গরমেন্টও তাদের আস্কারা দিচ্ছে। আইনকানুন যা হচ্ছে তা মাগ ভাতারদের জন্যে, মা-বাপের জন্যে নয়! স্বামী যদি বউকে না-দেখে, তাহলে বউ কোর্টে গিয়ে গলায় গামছা দিয়ে খোরপোশ আদায় করতে পারে—কিন্তু মাকে গামছা পরিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিলেও মা কোর্টে গিয়ে ছেলের কাছে খোরপোশ দাবি করতে পারবে না। এ কি যুগ এলো রে বাবা! ঘোর কলিকাল, মহাপ্রলয়ের আর দেরি নেই।"

মেসোমশাই কোনো কথা বললেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে চা জল-খাবার দেওয়া হয়েছে কিনা। বলতে বলতেই মন্টুর বউ ঘোমটা মাথায় আমার জন্যে চা নিয়ে এলো। বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার গরম জলটা এখানে পাঠিয়ে দেবো কি?"

মেসোমশাই বললেন, "দাও।"

মাসীমা বললেন, "ডাক্তার বলেছে, বেড়িয়ে এসেই গরম জলের বালতিতে আধ ঘণ্টা পা চুবিয়ে বসে থাকতে।"

বউমা গরম জলের বালতি রেখে গেলেন। গিনি মাসীমা মোড়া থেকে উঠে, নিজের চাবির গোছা সামলে, একবার জলের উষ্ণতা

দেওয়ার মানে কী? শ্বশুরকে জল দিতে পারবো না, বলে দিলেই হয়। এ তো গরমই হয় নি।"

মেসোমশাই এবার গিনি মাসীমাকে সামলাবার চেষ্টা করলেন। "কালকে জলটা বড্ড গরম ছিল বলে আমিই একটু ঠাণ্ডা দিতে বলেছিলাম বউমাকে।"

গিনি মাসীমা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, "ফুটন্ত জল, না-হয় বরফ ঠাণ্ডা জল। নিজের ছেলের জল হলে, এইভাবে এগিয়ে দিতে পারতো?"

একটু থেমে গিনি মাসীমা আমাকে বলেছিলেন, "যে-দেশে গুরুজনদের সম্মান নেই, সে-দেশের ওপর ভগবান কখনো সন্তুষ্ট হন না। দেখছিস না আমাদের অবস্থা। ক্রমশ সব কিছু তলিয়ে যাচ্ছে —অভাব অনটন বাড়ছে।"

লক্ষ্মীর কৃপাধন্য মার্কিন মুলুক ভ্রমণের মধ্যপর্যায়ে গিনি মাসীমার কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে শিকাগোর মিস্টার রয়েডের বাড়িতে।

মিস্টার রয়েডের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মিস্টার অলিভার। মিস্টার রয়েডের এক পার্টিতে আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই আমি ওঁর বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম—মিস্টার অলিভার তখনও পৌঁছন নি। ওঁর কাছেই আগে শুনেছিলাম মিস্টার রয়েডের দুই ছেলে। বড়টির বয়স উনিশ এবং ছোটটি পনেরো। ককটেল পার্টিতে আরও কয়েকজন অতিথি এসে পড়েছেন। মিস্টার রয়েডের বড় ছেলেকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু ছোটছেলে টমাসের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেলো। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার দাদা কোথায়?"

ক্ষমা প্রার্থনা করে টমাস বললো, "আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার খুব ইচ্ছে ছিল জিম-এর। কিন্তু হঠাৎ বার্কলে থেকে ওর এক কলেজ বান্ধবী হাজির হয়েছে। তাই তাকে নিয়ে বেরিয়েছে জিম।"

বেশ নম্র। মিস্টার অলিভার একটু দেরিতে পার্টিতে এলেন। প্রায় ষাটের কাছে বয়স ভদ্রলোকের। ওর সঙ্গে কয়েকদিন ধরেই এ-দেশের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে বয়োকনিষ্ঠদের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছে। মিস্টার অলিভার দেখলুম হল্-এর এক কোণে টমাসের সঙ্গের কথা বলছেন। আমি তখন মিস্টার রয়েডের সঙ্গে গল্পগুজব করছি।

একটু পরে মিস্টার অলিভার আমার কাছে এলেন। ওঁর মুখের অবস্থা দেখেই বুঝলাম গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। বেশ রেগে রয়েছেন। আমাকে এক ধারে নিয়ে বললেন, "অসহ্য—এদেশের ইয়ংমেনদের দিকে তাকাতে পর্যন্ত আমার আজকাল ঘেন্না হয়। আমার যদি সামর্থ্য থাকতো, তা হলে ছোঁড়াগুলোকে চাবকে সোজা করতাম।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কী হলো?"

মিস্টার অলিভার বললেন, "তুমি বিদেশী। দু'দিনের জন্যে এদেশে এসেছো, তোমাকে হয়তো এসব বলা উচিত নয়। কিন্তু তুমি এদেশের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্বন্ধে আগ্রহী—তোমার কাছে এসব খবর চেপে রাখাটা আমার পক্ষে অন্যায় হবে।"

মিস্টার অলিভার এবার আঙুল দিয়ে টমাসকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, "ঐ যে চ্যাংড়া ছেলেটা দেখছো, ওর নাম টমাস। মিস্টার অলিভারের ছোটছেলে। ওকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বড় ভাই জিম কোথায়? এখন ওই ছোকরার অসভ্যতা এবং বর্বরতার কথা ভাবলে আমার সমস্ত দেহ জ্বলছে। তুমি শুনলে কানে আঙুল দেবে—তুমি ভাববে এই দেশটা এখনও ট্রাইবাল যুগে পড়ে রয়েছে।"

একটু থেমে মিস্টার অলিভার বললেন, "দাদা কোথায় এর উত্তরে ছোকরা বেমালুম আমাকে বললে, 'জিম একটি পছন্দমতো ছুঁড়ী পেয়েছে, তাকে পটিয়ে-পাটিয়ে কোথাও শুইয়ে মনের খুশীতে জন্যে,

সেই পৃথিবীবিখ্যাত কুশ্রী নোংরা ইংরিজী কথাটা ছোকরা বেমালুম ব্যবহার করলো।"

আমি অবাক। মিস্টার অলিভার বললেন, "আমাকে কেন ওইভাবে বললো তা আমি জানি। কারণ আমি বুড়ো হয়ে গেছি—এবং বুড়োদের ওরা মানুষের মধ্যে মনে করে না। গোরু ঘোড়ার কাছে যেমন আমাদের সামাজিক এবং দৈহিক লজ্জা নেই, তেমনি বুড়োদের ওরা থোড়াই তোয়াক্কা করে।"

মিস্টার অলিভারকে আমি বলতে সাহস করলাম না, এই একই প্রশ্নের উত্তরে টমাস আমাকে স্বাভাবিক সুসভ্য উত্তর দিয়েছে। ভাবলাম, আমি বিদেশী বলেই হয়তো টমাসের হাত থেকে বেঁচে গেছি—কিংবা এমনও হতে পারে যে আমি এখনও বুড়ো হই নি বলেই সামাজিক সৌজন্য পেলাম।

ওই পার্টিতে বসেই গিনি মাসীমা এবং মেসোমশায়ের কথা মনে পড়ে গেলো। এই গল্প তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। ভাববেন, এটাও এক ধরনের সাহিত্যিক পাগলামী।

গিনি মাসীমার কথায় আবার ফিরে আসা যাক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার চিঠি পেয়েই ছুটে এসেছি। কিছু কাজকর্ম আছে নাকি?"

গিনি মাসীমা এবার স্বামীকে বললেন, "তুমিই বলো। তোমার কথা মতোই তো অবির বড় ছেলেকে চিঠি লিখলুম।"

বীরেন মেসোমশাই বললেন, "শুনলাম, তুমি ফরেনে যাচ্ছো? যদি পারো একবার আমার পুরনো সায়েবের সঙ্গে দেখা করে এসো।"

মেসোমশাই সমস্ত খবরাখবর দিলেন। একটা চিঠিও আমার হাতে দিলেন।

কোনো সায়েবের নাম যে কনেমারা হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। শিয়াল-মারা, বাঘা-মারা এই সব বাংলা কথাই এই পর্যন্ত

শোনো নি? তিনিও তো যুদ্ধের সময় কলকাতার কাছে খড়্গপুরে থাকতেন।”

মেসোমশাই জানালেন, “কনেমারা সায়েবও যুদ্ধের সময় ইণ্ডিয়াতে এসেছিলেন আমেরিকান আর্মির সঙ্গে।”

“বড্ড অসভ্য ছিল এই আমেরিকান সোলজারগুলো,” আমি বললাম। “মাতলামী করতো, যেখানে-সেখানে ঢুকে পড়তো, বেপরোয়া ট্রাক চালাতো—কত লোককে যে গাড়ি চাপা দিয়েছিল তার ঠিক নেই।”

মেসোমশাই বললেন, “মেজর কনেমারা ছিলেন ঠিক তার উল্টো। ওঁর আণ্ডারে আমি তো বছরখানেক চাকরি করেছি—একেবারে দেবতুল্য মানুষ। আমাদের মন্দির-টন্দির সম্বন্ধে খুব আগ্রহ ছিল। সময় পেলেই ছবি-টবি তুলতেন। ড্রিংক করতেন, তবে ওষুধের ডোজে, কখনও মাতলামো করতে দেখি নি। আর অসাধারণ পবিত্র চরিত্র। মেয়েমানুষদের সম্বন্ধে একদম আগ্রহ ছিল না। সপ্তাহে তিনখানা করে চিঠি লিখতেন মিসেস্ কনেমারার কাছে। ঠিক তিনখানা করে উত্তর আসতো। আমি নিজে জানি। কারণ আমি ছিলাম সায়েবের পি এ। চিঠিপত্র সব আ‍‍মার কাছে আসতো।”

একটু থেমে মেসোমশাই বললেন, “বড্ড ভাল লোক ছিলেন। ইণ্ডিয়ানদের চাকর মনে করতেন না। যুদ্ধের চাকরি যে আমার চিরকাল থাকবে না তা সায়েব বুঝেছিলেন। তাই কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে মেজর কনেমারা আমাকে ন্যাশনাল কোম্পানির এক সায়েবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন, ‘বাইরেন ইজ লাইক মাই ফ্রেণ্ড। বিপদে পড়লে ওকে একটু দেখো।’ ন্যাশনাল কোম্পানির সায়েব কিন্তু বন্ধুর অনুরোধ মনে রেখেছিলেন—কনেমারা-সায়েবের সুপারিশেই দু’ বছর পরে আমাকে চাকরি দিলেন। তাই ছেলেপুলে মানুষ হলো—ঘরসংসার চললো।’

এই কোম্পানি থেকেই মেসোমশাই রিটায়ার করেছেন।

কনেমারা সায়েব প্রতি বছরে ...

একটা কার্ড ও সেই সঙ্গে কয়েক লাইন চিঠি পাঠিয়ে যাচ্ছেন। এতো বছরের প্রত্যেকটি কার্ড মেসোমশাই সযত্নে ফাইল করে রেখেছেন। মেসোমশাই বললেন, "যদি সময় পাও ওঁর সঙ্গে একবার দেখা কোরো। আমার কথা শুনলে খুব খুশী হবেন।"

আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েই তাই কনেমারা-সায়েবকে পত্রাঘাত করেছি। এবং ইউরোপ-আমেরিকার অধিবাসীদের যা প্রধান গুণ, এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর পেয়েছি। এক এক সময় আমার মনে হয়, মার্কিনীদের মতো গুছিয়ে অথচ মন খুলে চিঠি লিখতে পৃথিবীর আর কোনো জাত পারে না। ওঁদের চিঠিতে আন্তরিকতা থাকে—এবং সময়ের প্রচণ্ড অভাব সত্ত্বেও লম্বা লম্বা চিঠি লিখতে তাঁরা মোটেই কার্পণ্য করেন না। আমাদের দেশে কেউ কেউ সহজ সরল অন্তরঙ্গ চিঠি লিখতে জানেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা হাতে গণা যায়। চিঠি লেখার আর্ট আমাদের ইস্কুলে শেখানো উচিত। বহু লোকের চিঠিতেই তাঁদের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয় না—কোথায় যেন সঙ্কোচ ও দূরত্ব থেকে যায়। এদেশের বিখ্যাত লোকদের চিঠির কথা নাই বা তুললাম। এগুলো চিঠি না গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ তা বোঝা দায়! পরবর্তী কালে অপ্রকাশিত পত্রাবলীর আকারে বাজারে বিক্রি হবে এই মনে করেই যেন বিখ্যাত লোকরা চিঠি লিখতে বসেন—তার ফলে ব্যক্তিগত চিঠি পড়ার প্রধান মজা এবং উত্তেজনা কিছুই পাওয়া যায় না।

এ-সম্বন্ধে গিনি মাসীমা এবং মেসোমশায়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। পাইকারী হারে চিঠি লেখবার একটা প্রধান সময় আমাদের বিজয়াদশমী এবং ওদের বড়দিন। মেসোমশাই বলেছিলেন, "আমাদের বিজয়াদশমীর চিঠির মধ্যে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনের উদ্বেগটাই প্রধান—তাই চিঠিগুলো সব সময় জীবন্ত হয়ে ওঠে না। অথচ ওঁদের ক্রিস্টমাসের দু'চার ছত্রের মধ্যে একটা প্রাণের স্পন্দন থাকে।"

[illegible] এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলেছিলেন।

শিক্ষিত বাঙালীকে বাল্যকালেই ইংরিজী চিঠি লেখা অভ্যাস করতে হয়—এবং সারা জীবন আপিসে চিঠি নামক এক ধরনের ব্যবসায়িক দলিলের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রাখতে হয়। তাই চিঠি লেখার প্রধান মজা থেকে আমরা নিজেদের অজ্ঞাতেই বঞ্চিত হয়ে পড়ি।

মেসোমশাইয়ের পুত্র মণ্টু অবশ্য আর একটা কারণ দেখিয়েছিল। সেটা মেসোমশায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি নি। মণ্টু বলেছিল, "চিঠিলেখার প্রতিভা সবচেয়ে বিকশিত হয় প্রেমে পড়লে। প্রেমপত্র তাই সব দেশে এতো আদরের। যে ভাল চিঠি লিখতে জানে না, সে প্রেমের প্রথম রাউণ্ডেই হেরে ভূত হবে—কোনোদিন ফাইন্যালে উঠে শীল্ড জিততে পারবে না। আমাদের দেশে এতোদিন শুধু সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে—পাত্র ও পাত্রী পক্ষের বাবা-মা'রা দলিল দস্তাবেজের মতো বিবাহসংক্রান্ত চিঠি লিখেছেন, নায়ক-নায়িকাদের সেখানে কোনো ভূমিকা নেই। তাই পত্রসাহিত্য এদেশে বিকশিত হয় নি।"

মার্কিন মুলুকে এসে দেখলুম, টেলিফোন এবং টেপরেকর্ডারের অত্যাচারে চিঠি লেখার আর্ট একটু অসুবিধেয় পড়েছে—কিন্তু মরা হাতী এখনও লাখ টাকা। মিসেস্ রয়েড (যাঁর বাড়িতে একরাত কাটিয়েছিলুম) বললেন, "ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে খুব বিরক্ত হলে আমি মুখোমুখি কথা বলি না—রাগে মাথায় মুখ দিয়ে কি বেরিয়ে যাবে কে জানে। তার বদলে আমি গুছিয়ে চিঠি লিখে ফেলি। এবং সেই চিঠি খামে পুরে ছেলে অথবা মেয়ের ঘরে রেখে আসি।"

মিসেস্ রয়েড একটা চিঠি আমাকে দেখিয়েছিলেন। পনেরো বছরের জিমকে মা লিখছেন, "আজ সকালে আমাদের বিদেশী অতিথির সামনে তুমি যেভাবে ব্যবহার করেছো, তাতে আমি এবং তোমার বাবা ব্যথিত হয়েছি। তোমার জানা উচিত, আমাদের এই সমাজে অন্যের সামনে দাঁত দিয়ে নিজের নখ কাটা, আঙুল দিয়ে নাক খোঁটা মোটেই শোভন বলে বিবেচিত হয় না। তাছাড়া তুমি আমাদের সামনেই টেবিলে আঙুল দিয়ে ড্রাম বাজাচ্ছিলে এবং

তোমার দিকে আমরা বার বার ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও ইচ্ছে করে মেঝেতে জুতো ঘষছিলে। তোমার নিজের ঘরের অবস্থা এমন করে রেখেছো যে ওখানে আগুন লাগলে দমকলের লোকরাও দুর্গন্ধে ঢুকতে পারবে না। এই অবস্থায় তোমাকে আমার মনের দুঃখ জানিয়ে চিঠি লিখছি—কারণ তুমি আমার আদরের ছেলে। সবাই তোমার প্রশংসা করুক, তুমি তাদের ভালবাসার পাত্র হয়ে ওঠো, এই আমার কামনা। এ-বিষয়ে তোমার বক্তব্য চিঠি লিখে জানিও। তোমার চিঠির প্রত্যাশায় রইলাম—ইতি মা।"

মিস্টার কনেমারা আমাকে লিখেছিলেন যে চিঠি পেয়ে তিনি খুব খুশী হয়েছেন। এবং কবে কোথায় দেখা হবে জানালে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন।

সীয়াট্‌ল শহরে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা দেখতে যাবার একটা সুযোগ এসেছিল। সেখান থেকে মিস্টার কনেমারার বাড়ি খুব কাছে। মাত্র শ'দেড়েক মাইলের দূরত্বটা ওদেশে কেউ দূরত্বই মনে করে না। ভ্যান্‌স মোটর হোটেল থেকে মিস্টার কনেমারাকে টেলিফোন করেছিলাম। টেলিফোনেই পথের ঠিকানা দিয়ে দিলেন মিস্টার কনেমারা। বললেন, "বাসে সোজা আমাদের গ্রামে চলে আসবে। আমার শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে গাড়ি নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে হাজির থাকবো। না-হলে তোমাকেই কোনো ব্যবস্থা করতে হবে।"

বাস-স্ট্যাণ্ডে মিস্টার কনেমারা উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। বললেন, "গাড়ি নিয়ে বেরুবো ভাবছিলাম। কিন্তু ফোনে খবর নিয়ে জানলাম, তোমার বাস প্রায় আধঘণ্টা দেরিতে স্টার্ট করেছে। তাই আন্দাজ করলাম, রাস্তায় আলো কমে যেতে পারে। অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পাই না।"

... বসিয়ে মিসেস কানেমারা বললেন, "এখানে

গাড়ির মালিক হওয়াটা কিছুই নয়। কিন্তু মুশকিল হলো এই ড্রাইভিং। গাড়ি থেকেও আমরা খোঁড়া হয়ে যাচ্ছি। আমার চোখে ছানি পড়ছে—গাড়ি চালানোর কথাই ওঠে না। আর আমার স্বামীটি রাতকানা। সেবার তো এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফিরতে পারলেন না। এক বন্ধুকে তুলে দিতে গিয়েছিলেন। গাড়ি সমেত এক হোটেলে উঠলেন, সেখান থেকে আমাকে ফোন করলেন।"

মিস্টার কনেমারা বললেন, "জুডিথকে আমি ইণ্ডিয়ার কথা বলছিলাম। সেখানে কেউ বিশ্বাসই করবে না, কোনো ভদ্রলোক শুধু এই কারণেই রাস্তায় আটকা পড়লেন।'

মিসেস্ জুডিথ কনেমারা বললেন, "আমার তো ভয় হচ্ছে আজকাল। আমাদের অবস্থা শেষপর্যন্ত পাশের বাড়ির মিসেস্ ক্যাম্পবেলের মতো না হয়। চার্চের একজন সমাজসেবক সপ্তাহে একদিন আসেন—ওঁকে দোকানে নিয়ে যান। তারপর এক সপ্তাহ আবার খোঁজখবর থাকে না। ওঁর বয়স বিরাশি বছর।"

মিস্টার কনেমারা বললেন, "আমার বন্ধুটি কতদূর থেকে এসেছেন, ওঁর সঙ্গে আমার সেকেণ্ড হোম ইণ্ডিয়া সম্পর্কে কথা হোক।"

মিসেস্ কনেমারা স্বামীকে মুখ ঝামটা দিলেন। "খুব তো সেকেণ্ড হোম বলছো—অথচ আমাকে একবারও ভারতবর্ষে নিয়ে গেলে না।"

মিস্টার কনেমারা আমাকে বললেন, "জানো, আমার কাছ থেকে শুনে শুনে জুডিথের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব কৌতূহল! ওকে নিয়ে একবার সেন্টিমেন্টাল জার্নি সেরে আসবো ভেবেছিলাম। কিন্তু যাবো যাবো করতে করতেই একশ বছরের [illegible]ভাগ কেটে গেলো। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। এখন আর জমানো টাকা খরচ করতে সাহস হয় না।"

মিসেস্ কনেমারা বললেন, "বুড়ো বয়সের যন্ত্রণা কী জানো? একা একা চলাফেরার স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়—কারুর ওপর নির্ভর করতে হলে আমেরিকানদের বড় দুঃখ লাগে।"

আমি বললাম, "অনেকেই তো একদিন আপনাদের ওপর নির্ভর করেছে—এখন যদি আপনাকে কিছুটা অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়, দোষটা কী।"

মিসেস্ কনেমারা হাসলেন। বললেন, "আমাদের দেশে পর-নির্ভরতা অপমানের। আমরা সবাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই—এইটাই আমাদের চরিত্র।"

মিস্টার কনেমারা ঘরের কোণে একটা ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রসাধনরতা সেই বঙ্গসুন্দরীর পরিচিত ছবিটা অবিলম্বে যামিনী রায়ের কথা মনে করিয়ে দিলো। মিস্টার কনেমারা বললেন, "বাইরেনকে সঙ্গে নিয়ে অনেক খুঁজে খুঁজে তোমাদের যামিনী রায়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোককে খুব ভাল লেগেছিল আমার। পশ্চিমের বন্ধন থেকে আমি মুক্তি খুঁজছিলাম—ইওর যামিনী রে আমাকে আশার আলো দেখালেন। ছবিটা কিনে নিলাম। সেই থেকে আমার সঙ্গেই ঘুরেছে ছবিটা। অকুপায়েড জার্মানিতে ছিলাম কিছুদিন—সেখানেও ছবিটা নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর মিলিটারি ছেড়ে সিভিলিয়ান জীবনে ফিরে এসে নিউইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলেস পর্যন্ত অন্তত দশ জায়গায় বাড়িভাড়া করে থেকেছি—কিন্তু এই বেঙ্গল বিউটিকে আমি চোখের আড়াল হতে দিই নি।"

মিসেস্ কনেমারা বললেন, "আমি তো একবার ভেবেছিলাম, আমার স্বামীর ভালবাসা কেড়ে নেবার জন্যে তোমাদের মিস্টার যামিনী রে-কে উকিলের চিঠি পাঠাবো! যে মডেল দেখে তোমাদের মিস্টার রে এই ছবি এঁকেছেন, তার সঙ্গে আমার স্বামীর দেখা হলে যে কী কাণ্ড হতো ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

আমি বললাম, "আমার মেসোমশায়ের কাছে শুনেছি মেজর কনেমারার মতো সাত্ত্বিক সচ্চরিত্র লোক আমেরিকান আর্মিতে বেশী ছিল না।"

[illegible] স্ত্রীকে বললেন, "শুনলে তো?"

মিসেস্ কনেমারা বললেন, "তার একমাত্র কারণ, মনের মতো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় নি। মিস্টার যামিনী রে-র ওই মডেলকে পেলে উনি আমাকে ভুলে যেতেন।"

মিস্টার কনেমারা বললেন, "এই ছবিটার দিকে তাকালেই আমার ইণ্ডিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। ব্যাণ্ডেল থেকে কলকাতা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটা এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নিয়ার ব্যাণ্ডেল একটা সুন্দর টেরাকোটা মন্দির ছিল"—নামটা মনে করার চেষ্টা করলেন মিস্টার কনেমারা। স্মৃতিশক্তি এখনও হারিয়ে যায় নি তার প্রমাণ পাওয়া গেলো—বললেন, "হনসেসোয়ারি!"

স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে মিস্টার কনেমারা বললেন, "বিটুইন কননগর অ্যাণ্ড ভড্‌ডরকালী নদীর পশ্চিম দিকে একটা সিরিজ অফ টেম্পল ছিল—ওইখানেই গাড়ি থামিয়ে আমি ছবি তুলতাম, চা খেতাম। সে ছবি তোমাকে দেখাবো—আমার অ্যালবামে আছে।"

প্রবল উৎসাহে মিস্টার কনেমারা ভিতরে চলে গেলেন। মেসোমশায়ের একটা ছবি নিয়ে ফিরে এলেন। পঁচিশ বছর আগেকার মেসোমশায়ের ছবি দেখে আমার বেশ ভাল লাগলো। মেসোমশায়ের তখন বিরাট গোঁফ ছিল। মেসোমশায়ের হাল আমলের একটা ছবি ছিল আমার সঙ্গে, সেইটা ওঁর হাতে দিলাম। ছবিটা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন মিস্টার কনেমারা। বললেন, "নিষ্ঠুর সময়! মাত্র পঁচিশটা বছর বাইরেনকে কোথায় এনে ফেলেছে দেখো। বাইরেন এখন সত্যিই আমার মতো ওল্ড ম্যান। শুধু দেওয়ালে টাঙানো ওই বেঙ্গল বিউটির বয়স বাড়লো না।"

আমি বললাম, "আমাদের সাহিত্যে বলে, মানুষ বৃদ্ধ না হলে সুন্দর হয় না। সুপরিপক্ব ফলের সঙ্গে বার্ধক্যের তুলনা করা হয়।"

মিসেস্ কনেমারা ভাবলেন আমি রসিকতা করছি। আর মিস্টার কনেমারা বললেন, "তোমাদের দেশ এবং এই দেশের সভ্যতার অনেক তফাত। বার্ধক্যকে এখানে শীতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। জরাকে সবাই ভয় পায়।"

বয়সের ভারে মিস্টার কনেমারার দীর্ঘ দেহ ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। যৌবনকালে এই দেহ কী পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ছিল তা সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া যায়। মিস্টার কনেমারা জানালেন, তাঁর এখন সত্তর বছর বয়স। গৃহিণীও সমবয়সী। তারপর হেসে বললেন, "গত পঞ্চাশ বছর ধরে নিজেকে কুড়ি বছরের ছোকরা বলে ভেবেছি। এখন বুঝছি. এই অন্যায় দাবি ছেড়ে দেবার সময় এসেছে।"

মিস্টার ও মিসেস্ কনেমারা কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, "আজ রাতটা এখানে থেকে যাও। কাল লাঞ্চের পর হোটেলে ফিরবে।"

আমি না বলতে পারলাম না। শুনলাম, এঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে থাকে তেহেরানে—স্বামী কোন এক তেল কোম্পানিতে কাজ করেন। বড়ছেলে সীয়াট্‌লে ছেলেপুলে নিয়ে ঘর সংসার করছে। মেজ রয়েছে ফ্লোরিডায়। ফ্লোরিডার জল-হাওয়া এমন যে বৃদ্ধদের কষ্ট কম হয়। অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ওখানে অবসরজীবন কাটাতে যান শুনেছি। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি. ওখানেই থাকেন না কেন? কিন্তু সাহস হলো না? যে-প্রশ্ন সহজে স্বদেশে করা যায়, এখানে তাই বাবা-মাকে বিব্রত করতে পারে।

আমরা তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। খুবই সাধারণ খাবার. মিস্টার কনেমারা বললেন, "দু'বছর আগেও তুমি যদি আসতে, আমার স্ত্রী তোমাকে ইণ্ডিয়ান রাইসকারি রেঁধে খাওয়াতেন। ওঁর রান্নার শখ ছিল খুব—দেশবিদেশের রান্না শিখেছিলেন। কিন্তু এখন আর চোখে দেখতে পান না। কোনোরকমে কয়েকটা টিন গরম করে দেন। তাও হাত কাঁপে। আমি এখন রান্না শিখবো ভাবছি. যদি ওঁকে একটু সাহায্য করতে পারি।"

খাওয়া-দাওয়ার শেষে আমিই বললাম, "ডিশগুলো ধুয়ে দিই?" খুব দুঃখের সঙ্গে অনুমতি দিলেন ওঁরা। বললেন, "তোমাদের দেশে ব্যাপারটা যে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, তা আমি জানি। কিন্তু

যায় না। পাওয়া গেলেও এতো দাম যে আমাদের মতো বৃদ্ধদের পক্ষে তাদের রাখা সম্ভব নয়।"

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে মিসেস্ কনেমারা বললেন, "অন্য অনেকের থেকে আমরা ভাগ্যবান! বড়ছেলে ব্রায়ান আমাদের বলেছিল সীয়াট্‌লে ওদের বাড়ির পাশেই একটা বাড়ি নিয়ে থাকতে। এদেশে যারা বাবা-মাকে এখনও ভালবাসে, তারা এই ব্যবস্থাই করে। এক সংসারে তো থাকা সম্ভব নয়, তাই প্রতিবেশী হিসেবে রাখে।"

আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তাই করলেন না কেন? তাহলে অন্তত কাছাকাছি থাকতে পারতেন। কিন্তু মিস্টার কনেমারা বললেন, "আমরা দুজনে অনেক ভেবে দেখলাম, ব্রায়ান আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতে বলেছে, সেটা ওর মহত্ত্ব—কিন্তু আমাদের পক্ষে তা গ্রহণ করা উচিত হবে না। কারণ ব্রায়ানের কমবয়সী তিনটে ছেলেমেয়ে রয়েছে। আজকাল অনেক ইয়ং মাদার পছন্দ করে না, ছেলেমেয়েরা দাদু-দিদিমার সঙ্গে খুব মেশামেশি করুক।"

আমি তো তাজ্জব। বললুম, "বীরেনবাবুর নাতি তো সবসময় দাদু দিদিমার কাছে থাকে। এ কি রাত্রে ঘুমোয় এক বিছানায়।"

কনেমারা দম্পতি নিজেদের মধ্যে সবিস্ময় দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর বললেন, "ব্রায়ানের স্ত্রী আপত্তি না করলেও তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এবং অফিসের লোকরা কী বলবে? ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব এতে নাকি একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

ভীষণ রাগ হচ্ছিল আমার। মেসোমশাই, মাসীমা, মণ্টু এবং তার স্ত্রী এইসব কথা শুনলে কী ভাববে, আমি আন্দাজ করবার চেষ্টা করছিলাম। কত ভাগ্য করলে ছেলেমেয়েরা দাদামশাই দিদিমার কোলেপিঠে চড়ে মানুষ হতে পারে। মিস্টার কনেমারা বললেন, "তুমি তো সাহিত্যিক? এর মধ্যে সাহিত্য এবং সাইকোলজির ব্যাপার এসে পড়ে বাপমায়ের ভয়টা বাড়িয়ে দিয়েছে।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে মিস্টার কনেমারা বললেন, "আজকাল অনেক নাটক-নভেলে দেখবে—কিশোরী মেয়ে কোনো বিগতযৌবন বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের প্রেমে পড়েছে। কিশোরীদের এই বৃদ্ধদের প্রতি আকর্ষণের মনস্তাত্ত্বিক নাম জেরন্টোফিলিয়া। অনেকের ধারণা এর পিছনে মেয়েদের অবচেতন মনে গ্রাণ্ডফাদার ফিকসেসন থাকে। কবে কখনও দাদামশাই সম্বন্ধে ভালবাসা ছিল সেইটাই নাকি মনের গহনে চলে যায়, তার থেকেই এই জেরন্টোফিলিয়ার উৎপত্তি।"

রাগে ও বিরক্তিতে আমি চুপ করে রইলাম। মিস্টার কনেমারা বললেন, "হয়তো দশ লাখে একটি মেয়ের এমন হয়েছে—কিন্তু আমাদের ভয় লাগে। আমার ছেলে এবং তার বউকে অহেতুক অস্বস্তিতে ফেলাটা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না।"

আমার মনে কিন্তু অন্য ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এখনও এই স্তরে নেমে আসে নি। কোনো একটা ইংরিজী বইতে পড়েছিলাম, দাদু সংসারের বোঝা হয়ে ছেলের সংসারে রয়েছে বলে নাকি নাতনীরা বিরক্তিবোধ করছে। কারণ দাদুর জন্যে তারা কিছু কিছু সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই বিখ্যাত স্প্যানিশ চলচ্চিত্র 'এল কোচেসিটে'র গল্প মনে পড়ে গেলো—যেখানে একটি মেয়ে অধৈর্য হয়ে তার ঠাকুরদার মৃত্যুকামনা করছে। তার কারণ, তবেই সে ঠাকুরদার শোবার ঘরটা দখল করতে পারবে।

মিস্টার কনেমারা জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরেন এখন কোথায় আছে?'

ছেলেদের সঙ্গে আছে শুনে একটু অবাক হলেন। বললেন, "তোমাদের দেশে এখনও জয়েন্ট ফ্যামিলি তাহলে রয়েছে। এই যে কাগজে পড়ি, তোমরাও জয়েন্ট ফ্যামিলি ভেঙে দিয়েছো।"

বললাম, "অনেক ভাই একত্রে থাকার সিস্টেমটা অনেকখানি পাল্টেছে। কিন্তু বাবা-মাকে সংসারের বাইরে ঠেলে দেওয়ার রেওয়াজ

সংসারে অভাব অনটন আছে—খাবারের অভাব, ঘরের অভাব। তাই ছোটখাটো খিটিমিটি সবসময় লেগে থাকে—দু'পক্ষই ভাবে অন্যপক্ষ সুবিচার করছে না।”

মিস্টার কনেমারা খুব খুশী হলেন। বললেন, “খিটিমিটি কোথায় নেই? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও তো ঝগড়া-ঝাঁটি লেগে থাকে। যারা খুব বেশী প্রেমে গদ্‌গদ হয়, দিনরাত হনি হনি বলে জড়াজড়ি করে, তাদের বিয়েটাই আগে ভাঙে।”

মিসেস্ কনেমারা বিছানায় শুতে গেলেন। কিন্তু মিস্টার কনেমারা বললেন, “তোমার যদি কষ্ট না হয়, তাহলে এসো দুজনে গল্প করি। ইণ্ডিয়াতে তো আর কোনোদিন যাওয়া সম্ভব হবে না। এখানেও কোনো ইণ্ডিয়ান আসে না। হয়তো তুমিই আমার জীবনে শেষ ইণ্ডিয়ান।”

আমার কোনো আপত্তি নেই। মার্কিন দেশের মূল ভূখণ্ডে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আগামীকাল আমি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দিকে রওনা দেবো। বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর যাবার সময় হলো বিহঙ্গের।

যামিনী রায়ের পটে আঁকা সেই রহস্যময়ী সুন্দরীকে সাক্ষী রেখে সেদিন মিস্টার কনেমারা ও আমার মধ্যে অনেক কথা হয়েছিল। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মিস্টার কনেমারা বললেন, “আমাদের দেশের লোকদের যদি কোনোদিন শুভবুদ্ধি হয়, তাহলে তারা ভারতবর্ষের সমাজজীবন সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করবে। তোমাদের ওখান থেকে দেশের অনেক কিছু শেখবার আছে।”

আমি বললাম, “ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষিতরা কিন্তু সে-কথা বিশ্বাস করে না।”

মিস্টার কনেমারা হেসে উত্তর দিলেন, “তোমাদের রক্তের মধ্যে হাজার হাজার বছরের ধারাবাহিকতা রয়েছে—সুতরাং দু-চারজন অবিশ্বাস করলে কিছু এসে যাবে না।”

মিস্টার কনেমারা বললেন, “অন্য অনেক আমেরিকানের থেকে আমরা দুজন ভাগ্যবান। কারণ আমাদের কোলে দু-সপ্তাহ অন্তর

একবার টেলিফোনে খবরাখবর নেয়। টেলিফোনে খবর দিলে উইক এণ্ডে হাজির হবে। আমরা অবশ্য তা চাই না—কারণ আফটার অল সারা সপ্তাহ ধরে ছেলেকে অফিসে পরিশ্রম করতে হয়, তারপর শনি-রবিবারে একটু হৈ চৈ আনন্দ না করে বুড়ো বাপ-মায়ের সঙ্গে সময় নষ্ট করবে, এ কেমন কথা? কিন্তু এও জানি, অসুখের খবর পেলে আমার ছেলে ছুটে আসবেই। এদেশে আমাদের সমবয়সী ক'জন আমেরিকানের এই সৌভাগ্য আছে বলো? অসুখ তো দূরের কথা, কবর দেবার সময় ছেলেমেয়েরা কাছে থাকলে ভাগ্য মানতে হবে।"

"আপনি অবসর কেমনভাবে কাটাচ্ছেন?" জানতে চাই আমি।

মিস্টার কনেমারা বললেন, "আমি এখন বার্ধক্য সম্বন্ধেই খবরাখবর যোগাড় করছি। সত্যিকথা বলতে কি, আমাদেরও তো একদিন যৌবন ছিল—তখন বৃদ্ধদের সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল বোধ করি নি। প্রকৃতি এখন বোধ হয় প্রতিশোধ নিচ্ছেন। তাই শখটা এই দ্বিতীয় শৈশবকে কেন্দ্র করেই গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। এখানে মোটামুটি একটি লাইব্রেরী আছে। ছেলেকে লিখলে ইউনিভার্সিটি থেকে ডাকে বই পাঠিয়ে দেয়। কিছু ফরাসীও জানি, তাই সুবিধে হয়েছে।"

"ফরাসী জানার সুবিধেটা কী?" আমি জানতে চাই।

"যৌবন ও বার্ধক্য—দুই সম্বন্ধেই ফরাসী দেশে অনেক ভাল ভাল বই লেখা হচ্ছে। আমাদের এখানে একটি মাত্র ঋতু তার নাম যৌবনবসন্ত। বার্ধক্য সম্বন্ধে একটা ভীতি এবং গোপন ষড়যন্ত্র এখানে অনেক দিন ধরে চলছে।"

"ফরাসী দেশে চলছে না?" আমি প্রশ্ন করি।

মিস্টার কনেমারা বললেন, "ফরাসী দেশে প্রতি একশজন লোকের মধ্যে বার-তেরজনের বয়স পঁয়ষট্টির বেশী। আমাদের এখানে সে তুলনায় অনেক কম, শতকরা আট-ন'জনের বেশী নয়।"

এবার হেসে ফেললেন মিস্টার কনেমারা। বললেন, "এখানে [illegible] ভারতবর্ষ বলে একটা দেশ আছে, যেখানে

এখনও বয়োজ্যেষ্ঠদের পায়ের ধুলো মাথায় দেওয়ার রীতি চালু আছে। তা ছোকরা বললো, ওদেশে বুড়ো ক'টা আছে? ওদেশে গড় বাঁচবার বয়স তো এখনও তিরিশ-বত্রিশ পেরোয় নি। বৃদ্ধরা বিরল বলেই সম্মানিত। আমি তাকে বললাম, এখানেও অর্থনীতির আইন-কানুন প্রয়োগের চেষ্টা কোরো না—এটা দর্শনের ব্যাপার, এটা ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের বৈশিষ্ট্য।"

ছোকরা যে মিস্টার কনেমারাকে বিশ্বাস করে নি, তা ওঁর মুখের ভাব দেখেই বুঝলাম।

মিস্টার কনেমারা বললেন, "কিছুদিন আগে বার্ধক্য সম্বন্ধে একটা আলোচনা সভা হলো। সেখানে শুনলাম, ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে ফ্রান্সেই এখনও অনেক বৃদ্ধ মা-বাবা ছেলের সঙ্গে থাকেন। আমাদের এখানেও কিছু কিছু লোক যে থাকেন না এমন নয়। কিন্তু এখন তা আর সম্ভব হচ্ছে না। স্বামী নিজের বাপ-মাকে সঙ্গে রাখতে চাইলে, অনেক বউ ডাইভোর্সের আবেদন করছে।"

এদেশের মেয়েদের শ্বশুর-শাশুড়ী ভীতি সম্পর্কে সামান্য পরিচয় আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পেয়েছি। ওখানে ইলিনর নামে এক সুন্দরী পি-এইচ-ডি ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শুনলাম অনেক ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে সে ডেট করেছে। কফি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "সত্যি করে বলো তো ইণ্ডিয়ান ছেলেদের সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?"

ইলিনর খুব খোলা মনের মেয়ে। সে হেসে বললো, "দু'রকম ইণ্ডিয়ান দেখেছি আমি। ডেটিং-এ বেরিয়ে এরা হয় সাইলেণ্ট, না-হয় ভায়োলেণ্ট। অনেক ইণ্ডিয়ান তোমাদের বহুযুগের ট্রাডিশন মতো অনাত্মীয় মেয়েদের সান্নিধ্যে অস্বস্তি বোধ করে এবং দৈহিক দূরত্ব রেখে চলে। ভদ্রতা ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। আর উল্টোদিকে, কোনো মেয়ে হেসে কথা বললেই কিছু ইণ্ডিয়ান ভাবে সে দেহ দিতে রাজী আছে। শরীর ছাড়াও মেয়েদের যে একটা মন আছে তা তোমাদের এই সব ভায়োলেন্ট ছেলেদের মনে থাকে

না। তারা ভীষণ ক্ষুধার্ত। সায়লেন্ট এবং ভায়োলেন্টের মাঝামাঝি ভারতীয় যুবক আমি এখনও পর্যন্ত দেখি নি।"

ইলিনর বলেছিল, "তোমাদের এই সব সায়লেন্ট সুসভ্য যুবক সম্বন্ধে আমাদের সহপাঠিনী অনেকের হৃদয়দৌর্বল্য হয়। কিন্তু আমরা বেশী দূর এগোতে সাহস করি না, বিকজ অফ ইওর যৌথ পরিবার। ইণ্ডিয়ানকে স্বামী হিসাবে পাবার জন্যে যদি জীবনের বাকি ক'টা দিন শ্বশুর-শাশুড়ীর জেলখানায় কাটাতে হয়—তাহলে কী লাভ হলো?"

ইলিনরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "শ্বশুর-শাশুড়ী থাকলেই সংসারটা জেলখানা হয়ে উঠবে, ভাবছো কেন?"

ইলিনর আমাকে সোজাসুজি উত্তর না দিলেও, বুঝতে পারলাম জয়েন্ট ফ্যামিলি সম্বন্ধে, এই ধরনের যুবতীদের মনে যথষ্টে ভীতি আছে। ইলিনর বলেছিল, "দেখো, আমরা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমার রান্নাঘরে আজ কী রান্না হবে তা আর একজন ওল্ড লেডি ঠিক করবেন; আমার বাড়িতে কাউকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে গেলে কোনো ওল্ড ম্যানের অনুমতি প্রয়োজন হবে—এটা আমাদের কাছে অকল্পনীয়।"

মিস্টার কনেমারা বললেন, "ছেলের সঙ্গে বাবা-মা থাকলে অনেক সুবিধে। খরচ কম হয়। দাদু, ছেলে এবং নাতি এই তিন পুরুষের মধ্যে একটা ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর কমবয়সী স্বামী-স্ত্রীরা সংসারের অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে অভিজ্ঞ পরামর্শ পায়। কিন্তু ছেলে এবং বউমার আপত্তি অনেক। বুড়োরা নাকি যুগের সঙ্গে পা-মিলিয়ে চলতে পারেন না—নতুন ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আমদানিতে আপত্তি করেন। ছোটখাট ব্যাপারে খিটিমিটি লেগেই থাকে, ফলে সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে ওঠে। ছেলের যদি তখনও বাবা-মায়ের ওপর দুর্বলতা থাকে, তাহলে বউ ডাইভোর্স আদালতে স্মরণ নেয়। তাই আমাদের এই সমাজে নতুন নিয়ম হলো—ইনটিম্যাসি অ্যাট ডিসট্যান্স—অন্তরঙ্গতা রাখবে, কিন্তু দূর থেকে।"

মিস্টার কনেমারা অবসরসময়ে বার্ধক্য সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর যোগাড় করেছেন। বেশ কিছু নতুন সংবাদ পেলাম, যা আমার জানা ছিল না। মিস্টার কনেমারা বললেন, "আমাদের এই সভ্যতা যে কেবল প্রফিটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা যৌবনে বুঝতে পারি নি! লাভ ছাড়া এখানে কেউ কিছু বোঝে না। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। যতক্ষণ সুস্থ সবল দক্ষ মানুষকে দিয়ে সমাজের লাভ হচ্ছে ততক্ষণই আগ্রহ। তারপর যেমনি জরার ইঙ্গিত পাওয়া গেলো, অমনি তাকে নির্দয়ভাবে দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো।"

একটু থেমে মিস্টার কনেমারা বললেন, "আমাদের এই দেশে যন্ত্রবিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে—কোনো যন্ত্রপাতিই তাই বেশীদিন ব্যবহার হয় না। আরও নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হওয়া মাত্রই পুরনো মেশিনকে স্ক্র্যাপ করে দেওয়া হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও আমাদের সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই স্ক্র্যাপ কথাটা ব্যবহার করছেন, বলছেন একই মানুষকে অনেকদিন ধরে ব্যবহার করে লাভ নেই। তাই এই দেশে জীবনের শেষ পনেরো-কুড়িটা বছর মানুষ টুটা ফাটা-বাতিল লোহা লক্কড়ের মতো অবহেলিত হয়ে থাকে।"

"সমাজ যেমনি তোমাকে বাতিল করলো অমনি শুরু হলো দুঃখের দিন। নিজের পরিবারের মধ্যেও তোমার পুরনো প্রতিপত্তি নষ্ট হলো। বুড়োদের নিয়ে এখানে অভিনয় হয়—তাঁদের ঠকাবার চেষ্টা চলে। সাবালকের সম্মান তাঁরা পান না। মুখে একটু-আধটু ভদ্রতা দেখানোর চেষ্টা হয় গোড়ার দিকে—কিন্তু যথাসময়ে তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তিনি এখন দু-নম্বর নাগরিক। সোজাসুজি কিছু হুকুম করা হয় না, কারণ কারও হুকুম তামিল করবার কথা তো তাঁর নয়। কিন্তু সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে, বৃদ্ধকে অনেক জিনিস মানতে বাধ্য করা হয়। মুখে বলা হয়, বুড়োর ভালর জন্যেই এসব ব্যবস্থা হচ্ছে।"

মিস্টার কনেমারা বললেন, "বুড়োলোকের সামনেই চোখ-টেপা-টিপি করে রসিকতা করা তো এদেশে খুবই চালু। বাড়িতে বোঝাপড়ার

তরুণ কর্তাই সংসারের নতুন ভাগ্যবিধাতা। বউ-এর বিরুদ্ধে তিনি নিষ্ঠুর হতে পারেন না—কারণ বউ সংসার চালায় এবং বিছানাতে বিশেষ ধরনের সার্ভিস দেয়। ছোটদের সম্বন্ধে একটু ভীতি থাকে—কারণ তাদের ভবিষ্যৎ আছে, বড় হয়ে তারা প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু বুড়ো বাপ-মার ভবিষ্যৎ নেই—ক্রমশ তাঁরা আরও পরনির্ভর হয়ে পড়বেন, জরা ও ব্যাধি ওই দেহ-মন্দিরের কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। সুতরাং বাড়ির কর্তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

একটু থেমে মিস্টার কনেমারা বললেন, "বাড়ির কর্তা যদি ঠিক করলেন বাপকে বৃদ্ধনিবাসে পাঠাবেন—সেইটাই ফাইন্যাল। ছোট ছেলের মতো তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওখানে পাঠানো হবে। প্রায়ই বলা হয়, 'দেখে এসো না, জায়গাটা কেমন? ওখান থেকে চলে আসতে আর কত সময় লাগবে?' যিনি বলছেন এবং যিনি শুনছেন, তাঁর দুজনেই কিন্তু জানেন, ওই বৃদ্ধনিবাস থেকে তাঁকে আর কোনোদিন ফিরে আসতে দেওয়া হবে না।"

আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল। মিস্টার কনেমারা বললেন, "কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, কোনো বৃদ্ধ বাবা-মা সোজাসুজি স্বীকার করবেন না ছেলেরা তাঁদের বাতিল করে দিয়েছে। ছেলেরা, যে তাঁদের ভালবাসে এবং সম্মান করে এই খবরটা সুযোগ পেলেই তাঁরা বন্ধুদের শুনিয়ে দেন।"

আমাদের দেশে বোধ হয় ঠিক তার উল্টো। ছেলেরা যে বাপ-মাকে সম্মান করে না, কথা শোনে না, তা গিনি মাসীমা তো সুযোগ পেলেই আমাকে এবং অনেককে জানিয়ে দেন।

মিস্টার কনেমারা বললেন, "সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ছেলেছোকরাদের ধারণা, বয়স বাড়লেই মানুষের সব গুণ কমে যায়। কথাটা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। এই তো সেদিন নুফিল্ড ফাউনডেশনের রিপোর্ট পড়লাম। পনেরো হাজার বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রমিকদের কাজ পর্যালোচনা করে ওঁরা দেখিয়েছেন, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের কর্মকুশলতা গুণ বেড়ে যায়; কাজে মন বসে, কাজ থেকে

বয়োজ্যেষ্ঠরা বেশী আনন্দ পান। ঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা ছোকরাদের থেকে অনেক ভাল। ধৈর্য, নিয়মানুবর্তিতা, সততা, বিচক্ষণতা এঁদের অনেক বেশী।"

মিস্টার কনেমারা থামলেন না। "বললেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য চোখের দৃষ্টি কমে যায়, লোকে কানে কম শোনে ; স্মৃতি এবং উদ্ভাবনী শক্তি, প্রচণ্ড পরিশ্রমের ক্ষমতা, উৎসাহ, নিজে থেকে কিছু করার উদ্দীপনা, নতুন নতুন যান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ক্রমশ কমে যায়।"

আমি বললুম, "বুড়ো বয়সে নতুন কিছু শেখা যায় না, এটা কি ঠিক ? কোথায় যেন পড়েছিলাম, টলস্টয় ৬৭ বছর বয়সে সাইকেল-চড়া শিখেছিলেন।"

এখানকার কোনো ইয়ংম্যানের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা না-করতে পরামর্শ দিলেন মিস্টার কনেমারা। বললেন, "ওরা তোমায় ভুল বুঝতে পারে। ভাবতে পারে, তুমি ইচ্ছে করেই এই বিরাট দেশকে অপমানের জন্যে এই সব খবরাখবর যোগাড় করছো।"

"জানো, ফরাসী দেশের এক ভদ্রলোক বৃদ্ধদের সম্পর্কে খোঁজখবর করে কিছু মজার কথা লিখেছেন। লেখক বলছেন, যৌবনটাই যে মানুষের চূড়ান্ত বিকাশের সময় তা সবক্ষেত্রে সত্য নয়। মানুষের অনেক শারীরিক ক্ষমতা আরও ক বয়স থেকে নষ্ট হতে আরম্ভ করে।"

"যেমন ?" আমি জানতে চাই।

"যেমন ধরো, আমাদের চোখের কতকগুলো ক্ষমতা দশবছর বয়স থেকেই কমতে শুরু করে। খুব উঁচু গ্রামের শব্দ শোনার ক্ষমতাও কৈশোরে নষ্ট হয়ে যায়। বারো বছর বয়স থেকে কয়েক ধরনের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে আরম্ভ করে। আর সেক্স সম্পর্কে কিন্‌সে যা বলেছেন, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো।"

বললুম, "কিন্‌সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা নেই আমার।"

মৃদু হেসে মিস্টার কনেমারা বললেন, "এ দেশেও অনেকে জানে না যে কিনসের মতে ১৬ পেরোলেই সেক্স ক্ষমতা কমতে শুরু করে।"

"কুড়ি পেরোলেই বুড়ী বলে যে কথা আমাদের দেশে চালু আছে, তা মিথ্যে নয় তাহলে ?"

"মোটেই নয় !" হেসে উত্তর দিলেন মিস্টার কনেমারা। "তবে বেচারা মেয়েদের শুধু বুড়ী বানিও না, ছেলেদের সেই সঙ্গে বুড়ো করে দিও !"

রাত্রি অনেক হয়েছে। মিস্টার কনেমারার আরও গল্প করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে আর জেগে থাকতে সাহস পেলেন না। বললেন, "আমি এখন সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর অনুগত। ওর ধারণা অনেকক্ষণ না ঘুমোলে আমার শরীর খারাপ করবে। ও বোঝে না, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের প্রয়োজন কমে যায়।"

শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেবার আগে মিস্টার কনেমারা আমাকে এস্কিমো দেশের একটা গল্পের বই দিয়ে গেলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দু একটা গল্প পড়েই শরীর শিরশির করে উঠলো। চুকচী নামে সাইবেরীয় এক উপজাতির কথা আজও ভুলি নি। পরিবারের কেউ বৃদ্ধ হলে, চুকচীরা উৎসবের আয়োজন করে। বহুক্ষণ ধরে সীলমাছের মাংস এবং মদ নিয়ে হৈ হুল্লোড় চলে। সেই সঙ্গে ড্রাম বাজানো হয়। নেশা আর একটু জমলে, বৃদ্ধ লোকটির বড় ছেলে কিংবা ছোট ভাই চুপি চুপি বুড়োর পিছনে এসে দাঁড়ায় এবং সীলমাছের হাড় দিয়ে এমনভাবে টুঁটি টিপে ধরে যে, কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হয়।

এস্কিমোরা বৃদ্ধদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঈগলু থেকে চলে যেতে বলে। বুড়োরা মাথা নিচু করে বেরিয়ে গিয়ে বরফের ওপর শুয়ে থাকেন। মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। গ্রীনল্যাণ্ডের অ্যামাসালিন এস্কিমোরা বৃদ্ধ হলে আত্মহত্যা করেন। বৃদ্ধ এস্কিমো যখন বুঝতে পারেন যে দেহ দুর্বল হয়ে আসছে, এবার তিনি অন্যের বোঝা হয়ে দাঁড়াবেন তখনই মনস্থির করতে হয়। একদিন সন্ধ্যায় পরিচিত সমস্ত এস্কিমোদের কোনো একটা খোলা জায়গায় ডেকে পাঠানো হবে। সেখানে ঐ বৃদ্ধ এস্কিমো নিজের জীবনের সব অন্যায় সম্পর্কে

প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি করবেন। তার দু'তিন দিন পরেই এস্কিমো তাঁর কায়াকে চড়ে বসবেন এবং সেই যে বিদায় নেবেন আর ফিরবেন না।

মিস্টার কনেমারার দেওয়া বইতে এ-বিষয়ে একটা করুণ কাহিনী রয়েছে। একজন বৃদ্ধ এস্কিমো এমনই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে নিজের কায়াক চড়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি তাই ছেলেদের বললেন, আমাকে তোমরা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এসো। এস্কিমোদের বিশ্বাস, যারা জলে ডুবে যায় তারাই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি মরণসাগরের অপরপারে পৌঁছতে পারে। এস্কিমোর ছেলেমেয়েরা বাবার কথার অবাধ্য হলো না—তাঁর কথা মতো নৌকো থেকে বৃদ্ধকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলো। কিন্তু শরীরের জামাকাপড় ফুলে ওঠায় বৃদ্ধ তখনও বরফ-ঠাণ্ডা জলে ভেসে রয়েছেন, ডুবে যাচ্ছেন না। এস্কিমোর মেয়েটি বাবাকে খুব ভালবাসতো। সে স্নেহভরা কণ্ঠে চিৎকার করে বললো, "বাবা, তুমি মাথাটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো, স্বর্গের দূরত্ব তাহলে কমে যাবে।"

বিদায় নেবার আগে, মিস্টার কনেমারা বলেছিলেন, "বাইরেনকে বোলো, আমরা খুব ভাল আছি। চাকরির বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে এখন অবসরসুখ পুরোপুরি ভোগ করছি। ছেলেমেয়েদের ভক্তি ও ভালবাসা আমি যথেষ্ট পেয়েছি।"

মার্কিন দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে কয়েকদিন হাওয়াইতে কাটিয়েছি। তারপর জাপান এবং হংকং ঘুরে আমি আবার স্বদেশে ফিরে এলাম। অনেকদিন পরে দুঃখিনী বাংলার মাটিতে পা দিয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন ভরে উঠলো। এরোপ্লেনের সিঁড়ি দিয়ে দমদমে নামবার সময় মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে এলো —নমো নমো নমো, সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি, গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর [illegible] জুড়ালে তুমি।

যথাসময়ে গিনি মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওঁরা দুজনে তখন মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। মণ্টুর বউ বললে, "একটু বসুন। আপনি চা খেতে খেতে বাবা-মা ফিরে আসবেন।"

চায়ের কাপ সামনে নামিয়ে কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করেছিল, "ওদেশে সবচেয়ে ভাল কী দেখলেন?"

ভাল মন্দ কী বলবো? যেখানে যেমন সেখানে তেমন। আমরা একরকম, ওরা একরকম। ভাল মন্দ বিচারের প্রশ্ন ওঠে না— ওরা যা ভাল ভাবছে আমাদের চোখে তা হয়তো খারাপ দেখাচ্ছে আবার আমাদের ভালটা হয়তো ওদের চোখে নিতান্তই মন্দ।

কৃষ্ণা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে বললো, "আমাদের চোখ দিয়ে একবার ওদের বিচার করুন।"

বললুম, "সবচেয়ে যা ভাল দেখেছি, তাহলো ওদেশের মানুষের কর্মোদ্যম এবং স্বাধীনতা। মানুষের যে এতো দাম হতে পারে, মানুষ যে সত্যিই এতো স্বাধীন হতে পারে, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতুম না।"

কৃষ্ণা এবার মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, "সব চেয়ে কুৎসিত কি দেখলেন?"

এ-বিষয়ে মনস্থির করতে আমার একটুও সময় লাগলো না। বললুম, "ও-দেশের বিরাট শহরে একটা নাট্যশালা আছে, যেখানে একদল আশি বছরের বীভৎস শীর্ণা বৃদ্ধা তাঁদের স্কার্ট তুলে নাচ করেন। ছোকরা দর্শকরা টিকিট কেটে সেই দৃশ্য দেখতে যায় এবং বীভৎস আনন্দে হেসে লুটোপুটি খায়। সুসভ্য কোনো দেশের এর থেকে কদর্য কোনো দৃশ্য আমি কল্পনা করতে পারি না। বয়োবৃদ্ধাদের এমন অপমান যেন আমাদের এই দেশে কখনও দেখতে না হয়।"